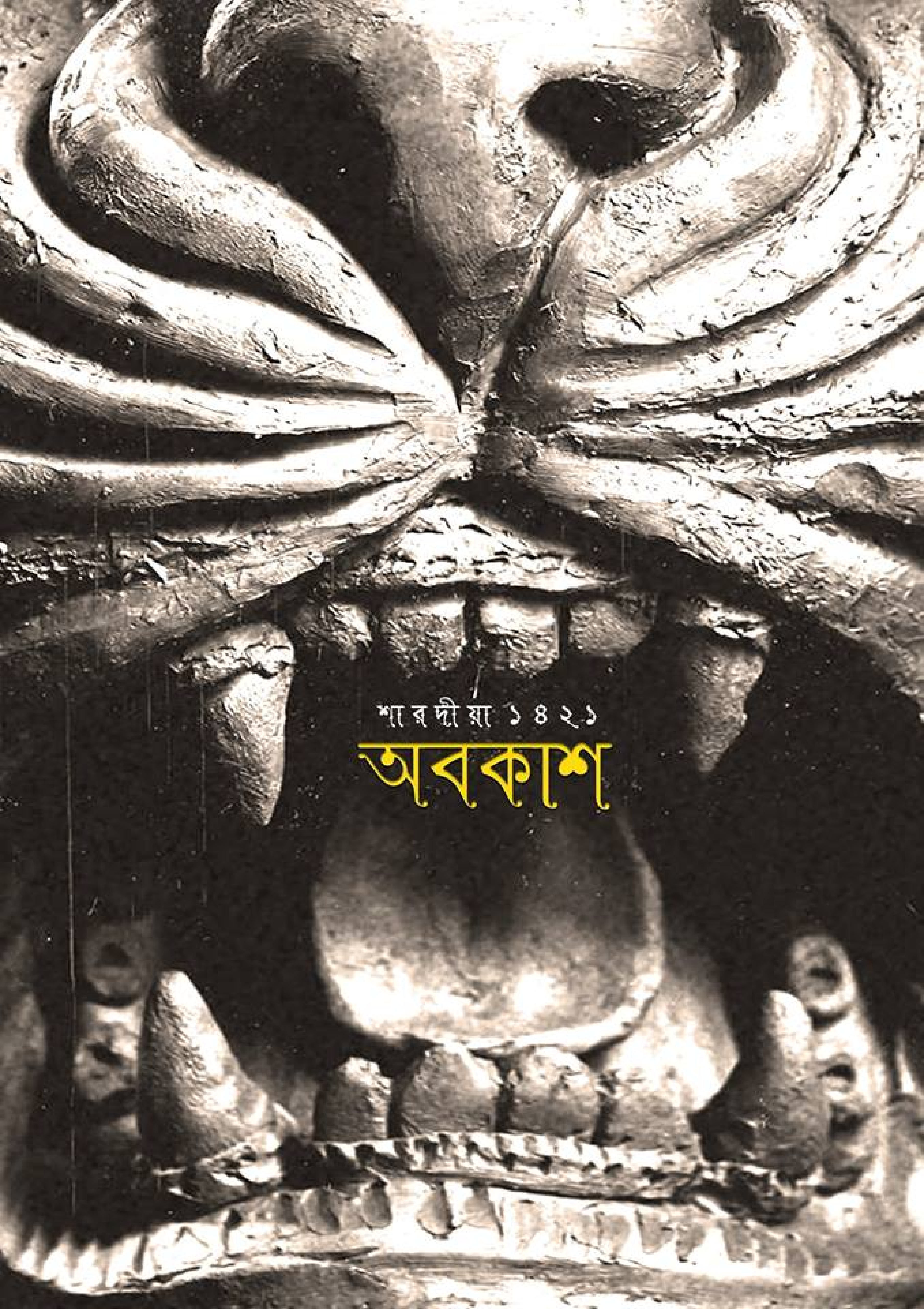

শারদীয়া ১৪২১

অবকাশ

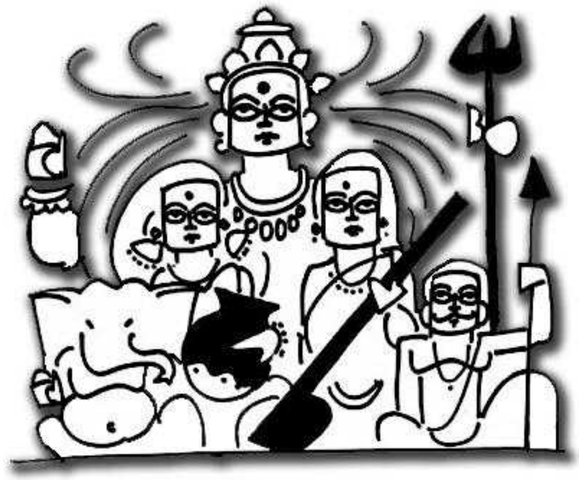

রং ধরেছিল আকাশে। মহাশূন্যে আপন খেয়ালে ভেসে চলা অলস মেঘ, হাওয়ায় নুয়ে পরা কাশফুল প্রস্তুতি সেরেই রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত প্রতীক্ষার অবসান। আশা আকাঙ্ক্ষার দোলায় দুলতে দুলতে রাত পোহালেই বোধন। মেঘ রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা শেষ হওয়ার আগেই মায়ের আবাহন।

মায়ের আশীর্বাদে আমরা যেন আমাদের জীবনের সমস্ত অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র আলোর তেজ উপভোগ করার শক্তি পাই, আমরা যেন সমস্ত অসুরকে আপন ক্ষমতায় ধ্বংস করে ফেলার সাহস অর্জন করতে পারি, আসন্ন শারদীয়া উৎসবের প্রাক্কালে এই আমাদের প্রার্থনা।

প্রবন্ধ

চ্যাট ও চিঠি❖সত্রাজিত❖১

নাটক

একা অধিরথ❖ভাস্কর লাহিড়ী❖৩৭

উপন্যাস

মাকড়সা, তুমি, আমি❖দেবব্রত মুখোপাধ্যায়❖২০০

রম্যরচনা

প্রাচীন কালের কিছু স্মৃতি❖অদিতি কবির খেয়া❖৬

একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়❖পার্থ প্রতিম রায়❖১৩৮

রান্নাঘর

বার্বাকোয়া❖অনির্বান শ্যাম❖১৬

লিমেরিক

ইস্কুলের ছড়া❖অতনু কুমার এবং অনির্বান সেনগুপ্ত❖১৭২

কবিতা - ১

বিষের নেশায়❖ডঃ সুজাতা ঘোষ❖৯

শারীরিক❖তুষার সেনগুপ্ত❖১২

এবার তুমিও ভাবো❖নির্মাল্য চক্রবর্তী❖১৩

আমার কাছে মৃত মানে❖উদীচ্য❖২৭

আকাশী❖কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়❖২৮

ঝড় থেমে হেঁটে আসা কিছুদূর❖নবকলম❖২৯

ইউনিকর্ন❖অদিতি চক্রবর্তী❖১৩২

নামহীনা❖দুর্বার❖১৩৩

বিশ্বাস❖সৌদীপ দেব❖১৩৪

অপেক্ষা❖মৃন্ময় ঘোষ❖১৩৬

পটলডাঙায় খুন❖উত্তরায়ণ সেনগুপ্ত❖১৯৬

কবিতা - ২

ইনন্যুয়েনডো❖সৌরভ কুমার দাশ❖১৯৮

সংরক্ষণ❖রুদ্রদীপ মজুমদার❖১৯৯

গল্প

একটি খোলা চিঠি❖ডঃ অন্নপূর্ণা বসু❖২০

লিফট❖সুমন মজুমদার❖২৩

মারণ টান❖চিরন্তন মিত্র❖৩০

চন্দ্রাহত❖সঙ্গীতা দাশগুপ্ত রায়❖১৫৫

চিরদিনই তুমি যে... ❖সীমা ব্যানার্জী-রায়❖১৬৪

হাঁদা গঙ্গারাম❖সিদ্ধার্থ দেব❖১৭৬

অধরা-মাধুরী----❖সৌমেন স্যান্যাল❖১৮৭

চ্যাট ও চিঠি

সত্র্যজিত

বিয়ে হওয়ার আগে পর্যন্ত আমার কাকা দার্জিলিঙে আমাদের সাথে থাকতেন। আমাদের বাড়িটা ছিল দোতলা। নিচের তলায় দুটো ঘর নিয়ে কাকা থাকতেন। আমি কাকাকে কলেজে পড়া অবস্থায় দেখেছি। কাকার শোওয়ার ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট বারান্দা ছিল। শুনেছি বিলেতে অমন বারান্দাকে বলে পর্চ। আমার ভারি প্রিয় ছিল পর্চটা। শীতকালে ভারি সুন্দর রোদ আসত দুপুরবেলা। মা এসে কাকার লেপ-বিছানা রোদে দিত। স্কুল থেকে ফিরে দুপুরবেলা সেই বারান্দায় লেপের ওমের মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পরতাম, টেরও পেতাম না।

এমনই এক শীতের দুপুরে বারান্দায় এসে দেখলাম লেপ-কম্বল ছাড়াও আরও একটি জিনিস বড় অবহেলায় একান্তে রোদ পোহাচ্ছে। জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটি সাদা খাম। বারান্দাটা রাস্তার পাশে হলেও বাড়ির লেটারবক্সটা অন্যদিকে। চিঠিপত্র সেখানেই আসে সাধারণত। "ভুল করে হয়ত এখানে ফেলে গেছে পিওন", ভেবে তুলে নিই খামটা। সাথে সাথে একটা অতিপরিচিত গন্ধ এসে ঝাপটা মারে। গতমাসে পাশের বাড়ির ফুলদির বিয়েতে যে গন্ধটা বারবার পেয়েছিলাম অঞ্জলিপিসির শরীর থেকে। হালকা মেহেন্দি মেশানো জুঁই ফুলের গন্ধ। খামটা উল্টে দেখি মেয়েলি হাতের অক্ষরে লেখা কাকার নাম। প্রেরকের নামের জায়গাটা ফাঁকা, না ভুল বললাম। মেরুন রঙের কালি দিয়ে ছোট্ট করে লেখা, 'বনলতাকে খুঁজতে নাটোরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কি?'

আপনারা হয়ত ভাবছেন ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করল বুঝি। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, বর্তমানের ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপের দুনিয়ায় চিঠি একটা ডাইনোসরের সমতুল্য। সময় কোথায় আমাদের? আচ্ছা তা যদি বা হল, ধৈর্য্য কোথায়? প্রথমত চিঠি লেখো, ডাকটিকিট কেনো তারপরে পোস্ট করে হাপিত্যেশ করে বসে থাকো (অবশ্য যদি ভারতবর্ষের পোস্ট অফিস দয়া করে আপনার চিঠি সময়মত পৌঁছে দেয়) কবে উত্তর আসবে। ও পক্ষেও কিন্তু ব্যাপারটা একই রকম।

যদিও সেটা ভেবে দেখার বিশেষ সময় কারোরই নেই। আরে চিঠি তো কোন ছার, পোস্ট মডার্ন যুগের প্রথম দিকের ট্র্যাজিক হিরো যে ইমেইল, দিনে দিনে সেও প্রায় বিলুপ্তির পথে। মাঝে মাঝে ভাবি, রায়মশাই যদি বছর পঞ্চাশ পরে জন্মাতেন, তবে কি উনি 'নেপোলিয়নের চিঠি'-র বদলে 'নেপোলিয়নের হোয়াটসঅ্যাপ' লিখতেন? বা 'শনিবারের চিঠি'-র বদলে সংকলিত হত 'ফেসবুকের শনিবাসরীয় চ্যাট' ...ইত্যাদি। লালমোহনবাবু সার্কাসের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "শের তো ভাগা, বাট হাউ?" ঘটনা হল এই 'বাট হাউ'-এর উত্তর খোঁজা বড় মুশকিল। সময়াভাবে চিঠি লেখা হয় না এর থেকেও বড় সত্য হল, হাজার একটা সহজলভ্য উপায় থাকতে চিঠি লেখা কেন বাপু? দ্বিতীয়ত সংরক্ষণ সমস্যা। বিশ্বজোড়া জালের ফাঁকে গোপন কথা লুকোনো যত না সহজ, তার থেকে ঢের বেশি কঠিন কোনও স্কুল-কলেজ পড়ুয়ার পক্ষে চার দেওয়ালের মধ্যে প্রেমপত্র লুকোনো। প্রসঙ্গত বলি, আমার প্রেমিকাকে লেখা আমার প্রথম প্রেমপত্র ঘটনাচক্রে গিয়ে পড়ে তার মায়ের হাতে। অতঃপর... পাক্কা চারটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরবর্তী কথোপকথনের আগে।

চিঠির দোষকীর্তন তো করলাম, এবার একটু চ্যাটের কোথায় আসি। চ্যাট প্রধানত দুই প্রকার - ফেসবুকীয় এবং হোয়াটসঅ্যাপীয়। ইয়াহু মেসেঞ্জার বা গুগল টক - না না ও সব তো আমার আগের জমানার বস্তু। স্কাইপ জিনিসটা মোটামুটি দৃশ্যমান কথোপকথন বা ভিডিও চ্যাট করতেই বেশি কাজে লাগে। এছাড়া আরও কিছু ছোটখাটো চ্যাটীয় মাধ্যম রয়েছে বটে তবে তারা কেউই ফেসবুকীয় এবং হোয়াটসঅ্যাপীয় চ্যাটের সাথে তুলনায় আসে না। আজকাল পাড়ার চুন্নি-মুন্নিদের হাতেও একটা করে স্মার্টফোন এবং তাতে বিভিন্ন প্রকার অ্যাপ বর্তমান। ফলে যা হয় আর কি, মুহূর্তের মধ্যে ইমনের কথা কল্যানের কানে, থুড়ি মোবাইলের স্ক্রিনে। 'আঙ্গুলের এক খোঁচায় I Love You পৌঁছে গেল শিকাগো থেকে বেঙ্গালুরু' টাইপের ব্যাপার আর কি। চ্যাটের সুবিধে নানাবিধ। প্রথমত, হারিয়ে যাওয়ার বিশেষ ভয় নেই। কোটিতে গুটিক ঘটনা ছাড়া সমস্ত কথাই নির্বিঘ্নে পৌঁছে যায় কাঙ্খিত ব্যক্তির কাছে। তামাদি হয়ে যাওয়ার ও ভয় নেই। যখন খুশি পুরোনো কথা পড়ে নিলেই হল। দ্বিতীয়ত, গোপনীয় কথাবার্তা অতি সহজে লুকিয়ে রাখা যায় (ধরা পড়বার ভয় প্রায় নেই বললেই চলে), মাতৃ-পিতৃস্থানীয়দের থেকে। আমার পঞ্চান্ন বছর বয়স্কা, কম্প্যুটার অশিক্ষিতা মা, যিনি কিনা এখনো নোকিয়া ১১০০ ফোনটা ঠিকঠাক ব্যবহার করে উঠতে পারলেন

না, তিনি আমার স্মার্টফোনের গোপন অন্তরে রাখা আমার প্রেমিকার নান্দনিক কথোপকথন পড়ছেন - না মশাই, আমি আমার কল্পনা শক্তিকে মোটেই ওভারটাইম খাটাতে রাজি নই।

তাহলে কী দাঁড়াল? চিঠি লেখা অবান্তর প্রচেষ্টা, তারচে আমরা বরং চ্যাটের প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিই। আচ্ছা একটা কথা বলুন দিকি দাদাদিদিরা, বিয়ের বছর সাত-আট পরে নিজের বউ এর থেকে অবিবাহিতা শ্যালিকা বা পরস্ত্রীকে পুরুষ মাত্রেই সর্বগুণসম্পন্না বলে মনে হয়...কি হয় তো? কিন্তু কিছু কু-পুরুষ ব্যতীত দিনের শেষে সকলেই কিন্তু ফিরে আসেন নিশ্চিন্ত স্নেহচ্ছায়ায়। তাহলে চিঠির বেলায় এই ব্যতিক্রম কেন? মানছি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, আনুষঙ্গিক হাজার ঝামেলাও রয়েছে। সে তো মশাই সব সংসারেই রয়েছে, নতুন কথা কি? সময় কম লাগা এবং দ্রুত সাড়া পাওয়া - এ দুটি ছাড়া চ্যাটের আর কোনো দৃশ্যমান উপকারিতা রয়েছে কি? আসুন ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। মোটামুটি পরিচিত বা বন্ধু স্থানীয়দের মধ্যে চ্যাট শুরু করার কিছু বাঁধা লবজ রয়েছে। ধরুন আমি আমার প্রেমিকাকে লিখলাম, ‘কি করছিস?’ - অবস্থা বিশেষে এর মানে কিন্তু বিভিন্ন। কখনো তাকে খোঁজা, উইকএন্ড হলে ভিডিও চ্যাটে আসার আমন্ত্রণ অথবা কখনও তার অভিমান ভাঙানোর প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু তাকেই যদি চিঠিতে লিখি ‘কী করছিস?’ ব্যাপারটা হাস্যকর নয় কি? চ্যাট করার সময় ভাবার অবকাশ কম। অনেক সময়ে অনেকের সাথে করা পুরোনো চ্যাট পরে আমার মনে হয়েছে, আমি বোধহয় এই কথাটা ঠিক এইভাবে বলতে চাইনি। আসলে তখন মনের সঠিক ভাব প্রকাশ করার থেকেও উত্তর দেওয়ার আকাঙ্খা তীব্র হয়ে ওঠে। ও বলতে ভুলে গেছি, চ্যাট অনেকটা ব্রহ্মশির অস্ত্রের মত। একবার পাঠিয়ে দিলে ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। আপনারা হয়ত বলবেন, সে তো খোকা চিঠিতেও নেই। একদম ঠিক কথা, কিন্তু দাদা চিঠি লেখার জন্য আপনি তো আর ঘরে জিন চড়িয়ে আসেননি। মনের কথাটা শান্তি করে ধীরেসুস্থে লিখলেন না হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনা বলি। আমার ভালবাসার মানুষটি ও আমার মধ্যে বেশ কিছু মহাসাগর ও মহাদেশ রয়েছে। সুয্যিঠাকুর আমাদের একসাথে আলো দেন না সাধারণত। আমার ‘কী করছিস’ এর উত্তরে সে প্রায়ই বলে ‘ঘুমোতে যাব’, এবার কখন এটার মানে তাকে জাগিয়ে রাখা আর কখন এটার মানে তাকে ঘুমোতে দেওয়া, বড় বিভ্রান্তিকর ব্যাপার মশাই।

এই অবধি লেখাটা পড়ার পর কেউ কেউ হয়ত ভাবছেন সত্রাজিত বলতে কি চায়? এই একবিংশ শতাব্দীতে কি চ্যাট ছাড়া বাঁচা সম্ভব? নাকি বাস্তব? আমি কিন্তু মশাই একেবারেই সুন্দরী শ্যালিকাকে কুরূপা বলে দুরে ঠেলে দেওয়ার পক্ষপাতী নই। প্রশংসা না করলে সৌন্দর্যের মর্যাদা কোথায়? শুধু তার সাথে একটা আলাদা সংসার নাই বা করলেন। আপনারা নিশ্চয় পন্ডিতজীর লেখা 'Letters from a father to his daughter' পড়েছেন বা নাম শুনেছেন। ছোট্ট ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা পন্ডিতজীর সেই অমর চিঠিগুলোই তৈরি করেছিল এক ভাবীকালের প্রধানমন্ত্রীর। অথবা ভাবুন লাটসাহেব কে লেখা বিশ্বকবির সেই নাইটহুড ত্যাগ করার চিঠি, আওরংজেবকে লেখা বীরকেশরী রাজসিংহের চিঠি বা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা আইনস্টাইনের চিঠি যার ফল ছিল ম্যানহাটান প্রজেক্ট... এগুলো সবই ইতিহাসের এক একটা মণিমুক্তো। আজকের এই দ্রুতগামী পৃথিবীতে ইঁদুর দৌড়ের চক্করে পড়ে আর এরকম কোনো প্রামাণ্য দলিল তৈরী হচ্ছে না। চ্যাট থাকুক অবশ্যই। তার উপকারিতা অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নেই। যে মেয়েটির সাথে আমি চিরকালীন সম্পর্কে আবদ্ধ, অরকুট, ফেসবুক ছাড়া সেটা সম্ভব ছিল না কোনদিন। একথা হয়ত আমার মত আরো অনেকেরই। কিন্তু মাঝে মধ্যে পারলে একটু চিঠিও লিখবেন। দেখবেন, অনেকগুলো বছর পেরিয়ে, কোনো এক অলস দুপুরে আরামকেদারায় বসে, আলতো করে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে দুজনে মিলে সেগুলো পড়তে পড়তে..... নাঃ, আপনাদের কল্পনাশক্তির ওপর আমার অগাধ ভরসা।

মূল লেখা এখানেই শেষ। উপসংহার হিসেবে দুটো ছোট ঘটনা বলব। আমার কাকা, হালকা মেহেন্দি আর জুঁই ফুলের গন্ধ মাখা, তার বনলতাকে ঘরে এনেছিল আরো বছর চারেক পরে। যে সময়ের কথা, তখন আমাদের বাড়িতে কোনো ল্যান্ডফোন ছিল না। তাই তখন ওদের মধ্যের পত্রবাহকের ভূমিকাটা ছিল আমার। অঞ্জলীপিসির ভাইপো বিল্টু ছিল আমার সহপাঠী। তাই ওদের বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। আইসক্রিম আর চকোলেটের বিনিময়ে তার খানিকটা ভাগ কাকা আর হবু কাকিমাকেও দিতাম। যখনই কাকার দেওয়া কোনো খাম অঞ্জলিপিসি কে দিতাম, দেখতাম একটা খুব সুন্দর দেখতে নকশা কাটা চন্দন কাঠের বাক্সের মধ্যে যত্নে চিঠিটা রেখে দিত সে। পরে জেনেছিলাম, সেদিন যত্ন নিয়ে চান করত অঞ্জলিপিসি। তারপর দুপুরবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, কপালে একটা ছোট্ট লাল টিপ, পাটভাঙা একটা শাড়ি পরে, এলোচুলে নিভৃতে বসে সেই চিঠি পড়ত। বিয়ের পরেও ওই বাক্সটা কাছছাড়া করেনি কখনো। কাউকে ছুঁতে দিত না ওটা,

কাকাকেও না। আবার ভুল বললাম। বছর তিনেক আগের এক রক্তমাখা বিকেলে কাকার হাতে বাক্সটা তুলে দিয়ে খোলাচুল, মাথায় সিন্দুর এবং সাদা খোলের শাড়ি পড়া আমার অঞ্জলিকাকিমা বলেছিল,

- দ্বিতীয়বার বাগদত্তা হলাম। আশীর্বাদ কর, আর জন্মেও যেন তোমাকেই পাই

অবসর নেওয়ার পর কাকা দার্জিলিঙে ফিরে গেছেন। সেই পুরোনো বাড়িটার একতলাতেই থাকেন। সেবার শীতকালে গিয়ে দেখি একটা নতুন আরামকেদারা কিনে পর্চ-এ রেখেছেন। বিকেলে কাকাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি কাকা ঘুমিয়ে পড়েছেন আরামকেদারায় বসে। বেলা শেষের রোদ্দুর এসে পড়ছে কাকার গায়ে, মাথায়, মুখে। চাদরটা টেনে দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম পাশের টেবিলে একটা চন্দন কাঠের বাক্স। কাকার হাতে ধরা একটা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া হলদেটে খাম। তার প্রেরকের নামের জায়গায় লেখা,

“বনলতাকে.........”

প্রাচীন কালের কিছু স্মৃতি

অদিতি কবির খেয়া

জীবনে মজার ঘটনা মনে করে একা একা হাসেন না, এমন কি কেউ আছেন? অনেক সময় দেখা যায় এসব মনে করে একা একাই হাসতে থাকি। তেমন কিছু ঘটনা আপনাদের উদ্দেশ্যে দিলাম।

রবীন্দ্রনাথ

ইউনিভার্সিটিতে আমাদের সাথে পড়তো সাইফুল। সে নাকি তাদের গ্রামের মহাকবি (সঞ্জয় বলতো মহাকপি)! একদিন সে তার হলের (বাংলাদেশে ছাত্রাবাসকে হল বলে) ম্যাগাজিনে কবিতা লিখেছে। তার একটা লাইন শুনুন- "গভীর ঘুমে কাটে বিনিদ্র রজনী।" এরপর থেকে তার নাম হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথ।

নামকরণ

ইউনিভার্সিটিতে আমাকে ছেলেরা গোপনে মা চণ্ডী বলে ডাকতো। সেটা অদ্ভুতভাবে জানতে পারি। একবার নববর্ষের খেতাব দেওয়া হল বাইরের দেয়ালে। ভিড় দেখে আমি আর যাইনি। একটু পর ক্লাসমেট ঝর্ণা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে এল। কি ব্যপার? ওকে সহ ম্যাক্সিমাম মেয়েদের অশ্লীল নামকরণ করা হয়েছে নাকি। আমি ছুটে গিয়ে সমস্ত ভিড় ঠেলে পোস্টারটা এক নজর দেখেই টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম। পরের দিন ঐ দেয়ালে দেখি বিরাট করে লেখা অদিতি কবির - মা চণ্ডী।

আলপিন

মেয়েদের হলে ছোট বোনকে নিয়ে গেছি, দোকান থেকে ওকে অ্যাল্পাইন-লিবে নামে একটা চকোলেট কিনে দেব। দোকানীকে বললাম, সে ব্যাটা ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। ছোট বোন বলে "একটা আলপিন দ্যান।" ওমা দেখি দোকানীর বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

সিনেমা হল

ক্লাস থেকে বাসায় এলাম। আমার বাসা শামসুন নাহার হলের কাছে, তাই রিক্সাওয়ালাকে বলতে হয় শামসুন নাহার হল যাব। আমি নেমে ভাড়া দিচ্ছি, দেখি রিক্সাওয়ালা এদিক ওদিক তাকায়। জিজ্ঞেস করলাম বিষয় কি? সে আমাকে পাল্টা জিজ্ঞেস কল- আপা, কইলেন হল, তা কি সিনামা দ্যাকপেন?

ওটা তো তবু ভাল। আমার বান্ধবী আসমার আব্বা হুজুর, রোকেয়া হলের সেকশন অফিসার। ওরা সবাই গ্রামের বাড়ি গেছে, সেখানে একজন আসমার ছোট বোনকে জিজ্ঞেস করেছে তার আব্বা ঢাকায় কোথায় চাকরি করে। সে বেচারা সরল মনে জানাল উনি রোকেয়া হলে চাকরি করেন। হায় হায়! সারা গ্রামে ঢি ঢি পড়ে গেল হুজুর মানুষ সিনেমা হলে কাজ করেন!!

ফরাসি

আমি তখন ফরাসি শিখছি। ক্লাসমেট সোহাগ আমাকে জিজ্ঞেস করল - দোস্ত, ফরাসিতে আই লাভ ইউ-রে কি কয়? আমি বললাম- কয় জ্যোতেম (je t'aime). পরের দিন জিজ্ঞেস করলাম কি খবর। সে বলল "পাত্রী বলেছে যে, আমিও তোরে জ্যুতায়ুম।" সোহাগের উচ্চারণে কথাটা হয়ে গেছিল জ্যুতেম, মানে জুতা মারব। মেয়েও পাল্টা বলেছে আমিও তোকে জুতা মারব।

মাছ-মাংস

হলে আমাদের দাওয়াত দিয়েছে সোমা। আমরা খেতে বসলাম। নাজু জিজ্ঞেস করল - শুধু মাছ নাকি মাংসও রান্না হয়েছে? সোমা জবাব দিল - মাংস মাছ সবই আছে। দেখা গেল মাছ আর মাংস এক সাথে রান্না হয়েছে। জিন্দেগিতে এমন আজব রান্না আর খাই নাই।

পুরান কথা

ক্লাসে স্যার পড়াচ্ছেন, হঠাৎ উনি গর্জন করে উঠলেন- ইউ! হাসছ কেন?!! শফিক উঠে দাঁড়াল। তার কৈফিয়ত - স্যার, পুরান কথা মনে পড়লে হাসি পায়।

সিনিয়র

আমাদের এক সিনিয়র ভাই ছিল, নাম- মাসুদ রানা। সেই মাসুদ রানা ছিল বিশ্ব প্রেমিক! সে একটা কবিতার বই বের করল, লক্ষ্য নিশ্চয়ই কোনও না কোনও মেয়ে। সে কবিতার বইয়ের পোস্টারে ছাত্ররা যা লিখেছিল কলম দিয়ে, সেগুলো লেখা যাবে না। বছর খানেক আগে তার সাথে দেখা, জিজ্ঞেস করলাম - এখনও কি তেমন বলদা আছেন?

হারুন

আনাদের ক্লাসের হারুন ছিল স্মার্ট। হলের ডাইনিংয়ে প্রথম দিন খেয়ে ডালে হাত ধুয়েছিল। সে ডাল এমন ট্যাল্ট্যালা যে তা দেখে ময়লা পানি মনে হতেই পারে। একবার মাছ খেতে দিয়েছে, হারুণ দেখে মাছের টুকরো বেশ মোটা। সে খেয়ে-দেয়ে দোকান থেকে একটা ব্লেড কিনে ডাইনিংয়ের ম্যানেজারকে দিয়ে বলল - মামা, মাছ কাটনের বেলেড মনে হয় ভোতা আপ্নের। ন্যান নয়া বেলেড দিয়া গেলাম।

বিষের নেশায়

ডঃ সুজাতা ঘোষ

অনেকক্ষণ... ঠিক কতক্ষণ মনে নেই, তবে অনেকক্ষণ
অনেকখানি পথ পেরিয়ে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম
জল ভেদ করে নিচের দিকে।

একটু কি নড়ল! আচ্ছা জল যখন
নড়ে, তখনই কি ভেতরের
বালিগুলো গোল গোল ঘুরতে ঘুরতে একটা
নিরাশার বলয় তৈরি হয়?

অ্যাই মেঘ! কোথায় যাচ্ছ অত বড় বড়
পাহাড় বানিয়ে
সূর্যকে ঢেকে রামধনুর ঐ ইণ্ডিগোটাকে বেছে নিয়ে
সমস্ত রাস্তাকে ময়ূরকণ্ঠী করে, সোনালি পদ্ম লেখা
ঠিকানায়!
আচ্ছা, রূপালি রংটা এত সাদা নয় কেন?

আবার একটা কালো রাক্ষুসে মেঘ
ঢেকে দিল চাঁদটাকে
এত হিংসুটে না!
অ্যাই শোন, আমরা না ক্যাণ্ডেল লাইট
ডিনার করব কাল সকালে!
সকালে? না ঠিক সকাল নয়, ওটা হল ডন। ওই সময়টাই
তো নেশা ধরায়।

মাথাটা ঝিম ঝিম করে, শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরা
শিরশির করে উঠে
ভীষণ নেশা ধরে, মনে হয় আর একটু... আর একটু...
আর একটু...
কিন্তু সুখ ক্ষণস্থায়ী...
পরম তৃপ্তিতে সমস্ত শরীরটা যখন পড়ে থাকে শ্বেত পাথরের
উপর
ঠাণ্ডা হয়ে থাকা জলকণায় আবদ্ধ হয়ে,
তখনই একটা বিষাক্ত সবুজ সাপ ছোবল দিতে থাকে নরম
গোলাপি পাপড়ির প্রতিটি শিরা উপশিরায়।

আঃ... কি আরাম!
সমস্ত আকাশটা সাদাটে নীল হয়ে আছে,
রূপালি চাঁদটা হাসছে আমার নেশা ধরা শরীরের
শিরার মধ্যে বয়ে যাওয়া নীল রঙা বিষের চমক দেখে।

ওর-ও কি ইচ্ছে হয় বিষাক্ত ছোবল খেয়ে
নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করতে?
ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, চোখ দুটো আর খুলে রাখা যায় না
আস্তে আস্তে মিষ্টি শিরশিরে হাওয়া আমার
সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে
আমি ঘুমাব... ভীষণ ঘুম পাচ্ছে ।।

শারীরিক

তুষার সেনগুপ্ত

রক্তে আমার স্বপ্ন নেশা
গভীর ঘুমে ছুঁয়ে যায় হাত
রাত ভাঙতে ভাঙতে...
চাঁদের আলোয় মুখ দেখি না
চাদরে জড়ানো শরীর
চোখ দিয়ে চাদর সরাই
আতরমাখা বুক রজনীগন্ধা
ব্যবধান মুছে যায় ক্রমশই
ডুবন্ত জাহাজের ক্লান্ত নাবিকের মত
মাঝ দরিয়ায় অনন্ত সাঁতার...

এবার তুমিও ভাবো

নির্মাল্য চক্রবর্তী

ভাবছি মনে দিনের শেষে
কে সে আমায় ভালবাসে ?
কে সে আমায় আপন ক'রে
বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে?

কেই বা সে দিনের শেষে
গুটিগুটি সামনে এসে
চুপটি করে বসে পাশে
দিনের শেষে অবশেষে?

হাজার কথা বলি তারে
একটি নাকো শব্দ ক'রে
মনের মাঝে অনুরণন
করতে নারি অনুধাবন।

ভাবছি সেই কখন থেকে
মনটা ঘোরে ঘূর্ণিপাকে,
গ্লাসের মধ্যে লেভেল ব্লু
পাইনা খুঁজে কোনই ক্লু।

এমন সময় হঠাৎ দেখি
চোখের সামনে গগন চাকী!
মুখুজ্জেদা পদ্ম দিঘির,
কি যেন হয় দূর্গা দিদির।

তারই ভায়রা কিম্বা শালা
একটু ট্যারা, অল্প কালা।

প্রশ্ন করো যতই শক্ত
উত্তরেতে সবাই জব্দ।

মোদী রাহুল দালাই লামা,
আবে জিনপিং বা ওবামা,
যখনি কোনো প্রশ্ন জাগে,
দ্বিধাদ্বন্দ্ব সরিয়ে রেখে,
টুক করেতে শুধায় কানে,
পরক্ষণেই শাবাশ মানে।

চোখের সামনে এমন লোককে
দেখতে পেয়ে পুলক জাগে,
হাতটা ধরে গগন চাকী
বলি আমি - ব্যস্ত নাকি?
একটি প্রশ্ন মনের ফাঁকে
জ্বালিয়ে মারে তখন থেকে,
ভাবছি আমি দিনের শেষে
কে সে আমায় ভালবাসে?

প্রশ্ন শুনে গগন চাকী
চোখটি বুজে হাসে মুচকি,
মনটা অবশ, বুক দুরুদুরু
সহজ প্রশ্ন, বুঝলি বীরু?

বাড়িতে তোর্ আছে কয়জন?
একটি পোষ্য, অন্য স্ত্রীধন।

একটা ছোট্ট পরীক্ষাতে
উত্তর পাবি হাতে হাতে
দুই ঘরেতে প্রিয় দুজন,
একটি পোষ্য, অন্য স্ত্রীধন,
তিনটি ঘন্টা বন্ধ রাখো
দরজা কোনো খুলবে নাকো।

খুললে পরে দরজা শেষে
বুঝবে কে সে ভালবাসে,
কামড়ায়ই বা কে সে তোমায়,
এখন বুঝি তোমায় ভাবায়??

বার্বাকোয়া

অনির্বান শ্যাম

এবারের পুজোসংখ্যা অবকাশের জন্য কি রেসিপি দেওয়া যায় ভাবতে গিয়ে দোটানায় পড়েছিলাম, দেশি না বিদেশি! শেষ পর্যন্ত্য বিদেশিরই পাল্লা ভারি হল যেহেতু সব পাক্ষিক আর পূজাবার্ষিকগুলো সম্ভাব্য সবরকম দেশি রেসিপি ছেপেই ফেলেছে। আমার প্রিয় একটি প্রাচীন মেক্সিকান ডিশ হলো বার্বাকোয়া, সহজে রাঁধা যায়, যে কোনও কম্বিনেশনে চলে যায় এবং ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার, যখন খুশি খাওয়া যায়। আমার ভাল লাগার প্রধান কারণ হল একটা মৌলিক, বন্য ধোঁয়াটে গন্ধ এবং "ফ্রিজ টু ওভেন/প্লেট" হওয়ার গুণ. আগের দিন রেঁধে ফ্রিজে রেখে দিন, যখন প্রয়োজন বার করে ঠান্ডা বা গরম দু'ভাবেই খাওয়া যায়। ফ্রিজে থাকলে, অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়া একদল বন্ধুকে চটজলদি খাওয়াতে হলে আদর্শ। আসলে এই প্রাচীন পদটি মাংস কলাপাতায় মুড়ে মাটির নিচের উনুনে ৮-১২ ঘন্টায় রাঁধা হত, আমরা ওদিকে না গিয়ে ইলেকট্রিক ওভেনেই রাঁধব।

মেরিনেসনের উপকরণ: (জনা চারেকের জন্য)

১.৫ কেজি হাড়সুদ্ধু খাসি বা ভেড়ার মাংস (রাং বা কাঁধের চাপ অথচ ছোট হাড় নেই এরকম)

১ টেবিল চামচ কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো (প্রবাসীরা গুয়াজিললো দিতে পারেন)

১ টি বড় টমেটো কুচোনো

১ টি মাঝারি পেঁয়াজ কুচোনো

১ চা চামচ কালো মরিচ গুঁড়ো

৩-৪ টি লবঙ্গ

১/২ চা চামচ দারচিনি গুঁড়ো

২ চা চামচ জোয়ান (প্রবাসীরা ওরেগানো দিতে পারেন)

১ চা চামচ যেকোনো ভালো গরম মশলার গুঁড়ো (প্রবাসীরা অলস্পাইস দিতে পারেন)

২ টেবিল চামচ ভিনিগার (এপল সিডার হলে ভালো)

২ টেবিল চামচ সাদা তেল

৭৫০ মিলি জল

১/২ টেবিল চামচ নুন

রান্নার উপকরণ:

২ টি বড় পেঁয়াজ কুচোনো

আলু, গাজর, বিন, কড়াইশুঁটি মিলিয়ে ৫০০ গ্রাম মত, লম্বা করে কাটা

যেকোন বেশি তেতো নয় এমন বিয়ার এক পিনট (ছোট বোতল ৩৭৫ মিলি, হেনিকেন বা করোনা পেলে ভাল হয়)

সমপরিমাণ জল

১/২ চা চামচ মৌরি

২-৩ টি তেজপাতা (প্রবাসীরা এভোক্যাডো লিভস দিতে পারেন)

কলাপাতা (অভাবে ফয়েল)

নুন পরিমানমত

সার্ভ করার আনুষঙ্গিক:

লেবুর টুকরো, কাসুন্দি, তর্তিলা বা রুটি (প্রবাসীরা সালসা ভার্দে ট্রাই করতে পারেন)

প্রস্তুতি:

মেরিনেসন:

রান্নাটি সময়সাপেক্ষ বলে খাওয়ার আগের দিন প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। লঙ্কা গুঁড়ো শুকনো কড়াইতে মাঝারি আঁচে উল্টে-পাল্টে সেঁকে নিন মিনিট খানেক, যেন পুড়ে না যায়। এবারে জল দিয়ে একটু মাখা মাখা করে নিয়ে মাংস ছাড়া বাকি মেরিনেসনের সমস্ত উপাদান মিক্সারে ব্লেন্ড করে নিন। তারপর আবার পরিষ্কার কড়াইতে তেল গরম করে পুরো পেস্টটা দিয়ে মিনিট দশেক কম আঁচে ঢাকা দিয়ে রাখুন। নেড়েচেড়ে মসৃণ এবং গাঢ় হয়ে গেলে পেস্ট নামিয়ে নিন।

মাংস ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিয়ে এই পেস্ট দিয়ে ভাল করে মেখে ঢাকা দিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন অন্তত ১২ ঘন্টা, ১৮-২০ ঘন্টা হলে আরো ভাল হয়।

প্রধান রান্না:

মেরিনেট করা মাংস ফ্রিজ থেকে বার করে নর্মাল হতে দ্দিন। ততক্ষণে সবজির বেসটা বানিয়ে নেওয়া যাক। পেঁয়াজ আর বাকি সব সবজি একটা বড় রোস্টিং পটে রাখুন, (পাত্রটি যেন বড় হয় কারণ এতেই মাংসও দিতে হবে আলাদা করে)। ওপরে বিয়ার, জল ও নুন দিয়ে নেড়েচেড়ে এর ওপরে রোস্টিং রাক লাগান। কয়েকটি লম্বা ফালি করা কলাপাতা বা ফয়েল দিয়ে রোস্টিং রাকটি সম্পর্ণ ঢেকে দিন যাতে এর ওপরে মাংস রাখার পর সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া যায়। ফয়েল ব্যবহার করলে কয়েকটি ছোট ফুট করে দিন, যাতে ওপরের গ্রেভি নিচে পড়তে পারে। কলাপাতা হলে ফুট না করলেও হবে। এবারে ওভেন ১৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে প্রি-হিট করতে থাকুন।

মেরিনেট করা মাংস এই কলাপাতার ওপর রেখে ওপরে কয়েকটি তেজপাতা দিয়ে ওপর থেকে কলাপাতা খুব ভাল করে মুড়ে মাংস ঢেকে ফেলুন। এবারে রোস্টিং পট-টি ওভেনে ঢুকিয়ে ৮-৯ ঘন্টার টাইমার লাগিয়ে দিন।

পরিবেশন:

লেবুর টুকরো, পার্সলে, কাসুন্দি বা বার-বি-কিউ সস, (প্রবাসীরা সালসা ভার্দে ট্রাই করতে পারেন) দিয়ে পরিবেশন করুন। তর্তিলা বা কড়া করে সেঁকা রুটি, অভাবে তন্দুরি এমনকি ব্রেড স্টিক, বান বা টোস্ট দিয়েও ভাল লাগে। ঠান্ডা বা গরম দুভাবেই খাওয়া যায়।

কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না।

একটি খোলা চিঠি

ডঃ অন্নপূর্ণা বসু

New Message	
একঅবাকচিত্তমানবশিশু@প্লানেটআর্থ.কম	
To পরমেশ্বর@দেবলোক.কম	Cc Bcc
Subject একটী খোলা চিঠি	

প্রিয় বন্ধু (শ্রীচরণেষু ভগবান),

আমি শুনেছি যে তুমি খুব মহান ও মহৎ। যে তোমাকে এত মহান ও মহৎ করেছে, সে নিশ্চই আরো মহৎ (জানি না সে কে)। কেউ নিশ্চয়ই আছে তোমার পিছনে, যেমন আমার ভালো হবার পিছনে, বাবা আছে (?) আমার মা তাই বলে।

আমি তোমাকে বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না, তবে বন্ধু বলে মনে করি। আমি তোমার কাছ থেকে তোমারই ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে চাই। প্রিয় বন্ধু, মনে হয়, তুমি সব জায়গাতে আছ। মনে হয়, এই যে চিঠিটা আমি লিখছি, সেটাও তুমি দেখছ, আর নিশ্চয়ই হাসছ। অনেক অদ্ভুত ঘটনা আছে, সেগুলোর ব্যাপারে যখনই ভাবি, সেগুলো আরও অদ্ভুত লাগে আর তোমার সাথে অদ্ভুত ভাবে জুড়ে যায়।

প্রিয় বন্ধু, তোমার সম্পর্কে আমি ভীষণ উৎসুক হয়ে রয়েছি...। তোমার নাম ঠিকানা জানি না, তোমার ফোটোও নেই, তাই চেহারাও জানা নেই। তুমি কি খাও বা কি কর তাও আমার জানা নেই। তবে কি খেতে পছন্দ কর না, তা জানি। কারণ মা রোজ তোমাকে ফল, মিষ্টি, সিন্নি দেয়, আর তুমি খাও না, ভালো লাগে না বলেই তো? আর তোমার এঁঠো গুলো আমায় খেতে হয়। বল না, কি ভালো লাগে তোমার! চেষ্টা করব জোগাড় করবার। বল না, আমসত্ত খাও? আমের টক আচার খাও? জোগাড় করব। খাবে তো?

আমি আসলে তোমার ঠিকানাটা চাই, তোমার কাছে আসব বলে... কেন জান? আমি চাই তোমাকে ধন্যবাদ দিতে নিজে তোমার কাছে এসে। কারণ সব সময় আমার দরকারে তোমাকে সাথে পাই। এই তো সেদিনের কথা, পলাশির যুদ্ধের গল্পটা মনেই পড়ছিল না, তোমাকে বলতেই তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলে, আমি ১০/১০ পেয়েছিলাম সে পরীক্ষাটাতে .... তাই তো ধন্যবাদ দেওয়াটা আরো দরকার হয়ে পড়েছে। আর তোমার সাথে বসে অনেক গল্প করব, চা খাব। জান তো, মা আমাকে চা খেতে দেয় না।

এই তো পরশুদিনের কথা। খুব থকে গিয়েছিলাম ফাইনাল ম্যাচের প্রাক্টিস করে। শুয়েছি, তোমার কথা মনে পড়ল। বন্ধু, তুমি কখন শোও ? ওরা সবাই বলে, তুমি নাকি আমারই নয়, সবারই সব কথা শুনতে পাও। সবারই দুঃখ-কষ্ট, সুবিধা-অসুবিধা সবই নাকি দেখতে পাও, সবই নাকি তোমার জানা। কি করে এসব কর বল তো! বন্ধু, তোমার কতগুলো টেলিফোন, কতগুলো মোবাইল আছে বল তো? আর মিনিটে কতগুলো ফোন আসে তোমার কাছে ? আর কি করে বা একসাথে এত ফোন শোনো? আর তাদের সাহায্য? এত কাজ একসাথে কি করে কর? এই তো পরশু দিনের কথা, ঠাম্মা বলছিল, তুমি নাকি গাছ-পালা, পোকা-মাকড়, জন্তু-জানোয়ার সবারই কথা শুনতে পাও, কি করে? তাদের তো টেলিফোন, মোবাইল নেই! তাদের সবারই দুঃখ-কষ্ট, ঘর-দোর, খাওয়া-দাওয়ার খবর রাখ কি করে? প্রতিদিন ভয়ংকর খাটানি হয় নিশ্চয় তোমার... ওঃহো...বুঝেছি, তবে কি তাইই তুমি রোজ খেতে ভুলে যাও? আর তোমার খাবারটাও আমাকে খেতে হয়। তবে এটা কিন্তু ঠিক যে তোমার মতো খাটতে হলে আমি তো বোধহয় নিজের নামটাও ভুলে যেতাম!!

সারাদিন এত খাটানির পর রাতে টেনে ঘুমাও তো নিশ্চয়? না...না...আবার ভুল হল আমার...ঐ সেদিন মিনি বল্ল ওর দাদনীর দুপুর রাতে ভীষণ অসুখ করেছিল, সরকারি হাসপাতালেও নিয়ে গিয়েছিল ওরা। খুব নাকি কেঁদেছিল, আর তোমাকে বলেছিল ভাল করে দিতে, আর ওর দাদনী ভাল হয়ে গিয়েছিলো; হুঁ....তাহলে? তুমি ঘুমাও কখন? এত কাজ একাই কর? না..না...নিশ্চয়ই এসিস্ট্যান্ট আছে....?

আচ্ছা, আরো একটা জিনিস আমার এই ছোট্ট মাথায় ভেবে পাই না....এই যে মানুষরা বেঁচে থাকে মরে যায়, ঠাম্মা বলছিল প্রত্যেকের মাথায় তুমি সুতো বেঁধে রাখ, কাউকে নামিয়ে দাও, কাউকে

তুলে নাও (কাঠপুতুল নাচের পুতুলের মত)। তাই কি? না তোমার কাছে সুইচ আছে গো ভগবান? খুট করে জ্বেলে দিলে নয়তো বন্ধ করে দিলে? ওঃহো ...ঠিকই বুঝেছি তাহলে কি বল? সব ইনফরমেশান মোটা-মোটা ডাইরিতে লিখে রাখ বোধহয়? সেদিনে শুনলাম কানীমাসি (আমাদের কাজের মানুষ) বলছিল ধোপাপাড়ায় কে যেন মরে গিয়েছিল, আবার বেঁচে গেছে....বুঝেছি ওই হয়েছে, তাড়াহুড়ো করতে যেয়ে ভুল সুইচ বন্ধ করেছ...আর কি!!! আর ভুল বুঝতেই আবার সুইচ অন করে দিয়েছ... নয় কি? হুঁ...হুঁ বাবা, তোমারই বন্ধু হচ্ছি, সবই বুঝেছি। আসলে, তুমি ম্যাজিক জান, জাদুকাঠি আছে তোমার কাছে। জাদুকরদের মধ্যে জাদুসম্রাট হচ্ছ তুমি, আমি তোমারই বন্ধু, আমায় শেখাবে না? আমি প্রমিস করছি, তিন সত্তি বলছি, খুব ভাল অনুগত ছাত্র হব তোমার। সত্তি, কোটি-কোটি মানুষ, জীব-জন্তু গাছ পাখির ভালো মন্দর শাস্তি-পুরস্কারের নির্ভুল হিসাব রাখা....যে সে কথা নয়। বন্ধু যত ভাবছি তত সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হে বন্ধু একটা ট্রিক তো বলে দাও...বলবে তো? কেমন করে বলবে? sms করবে? টেলিফোন? মোবাইল? টেলিপ্যাথি? বল বন্ধু, তাড়াতাড়ি জবাব দাও। তোমার ঠিকানাটা চাই, আমি আসব।

ইতি তোমার লাখো প্রশংসকের এক জন।

একঅবাকচিত্তমানবশিশু@প্লানেটআর্থ.কম

পুঃ। ডিয়ার গড,

চিঠিটা লিখেছিল আমার দিদি সমিক্ষা, ক্লাস সিক্স। আমি তিতিক্ষা, ক্লাস ফোর। চিঠিটা দলা পাকানো পড়েছিল। আমি পেয়েছিলাম, পড়ে মনে হল, ঘটনাগুলো সত্তি, প্রশ্নগুলো কঠিন যার উত্তর আমিও জানতে চাই, আমরা দু'বোনেই আসব। তাই জবাবের অপেক্ষায় চিঠিটা পোষ্ট করে দিলাম। উত্তর দিও। –তিতিক্ষা।

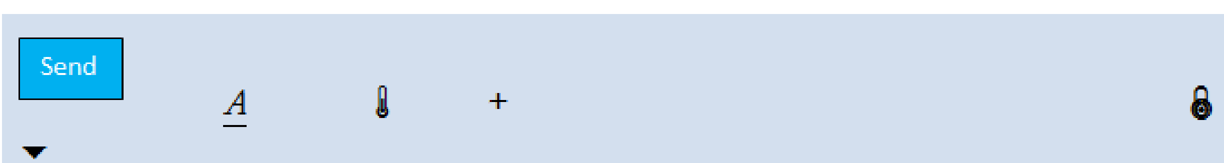

লিফট

সুমন মজুমদার

কি জামা পরবে ঠিক স্থির করে উঠতে পারে না বরুণ। আজ তার একটি বিশেষ দিন। গত কয়েকদিন হল সে পাশের বাড়ির সজল আর সজলের মায়ের সঙ্গে চেন্নাই এসেছে, সজলের মায়ের চিকিৎসার জন্য। আজ তাকে চেন্নাইয়ের ভেঙ্কটেশ টাওয়ারে যেতে হবে, না না সজলের মায়ের চিকিৎসা নয়, ভেঙ্কটেশ টাওয়ারে থাকে তার পিসির ছেলে পল্টু। হাওড়ার বড় পিসির ছেলে পল্টুর বাড়ি যাবে। ধুর! এভাবে বললে ব্যাপারটা বোঝাই যাবেনা। ছোটবেলায় যখন পিসির বাড়ি যেত বরুণ তখন পিসিদের যৌথ পরিবার। পিসেমশাইদের চার ভাইয়ের বাড়ি, একগাদা বাচ্চাকাচ্চা, সারাক্ষণ বাড়ি জুড়ে হইহই লেগে আছে। পল্টুকে বরাবরই ভাল লাগত বরুণের, বেশ জমত বরুণের সঙ্গে পল্টুর, আজ জামা বাছাই করতে করতে সেটাই ভাবছিল। ভাবছিল ছোটবেলার কথা। তবে ভয়ও বিলক্ষণ ছিল, মানুষ তো আসলে বড় হয়ে পালটে যায়। তাই যদি ব্যবহার খারাপ করে, আর কিছুই না। বরুণের খুব কষ্ট হবে।

বরুণদের কোম্পানির শেয়ার কিনে নিচ্ছে সেনগুপ্ত মিলস নামের একটি সংস্থা। সেই সংস্থার মালিক অর্ক সেনগুপ্ত ওরফে তার পিসির ছেলে পল্টুর সঙ্গে দেখা করতেই বরুণের ভেঙ্কটেশ টাওয়ারে যাত্রা। না, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে বরুণ চাকরি বাঁচানোর তাগিদে মিস্টার সেনগুপ্তের বাড়ি যাচ্ছে। বরং বরুণ কোনোভাবেই মিস্টার সেনগুপ্তের সঙ্গে কোম্পানির বিষয়ে কিচ্ছু আলোচনা করবে না ভেবেই এসেছে। পল্টু যদি প্রসঙ্গ তোলে তাহলেও নয়। অন্য কথার ফাঁকে এড়িয়ে যাবে। হঠাৎ পল্টুর চেন্নাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার কারণ, এর আগে সে অনেকবার চেন্নাই এসেছে, কিন্তু কোনবারই পল্টুর সঙ্গে দেখা করতে যায়নি। হয়ত ভেবেছে যে ওরা এত বড়লোক আবার সেখানে গিয়ে কি লাভ। কিন্তু এই গেল বছর যখন পিসি মারা গেল, চেন্নাই থেকে পল্টু আসার আগেই বরুণ নিজের কাঁধে সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল। আর কেনই বা নয়। বড় পিসি বরুণের অত্যন্ত প্রিয়। ছোটবেলার অনেকটা সময় সে বড়পিসির কোলেই মানুষ। বড়পিসি এক থালায় ভাত আর মাছের ঝোল মেখে বরুণকে আর পল্টুকে খাইয়ে দিতেন ছোটবেলায়। এর

গালে এক দলা ভাত, আবার ওর গালে এক দলা ভাত। এমনকি কম্পিটিশান হত কে আগে গিলে নিয়ে হাঁ করতে পারে। বড়পিসি শ্রাদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর পল্টু এসে ওকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছিল, বরুণের হাত ধরে বলেছিল- "সত্যি তুই ছিলিস বলে কাজটা ভালভাবে হল। দেখ আমার এমন কপাল অফিসের ঝামেলা মিটিয়ে আসতে আসতেই সব শেষ। মায়ের মুখটাও দেখতে পেলাম না।" পিসিও পল্টুর বিষয়ে বোধহয় একই কথা বলতে চেয়েছিল বরুণকে। বরুণ পল্টুকে দোষ দেয়নি। সত্যিই তো এইভাবে হঠাৎ করে চেন্নাই থেকে আসতেও তো কিছুটা সময় লাগে। এত বড় কোম্পানির মালিক। ফিরে যাওয়ার সময় পল্টু বারবার বলেছিল, এবার চেন্নাই এলে আমার বাড়ি একবার আসিস।

তখনও বরুণ জানত না যে তাদের কোম্পানির শেয়ার কিনে নেবে সেনগুপ্ত মিলস। অফিসে কানাঘুষো শোনার পর একদিন জানতে পারে যে সেনগুপ্ত মিলস এর মালিক অর্ক সেনগুপ্ত আসলে তার পিসির ছেলে পল্টু। জানা মাত্র সে অফিসে একেবারেই হইহল্লা করেনি। কাউকে জানায়নি, পাছে সবাই এসে তাকে মিস্টার সেনগুপ্তের ভাই হওয়ার সুবাদে খাতির করে বা বিরক্ত করে।

চেন্নাইয়ে এসে কি মনে হতে পল্টুকে একটা এসএমএস করেছিল বরুণ, উত্তর এসেছিল উইকএন্ডে এই ঠিকানায় চলে আয়। সেইমত বরুণ সাদা জামা পরে পল্টুর বাড়ির দিকে রওনা দিল। মা তাকে ফোন বলে দিয়েছিলেন যে "ওদের বাড়ি যাচ্ছিস এইসব ভিখিরি মার্কা পাঞ্জাবি আলখাল্লা না পরে ভদ্রভাবে শার্ট আর প্যান্ট পরে যাস। আর অবশ্যই জুতো।" মা জোর করে ব্যাগে জুতোজোড়া ঢুকিয়ে দিয়েছে কলকাতা থেকে আসার সময়। বরুণ জুতো খুব একটা পরে না, পায়ের ঘামের দুর্গন্ধ হয় বলে। তাও আজ জুতোটায় বেশ খানিকটা গন্ধ ওয়ালা পাওডার দিয়ে বরুণ রওনা দিল ভেঙ্কটেশ টাওয়ারের দিকে।

টাওয়ারে ঢোকার মুখে সিকিউরিটি অর্ক সেনগুপ্ত নামটা লিখতে দেখে কি তারদিকে একবার আড়চোখে দেখে নিল? ঠিক বুঝে উঠতে পারে না বরুণ। লিফটে দাঁড়িয়ে মনে হয় ইশ! পল্টুর ছেলের জন্য কিছু নিয়ে যাওয়া হল না। তবে কি যে ঠিক নিয়ে যাবে বুঝে উঠতেও পারল না। নিশ্চয়ই সাধারন ডেয়ারি মিল্ক ক্যাডবেরি খায় না পল্টুর ছেলে। লিফটের দরজা খুলতেই দেখতে

পেল বাঁ দিকে দরজায় জ্বলজ্বল করছে নামটা। অর্ক সেনগুপ্ত। কেমন এক অজানা গর্বে ভরে উঠল বরুণ।

দরজায় বেল টিপতেই হাসিমুখে এগিয়ে এল অর্ক। বলল সে নাকি বরুণের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বরুণ ভিতরে জড়সড় হয়ে ঢুকে ড্রয়িং রুমে রাখা বিশাল সোফাটার একটা কোণে চুপ করে বসে পড়ল। উল্টোদিকের সোফায় অর্ক। হাসিমুখে অর্ক জানতে চাইল বাড়িতে সবাই কেমন আছে? এখানে কোথায় উঠেছে বরুণ? ওর কাজকর্ম কেমন চলছে? ইত্যাদি। এবং সবেতেই বরুণের উত্তরও একটি শব্দেই সীমাবদ্ধ থাকল। অর্কর স্ত্রী পাশের ঘরে ছেলে তোজোর সঙ্গে পোকোমন দেখছিল। সেও একবার বেরিয়ে এসে বরুণের সঙ্গে হাসি বিনিময় করে আবার ফিরে গেল। কাজের মেয়ে একটা প্লেটে ছয় পিস গোল গোল কি একটা বড়া রেখে গেল আর কাঁটাচামচ। বরুণ কাঁটা দিয়ে সেই একটি বড়া কাটতে গিয়ে বুঝল বেশ কঠিন। অর্ক হাসিমুখে জানাল পুরো বড়াটাকে কাঁটা দিয়ে তুলে নিয়ে টমেটো সসে মাখিয়ে কামড়ে খেতে হয়। কেটে খাওয়া যায় না। এর নাম চিকেন নাগেট। অর্করা এখন ভেজ খায় সপ্তাহে ছয় দিন কিন্তু বরুণ আসবে জেনে ওরা এটা নিয়ে এসেছে। বরুণ নাগেট খেতে খেতে ফ্ল্যাটের সবদিক দেখে, দেখে সেই বিশাল বারান্দার ওপারে ঝুলে থাকা সব বিশাল টাওয়ারগুলোর মাঝখান দিয়ে দেখা যায় ঘিঞ্জি শহর। কিন্তু এই এত গাড়ি ট্র্যাফিক এসবের কোনও শব্দ ধোঁয়া কিচ্ছুই এসে পৌঁছায় না। এই পঁচিশতলার ফ্ল্যাটে। কি দারুন! ঠিক সিনেমার মত। বরুণ বারান্দার দিকে তাকাচ্ছে দেখে অর্ক বলে যা না একবার দেখে আয়। আয় তোকে সমুদ্র দেখাই। বরুণ বারান্দায় গিয়ে সমুদ্র দেখতে পায় দূরে। সমুদ্রের ঢেউ, মেঘ ছাড়িয়ে যেন আরও দূরে দেখতে পায় তার শৈশবের ভাত মাখা থালা, পিসির বাড়ির ছাদ আর পল্টুকে।

চিকেন নাগেট শেষ হয়। বরুণ চলে যেতে চাইলে অর্ক বলে চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি। লিফটের দরজা বন্ধ হয় লিফট নামতে থাকে। পাঁচ তলায় এসে লিফটের দরজা খোলে দরজা দিয়ে ঢুকে আসতে চায় একজন প্লাম্বার কিংবা মিস্ত্রি গোছের লোক। এই রকম লিফটে সে লোক বড্ড বেমানান। অর্কর চোখ কুঁচকে যায়, গলার স্বর বদলে সে হিন্দিতে লোকটাকে বলে – "ইস লিফট মে নেহি। সিঁড়িসে যাও।" ভীত চোখে লোকটি সরে যায়। অর্ক লিফটের দরজা বন্ধ করে

আবার স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আবার বরুণের দিকে তাকায়। বরুণ ডিজিটাল প্লেটে উঠতে থাকা ফ্লোর নাম্বারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

নিচে নেমে অর্ক বলে- তুই চিন্তা করিস না, তোদের কোম্পানি থেকে আমরা লোক ছাঁটাই করব না। বরুণ হাসিমুখে বলে - আসি। রাস্তায় নেমে বরুণ দেখতে পায় সেই লোকটাকে একটা চায়ের দোকানে চা খাচ্ছে। বরুণ চায়ের দোকানে গিয়ে লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে এককাপ চা অর্ডার দেয়। লোকটি বরুণকে চিনতে পারে কিনা জানা নেই, তবে সামান্য সরে যায় তার থেকে।

আমার কাছে মৃত মানে...

উদীচ্য

আমার কাছে মাংস
মানেই মৃত শিরদাঁড়া।
খুঁটে খায় একযোগে
তিনটে ধারালো ঠোঁট।
ঘৃণা জমে পোড়া ছাই,
উটকো পাকসাটে ধুম,
আট অক্ষরের উপসংহারে...
বিস্মরণের গোধূলি...
আর কলেজ স্ট্রীটে ঘুম।
সিগারেটে রাতের নৌকো
জ্বলছে আদিম লোভ।
আমার কাছে মৃত
মানেই শব্দ হারানো ক্ষোভ।
ছড়ানো স্প্লিনটার জানে
কবিতার জন্ম হয়......
বিস্ফোরণে।

আকাশী

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশকে অনুবাদ করতে হলে
নির্জন জ্যোৎস্নার ভাষায়
ঘরের ভেতর জোনাকিদের ঘুরপাক খেতে হবে
ঘুমেরা তাই সব নিরুদ্দেশ

দূরবীন-মন ছোটে ছায়াপথে
নক্ষত্রপুঞ্জের শেষ সীমানায়
কালপুরুষকে অনুবাদ করতে গেলে
উদাসী মন ঠিকানা হারায়

সাতটা পাঁচের শিয়ালদা লোকালে
সন্ধ্যেরাতের জ্যোৎস্না মেখে
বুকের বারুদ-মনে দরজা হারায়
জানলার ধার ক্রমে জোনাকি খোঁজে

অন্ধরাতে ঘুমেরা এখন নেই
দূরবীন-মন নক্ষত্রের শেষপথে
নির্জনে জ্যোৎস্নাদের ডাকতে হবে আজ
আকাশকে অনুবাদ করতে হলে

ঝড় থেমে হেঁটে আসা কিছুদূর

নবকলম

(১)

ঝড়ে ডানা ভাঙা পাখিরও কি পুনর্বাসন হয়?
আর উড়তে পারবেনা এ সত্য সামনে আসার পরেও
সে কি আর পাখি থাকে?
পাখি জীবন শেষ হলে কি সে মানুষ হয়ে যায়?
মানুষের তো পুনর্বাসন হয়, তাই না?

(২)

বাবা বলতেন জীবনের মাত্র পাঁচ শতাংশে

কোনও সঙ্কট নেই।
আর বাকিটা জুড়ে শুধুই কুয়াশা,
নভেম্বরের শেষের দিকের মতো করে।
কখনো শহরের কুয়াশা, কখনো বা শহরতলির।

খুব খরচের সময়ে এক নভেম্বরেই রিটায়ার
করেছিলেন বাবা।

মারণ টান

চিরন্তন মিত্র

দত্তদের ঝিলধারে বিকালের মরা রোদ জলে লেগে চারিদিকে কমলা রং ছড়িয়ে দিচ্ছে। হালকা বাতাস জল ছুঁয়ে এসে আলগা ঝাপটা মারছে মাঝে মাঝে। শহরের এইদিকটা বেশ নিরিবিলি, কংক্রিট এখনও সবুজকে টেক্কা দিতে পারেনি। তবে যে ভাবে এগিয়ে আসছে সবুজ কতদিন যে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সেটা বলা মুশকিল। এই ঝিলটা হয়ত থাকবে কিন্তু গাছগাছালি যাতে বসত করে হাজারো কাক, কোকিল, ফিঙে, টিয়া বা কাঠবেড়ালি তারা হয়তো উৎখাত হবে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় করে দিতে চিরকালের মত। তাতে কার বা কি আসে যায় এদের তো আর পুনর্বাসনের দাবি নেই আর অনশনেও বসতে পারবে না সেই বোধও নেই, অতএব।

বাড়িতে ফিরলে রোহান এখানেই এসে বসে বিকেলের দিকটায়। সে একমনে দেখছিল আস্তে আস্তে আবছা হয়ে যাওয়া নিজের ছায়াটাকে। আলো যত কমে আসবে ছায়াটা ধীরে ধীরে নিজেকে অন্ধকারে হারিয়ে ফেলবে। সময়, সময় আর সময় যেন মানুষ কে তাড়া করে বেড়ায়, সব কিছুকে কেমন যেন অবলীলায় বদলে দেয়, কেড়ে নেয় আবার ফিরিয়েও দেয় মর্জিমাফিক।

রোহান এই শহরে বড় হয়ে উঠলেও সেরকম কোন টান গড়ে ওঠেনি তাদের মধ্যে। কিছু বা কারোর প্রতি টান গড়ে উঠেতে গেলে মেলামেশা করতে হতে হয়, তাকে সময় দিতে হয় বোঝার ও বোঝানোর, কিন্তু সে সুযোগ সময় তাকে দেয় নি।

আজ প্রায় বারো বছর হয়ে গেল সে তার জন্মশহরে অনিয়মিত। রোহানের বাবা শমিক বাসু এখানকার প্রতিষ্ঠিত মিশনারি স্কুলের শিক্ষক। তাদের সংসারে সচ্ছলতা না থাকলেও সেরকম অভাব থাকেনি কোনদিনই। শমিক বাবুর এক অদ্ভুত গুণ ছিল তিনি ছাত্র চিনতে ভুল করতেন না। আজকের দুনিয়া যাকে বলে কেরিয়ার কাউন্সিলিং, সেটা তিনি করতেন প্রায় নির্ভুল। কোন ছাত্র কি করতে পারবে বা কোনদিকে গেলে ভাল হবে তার দিশা তিনি যেন আগাম দেখতে পেতেন, যেমন ছাত্র থাকাকালীন অঙ্ক করতে করতে মাঝপথেই উত্তর দেখতে পেতেন।

রোহান ছোটবেলা থেকেই দুঃসাহসী, উচ্চমধ্যমেধাসম্পন্ন ও জেদি কিন্তু যেটা প্রথম দর্শনেই চোখ টানে সেটা হল তার শারীরিক গঠন। এইরকম শারীরিক গঠন বাঙালিদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার তার শরীর।

শমিকের ভুল হয় না এইরকম প্রতিভাকে চিনে নিতে। ক্লাস এইট থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দেন শমিক সঙ্গোপনে। পড়াশুনোর পাশাপাশি চলতে থাকে তার শারীরিক সক্ষমতা বাড়াবার অনুশীলন। রোহান এত কিছু না বুঝলেও কেমন যেন নেশা ধরে যায় তার, প্রাণ দিয়ে পালন করে তার বাবার তৈরি করে দেওয়া রুটিন। নির্দিষ্ট দিনে ছেলেকে নিয়ে যান নির্দিষ্ট আর্মি ক্যাম্পাসে। সে অবলীলায় পার করে সব ধাপ। তারপর সোজা ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি, খারাকওয়াশলা, পুনে।

কেমন যেন ঘোরের মধ্যে কেটেছে এই দশ বছর। একবার করে বাড়ি ফিরেছে ঠিকই কিন্তু মন পরে থেকেছে ট্রেঞ্চে, বাঙ্কে, বারাকে, নাক খুঁজেছে বারুদের গন্ধ, চোখ ঘুরে বেরিয়েছে শত্রুসন্ধানে, কান খাড়া হয়ে উঠেছে সামান্য শব্দে। কাজের প্রতি এই নিষ্ঠা তাকে অল্প সময়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে, শমিক স্যারকে আরও একবার নির্ভুল প্রমাণ করে। এইভাবে আস্তে আস্তে এই শহর তার সত্তা থেকেও হারিয়ে যায়। কেবল এই ঝিলের পারটুকু তার অবচেতনে কেমন যেন ঠিক জায়গা করে রেখেছে, এখানে এলে সে যেন স্নেহের পরশ পায়, যেন স্মৃতি ফিরে পায়, ফেলে আসা সময়কে স্পর্শ করতে পারে অনায়াসে।

বাবাকে খুব ভয় করলেও স্কুল পালানোটা সে ভালই রপ্ত করেছিল শেষ দুই বছরে। যেহেতু পড়াশোনাতে সে ফাঁকি দিত না তাই বাবাও অতিরিক্ত শাসন করতেন না বরং অল্প আড়াল করে প্রশ্রয় দিতেন তার এই অল্প অবসর বিনোদনকে।

হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে সে চলে যায় ঝিলের পশ্চিম পারে গাছ গাছালি যেখানে একটু ঘন হয়েছে, নির্ভুল ভাবে খুঁজে নেয় সেই পিপুল গাছ যার তলায় সে আর সুনীল প্রথম সিগারেট খেয়েছিল বাবার প্যাকেট থেকে চুরি করে। কত সাবধানতা নিয়েছিল বাড়িতে যেন টের না পায়। অল্প হেসে একটা সিগারেট ধরায়। ডান দিকে অল্প ঘুরে অল্প ফাঁকা জায়গা নেড়া একেবারে। হঠাৎ একটা মুখ মনে পরে, চোয়ালটা একটু শক্ত হয়ে চোখটা ঠিক আটকে যায় একটা বৃত্তে।

সেদিন বিকেল দুটো আড়াইটে বাজে, তখন স্কুল থেকে বেরিয়েছে। একটা ছেলে তার থেকে বড় কিন্তু নিচু ক্লাসে পড়ে হাত তুলে ডাকল। সে এগিয়ে যেতেই দুটো সিগারেট দেখিয়ে বলল ঝিলের ধারে চ'। সে তখন দু'দিন সিগারেট খায়নি। নিশি ডাকের মতো চলল তার ডাকে, ঝিলের দিকটা দুপুরের দিকে একেবারেই ফাঁকা থাকে। ছেলেটি তার হাত ধরে ঠিক এই জায়গায় এসে থামল দুটো গাছে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরাল। ছেলেটা অদ্ভুতভাবে তার গায়ে লেপটে বসেছে আর উরুতে হাত দিচ্ছে।

সে অল্প সরে বসতেই সে আরও ঘন হয়ে এসে আর একটু উপরে হাতটা ওঠাল। রোহান একটা অদ্ভুত শিরশিরানি বোধ করতে থাকে। হাতটা অল্প উঠে পাকড়ে ধরে পুরুষাঙ্গ, ওপর নীচ করতে থাকে, শরীরটা অবশ হয়ে যায় চিনচিনে ব্যথাবোধ হয় কুচকিতে। হঠাৎ হুঁশ ফেরে, জ্বলন্ত সিগারেট ছেলেটার হাতে বসিয়ে দেয়। আর্তনাদ করে ছিটকে যায় ছেলেটা মুখ বিকৃত করে অকথ্য ভাষায় গালি উচ্চারণের সাথে সাথে চোয়ালে একটা ঘুসি মারে রোহান। ছেলেটা ছিটকে পড়তেই সে প্রাণপণে দৌড়ায়। একেবারে এসে থামে দুর্গা মণ্ডপের পাশে টিউবওয়েলের ধারে। চোখে মুখে জল দিয়েই খেয়াল হয় প্যান্টটা ভিজে গ্যাছে আর একটা আঁশটে গন্ধ, জল দিয়ে ধুতে থাকে।

হঠাৎ ভক করে সেই গন্ধটা আবার পায়, সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় বৃত্তের মাঝখানটা লক্ষ্য করে, হাঁটতে থাকে বাড়ির দিকে দ্রুত।

এবারে দিনগুলো খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল দেখতে দেখতে। বাড়িতে বিয়ের কথা চলছিল, দু'একটা জায়গায় যেতে হয়েছিল। সেও চাইছিল নৌকা বন্দরে ভেড়াতে। তার জীবিকার সাথে নারী এসছে জীবনে নানাভাবে, নানারূপে দুয়েকজনকে ভাল লাগেনি তা নয় তবে ওই আর কি ! সম্পর্ক গড়ে উঠতে গেলে যে সময় লাগে তা তাকে দেয়নি তার জীবিকা। আর তা ছাড়াও একটা মুখ ছিল মনের মধ্যে যার সাথে বোঝাপড়া করে নেওয়াটাও দরকার।

অস্মিতা সেন। দোহারা ছিপছিপে ছেহারা, টানা টানা চোখমুখ। রোহানদের বাড়ি থেকে চার পাঁচটা বাড়ি পরেই থাকে। অস্মিতার বাবা সেনকাকু একটা বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। অস্মিতা রোহানের থেকে মাস দুই তিনের ছোট হলেও একই সাথে পড়ত। অস্মিতা আসত শমিক

স্যারের কাছে অঙ্ক করতে। শমিক বাবু বাড়িতে পড়ানোর পক্ষপাতী না হলেও অসীম সেনের কথা ঠেলতে পারেন নি। সপ্তাহে তিনদিন সে পড়তে আসত রোহানের সাথেই। পড়ার ফাঁকে ফাঁকেই আলাপ চলত। পরের দিকে এক-আধবার ঝিলের ধারে বেড়াতেও গেছে দুজনে দুজনের হাত ধরেছে। শেষ দিকে আপত্তি আসত অস্মিতার দিক থেকে, এড়িয়ে যেত রোহানকে।

পুনে যাবার দিন দুই আগে কিছুটা জোরাজুরি করেই অস্মিতাকে এনেছিল ঝিলপারে। অস্মিতার হালকা লাল রঙা কাপড় ম্লান করে দিয়েছিল সূর্যের অস্তরাগকে। জমে থাকা মেঘ কেটেছিল এক দমকায়। অদ্ভুত ভাললাগা ঝিম ধরিয়েছিল দুজনের মনে। ঘন হয়ে এসেছিল দুজনে। ঝিলের বাতাস অস্মিতার চুল উড়িয়ে বারবার ফেলছিল রোহানের মুখে, সরাতে গিয়ে ছোঁয়া লাগছিল গালে, কানে, লাল হয়ে উঠছিল অস্মিতা। অজান্তে ঠোঁটে ঠোঁট লেগেছিল, প্রাণ যেন প্রাণ থেকে রস টেনে নিচ্ছিল। রোহানের অপটু হাত হাতড়াচ্ছিল কিশোরীর শরীর। সম্বিত ফিরেছিল একটা ঠেলাতে, তারপর ঠাস করে একটা চড়। আচমকা ছন্দপতনে বিহ্বল রোহান দেখতে পেয়েছিল একটা লাল শরীর ছিটকে বেরিয়ে গেল। কানে বাজল একটা কথা “আমার সাথে তোর আর কোনও সম্পর্ক নেই, লম্পট কোথাকার।” অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল রোহান, মুখটা নোনতা থেকে তেতো হয়ে গিয়েছিল। টলতে টলতে বাড়ি ফিরেছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও দরজা খোলেনি আর সেই রাত্রে। সম্পর্ক এখানেই শেষ গিয়েছিল, যদিও রোহান অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু সাড়া পায়নি। কিন্তু একটা টান থেকে গিয়েছিল যে জন্য সে কোনদিনই তারপর থেকে মেয়েদের সাথে আলাপে আর সহজ হতে পারে নি, যেন মনটা বন্ধক রেখেছিল অস্মিতার কাছে।

সেনবাবুদের অবস্থা অনেক দিন থেকেই পড়ন্ত। সংসারের ভার অস্মিতার কাঁধে। সে শুনেছে অস্মিতা কোন কলসেন্টারে কাজ করে। রাতের দিকে ডিউটি। কানাঘুসো অনেক কিছুই শুনতে পায় কিন্তু বিশ্বাস করেনি কোন দিনও বা চায়নি। তবে একটা ব্যাপার তাকে আশ্চর্য করে তা হল অস্মিতাদের বাড়ির প্রাচুর্য। ইদানিং শুনেছে অস্মিতার শরীর নাকি ভাল যাচ্ছে না মাঝে মাঝে জ্বর আসে, দুর্বল থাকে শরীর, তবে রাতে আপিসে যায় নিয়মিত, দু-একবার দেখাও হয়েছে, এড়িয়ে যেতে চাইলেও সে জোর করে কথা বলেছে, আর তার সাথে ঝিলের ধারে দেখা করার প্রস্তাবে রাজি করিয়েছে প্রায় জোর করে, এই শনিবারে।

এই সাক্ষাৎ খুব জরুরি রোহানের কাছে, বন্ধ তালাটার চাবি চাইতেই হবে এইবার।

শনিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ রোহান চলে আসে কথামতো জায়গাটায়। অস্মিতা আসে আরও মিনিট দশেক পর, পরনে নীল জামদানি, কিন্তু মুখটা যেন কেমন ফ্যাকাসে। খুব গরম পড়েছে ক'দিন ধরে, চারধারটা কেমন গুমোট বেঁধে আছে। গাছের পাতা নড়ছে না একটুও, পাখিগুলো সেভাবে ডাকছে না যেন সব থম মেরে আছে কিরকম যেন একটা।

রোহান রুমাল পেতে দিয়ে অস্মিতাকে বসতে বলে। দুজনেই চুপ, দেওয়ালে প্রথম ঘা টা মারে রোহান।

-কেমন আছে শরীর?
-ভাল।
-আজ আপিস আছে?
-হুঁ।
-কটায় বেরুবি?
-এই ন'টা সাড়ে ন'টা।
-আজকাল এড়িয়ে যাস কেন এত?

অস্মিতা আলগা হাত রাখে রোহানের কাঁধে। রোহান মুখ ঘুরিয়ে তার চোখে চোখ রাখে। অল্প লাল খেলে যায় তার মুখে। যেন অনেক কিছু একসাথে বেরিয়ে আসতে চায় বাঁধ ভেঙে, শুষ্ক বালুচরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ছড়িয়ে দেবে বুকে জমা করে রাখা অভিমানকে। রোহান হাত দিয়ে মুখটাকে অল্প তুলে ধরে, অস্মিতা দু'হাত দিয়ে কাঁধ দুটো জড়িয়ে ধরে আত্মসমর্পণ করে দ্বিধাহীন ভাবে যেমন সৃষ্টি উন্মুখ প্রকৃতি চিরকাল করে এসছে পুরুষের কাছে। স্থান, কাল, পাত্র সব বোধ লুপ্ত হয় সৃষ্টি মাঝে জেগে থাকে দুটি শরীর, শীৎকার মিশে যায় পাখিদের কোলাহলে। অল্প বাতাস ছুঁয়ে দেখে দুজনকে, ভালবাসার ওমকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এক টানে খুলে যায় বন্ধ সিন্দুকের দরজা, আঁশটে গন্ধটা তৃপ্তি নিয়ে আসে মনে, সাথে এক অনাবিল মুক্তির আনন্দ।

সেনাবাহিনীতে রোহান ইদানিং আলোচিত নাম। বাড়ি থেকে ফেরার পর দুটো দুঃসাহসিক অভিযানে তার কর্মকুশলতা উচ্চপ্রশংসিত আর আলোচিত। কিন্তু আজকাল যেন ভিতর থেকে ভেঙে যাচ্ছে সে শারীরিক ভাবে, হঠাৎ জ্বর আসে প্রায়ই, দুর্বল করে দেয় শরীরকে। কেবল মানসিক শক্তির জোরে সে দৌড়ে যাচ্ছে, ফিনিশিং লাইনটা কেবল দূরে সরে যাচ্ছে কিন্তু তার দম তো শেষ হয়ে আসছে আস্তে আস্তে বুঝতে পারে। অস্মিতার লেখা চিঠিগুলো যেন কেমন বিষাদভরা। কিছু বলতে চাইছে কিন্তু বলতে পারছে না। সব মিলিয়ে এক দম বন্ধ পরিবেশ।

দরখাস্ত করে ছুটির, মঞ্জুর হয় দীর্ঘ সাত মাস বাদে সে বাড়ি ফিরবে আবার। ছুটি মঞ্জুরের চিঠি হাতে করে কোয়ার্টারে ফিরতেই, ফোনটা বেজে ওঠে। মার গলা শুনে অবাক হয় হঠাৎ।

....

-কি বলছ কি অস্মিতা আর নেই, মানে মারা গ্যাছে?

-............

-অস্মিতার এইডস হয়েছিল?

-............

-লুকিয়ে রেখেছিল ওরা, আমি বিশ্বাস করি না।

-............

-ওর পেটে বাচ্চা ছিল প্রায় ৬ মাসের কি বলছ কি?

-............

- কি অস্মিতা শরীর বিক্রি করত !!!

রোহানের গলাটা কেমন কেঁপে যায়। টেলিফোনটা হাত থেকে পড়ে যায়, ঘুরে দাঁড়িয়ে সে ছুঁড়ে ফেলে জড় বার্তা বাহকটিকে।

জানলা ভেঙে মায়ের বাবু ডাকটা মিলিয়ে যায় পাশের পাহাড়ে।

চেয়ার ধপ করে পড়ে যায় শরীরটা। তাপ বাড়তে থাকে শরীরে, রক্তগুলো ধাক্কা মারে ঘিলুতে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফিনিশিং লাইনটা। ড্রয়ার খুলে সার্ভিস রিভলবারটা তুলে নেয়। হাত বোলায় স্নেহে যেন কৃতজ্ঞতা জানায় আমৃত্যু সঙ্গীকে।

হঠাৎ বিকট শব্দে আর্দালি ছুটে আসে, চেনা শব্দ তার পরিণামও জানা। অভ্যাস মত নক করতে গিয়েও থমকায়, দরজা খুলে দেখে মেঝের রঙ লাল, জানালা দিয়ে দ্যাখে সূর্যও পাহাড়চূড়ায় লাল মাখিয়েছে। অস্ফুটে বলে ওঠে "অভিশপ্ত বাংলো।"

আস্তে আস্তে হেঁটে যায় অফিস টেলিফোনের দিকে হেড কোয়ার্টারে খবর দিতে।

একা অধিরথ

ভাস্কর লাহিড়ী

পরিপাটি সাজানো একখানা ড্রইংরুম, পেছনে সাদা পর্দা।। কোন এক ছুটির দিন সকাল।।

প্রভাত ডিভানে আধশোয়া হয়ে একখানা বই পড়ছেন। তীর্থ একটা ট্যাবলেটের ফয়েল নিয়ে বিরক্ত মুখে নাড়াচাড়া করছে। ক্ষণিক স্তব্ধতার পর শান্ত পরিবেশে নাটকের সংলাপ শুরু হয়।।

তীর্থ – নাঃ এই ওষুধ কোম্পানিগুলো যা ঠকবাজি শুরু করেছে! ধ্যুস এর এক্সপায়ারি ডেট বোঝে কার সাধ্য! দেখ ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং জায়গাটা কেমন ঘসা; নাঃ এটা তোমায় দেওয়া যাবে না – নতুন একপাতা আনতে হবে,

প্রভাত - কি, কিসের ওষুধ ওটা? তুই আমাকে একবারে মেডিকেটেড করে দিচ্ছিস ক্রমশ, চাড্ডি ওষুধ খেয়ে বেঁচে থাকার মানে হয়!

তীর্থ - ভয় নেই, ওষুধ দিয়ে তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি না, আপাতত গ্যাস-অম্বলের হাত থেকে রক্ষে করতে চাইছি।

প্রভাত - ওঃ ওটা অম্বলের ওষুধ! কিন্তু কৈ আমার তো অম্বল হয়নি –

তীর্থ - হবে, সকালবেলাই যেভাবে কাঁচা পাঁউরুটিগুলো গিললে তাতে ওটা হবে। আর ওটা থেকে বাঁচাতেই এটার দরকার। কিন্তু এটা জ্যান্ত না মরা তাই তো বুঝতে পারছি না, নাঃ এটা দিয়ে হবে না। আমি তো বেরোচ্ছি, ক'টা র‍্যানট্যাক নিয়ে আসব। (টেবিলের ওপর ওষুধ রাখতে গিয়ে ছোট ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা ধাক্কা খায়) আরে ধ্যুর, এই ছবিটা ঘটের মতো সবসময় তোমার এই টেবিল জুড়ে থাকে কেন বলো তো?

প্রভাত - আরে ওটা কোথায় নিচ্ছিস, ওটা তোর ছোটবেলার ছবি

তীর্থ - ছোটবেলা নয়, ছোট্টবেলার-যার সাথে এবেলা-ওবেলায় কোন মিল নেই। এটা আর এখানে থাকবে না।

প্রভাত - তো কোথায় থাকবে?

তীর্থ - এটা এটা থাকবে ওঘরে তোমার হোমিওপ্যাথি বাক্সের পাশে। লাইক মিঃ হ্যানিমান।

প্রভাত - হাঃ হাঃ তাহলে তো বাক্স খুললেই হাত পেতে দাঁড়াবি গ্লোবিল খাবি বলে

তীর্থ - বেশ করব। দাঁড়াও এটা রেখে আসি ও ঘরে, এসে কিন্তু আমি বেরোব – [বলতে বলতে ভেতরে যায়]

প্রভাত - তুই বেরচ্ছিস মানে –

তীর্থ - হ্যাঁ একবার বেরোতে হবে, লাইব্রেরি যাব –

প্রভাত - তারপর?

তীর্থ - (বেরিয়ে আসে) তারপর আবার কি! ওঃ ভয় নেই তাড়াতাড়ি চলে আসব। সকাল এগারোটায় একটা মিটিং আছে, থাকতে পারব না সেটাই বলে আসি, ফেরার সময় তোমার ওষুধ নিয়ে আসব।

প্রভাত - সে না হয় হল, কিন্তু এদিকে?

তীর্থ - এদিক ওদিক সবদিকই ঠিক থাকবে, আমি এসে রান্না করব –

প্রভাত - ব্যস হয়ে গেল, তার মানে আজও সেই ডিমের কারি – ভাত!

তীর্থ - আজ্ঞে না, কালই চিকেন এনে রেখেছি, দ্যাখ না আজ তোমাকে কেমন ক্যাপসি-চিকেন বানিয়ে খাওয়াই,

প্রভাত - এই ক্যাপসিকাম দিয়ে চিকেন রাঁধবি, তাহলে এক কাজ কর না – ভাত না রেঁধে ক'টা রুটি বানিয়ে ফ্যাল, চিকেনের প্রিপারেশনটা রুটির সঙ্গেই ভাল যাবে –

তীর্থ - আহা রে! হাঁ করে দিল্লি বল; রুটি বানাতে গেলে আটা মাখো রে, লেচি কেটে কেটে সেগুলো গোল গোল করে ব্যালো রে, তারপর তা গরম গরম সেঁকে বুড়োকে খাওয়াও রে, মজা আর কি! তাছাড়া বুড়ো হতে চলেছ, এখন এত নোলা ভাল না। ব্রেকফাস্টে ডাহা ডুবিয়েছ, ডিম-পাঁউরুটি আর হরলিক্স গিলিয়ে সেরেছ। ওবেলা তোমার পালা, রুটি-লুচি-পরোটা যা খুশি খাইও। এবেলা স্রেফ ক্যাপসি-চিকেন আর ঝুরো ঝুরো গরম ভাত। ইয়েস, মনে করে একটা আচারের শিশি আনতে হবে। [ডোর বেল] কে বল তো?

প্রভাত – দ্যাখ হয়তো বেড়ালে ঘণ্টা বাজাচ্ছে, সকালবেলাই যা ক্যাপসি-চিকেনের গল্প ছড়িয়েছিস

তীর্থ - গল্প নয়, গল্প নয়; রেঁধে গন্ধ ছড়িয়ে দেব তখন বুঝতে পারবে – এই নাঃ, আগে এগুলো সরিয়ে ফেলি নাহলে বেড়ালের নাকে ডিম-টোস্টের গন্ধ লাগবে, [ডোর বেল] আসছি –

প্রভাত - আরে দরজাটা আগে খুলে দিয়ে যাবি তো – [ডোর বেল]

তীর্থ - আসছি, আসছি – [গেঞ্জির ওপর একটা জামা গলাতে গলাতে গিয়ে দরজা খোলে, দরজায় চিন্ময়]

চিন্ময় - হাঃ প্রভাত! সুপ্রভাত -

প্রভাত - সুপ্রভাত – তুই! আমি ভাবলাম বুঝি -

চিন্ময় – তুই ভাবলি বুঝি -?

তীর্থ - বেড়াল

চিন্ময় - কি! বেড়াল!

প্রভাত - (মুচকি হেসে) হ্যাঁ বেড়াল-বেড়ালই, তুই কি কিছু গন্ধ পেয়ে এলি?

চিন্ময় - মানে!

প্রভাত - ঘরে ঢুকে কিছু গন্ধ পাচ্ছিস?

চিন্ময় - কৈ না তো। (নাক টেনে) কিছু গন্ধ তো তেমন – কেন রে কিছু মরেছে-পচেছে?

প্রভাত - আরে না না, বেড়ালের নাকে আবার পচা গন্ধ লাগে নাকি, সে তো আঁশগন্ধ টের পায়; ওটা আমাদের একটা রসিকতা, তুই বোস।

চিন্ময় - তাই বল রসিকতা! তোদের রসিকতা উপাদেয় বটে, যদি জিভের টেস্ট-বাডগুলো সক্রিয় থাকে!

তীর্থ - কাকু চা?

চিন্ময় - চা! এক কাপ হয়ে গেছে, আচ্ছা দাও আর এক কাপ –

তীর্থ - ওল্ড ম্যান?

প্রভাত - অবশ্যই।

তীর্থ - উঁ! অবশ্যই!

প্রভাত - দিস তো হাফ কাপ লিকার, তায় না চিনি, না দুধ –

চিন্ময় - তীর্থ আমার কিন্তু বাবা দু'চামচ, ছোট চামচের,

তীর্থ - জানি, কিন্তু চিনি-চামচের মাপটা এবার পাল্টে ফেলুন – দুই-এর জায়গায় এক ঠিক আছে,

চিন্ময় - হাঃ হাঃ বয়সটা অ্যাপ্রোচিং-অ্যালার্মিং! কিন্তু দ্যাখো ব্লাডসুগার, কোলোস্টেরল, হার্ট, কোন প্রবলেম নেই, তাহলে আর দুধ-চিনি ছাড়া হয়ে সন্ন্যেস নিই কেন বল! তবে ঐ ছোট ছোট দু'চামচ।

তীর্থ - বেশ, আপনারা গল্প করুন আমি চা নিয়ে আসছি –

চিন্ময় - আহা এই দেখ চলে গেল, যেটা জানতে এসেছি – হ্যাঁ রে জয়েন্ট-এর তো রেজাল্ট বেরল, কেমন করল?

প্রভাত - ওঃ ভাল। দুটোতেই ভাল করেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ একটু বেশি ভাল, মেডিকেল-এ একটু কম।

চিন্ময় - একটু কম মানে?

প্রভাত - মেডিকেলে এক'শ-র মধ্যে আসতে পারেনি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফর্টি থ্রি র‍্যাঙ্ক করেছে।

চিন্ময় - বাঃ ব্রিলিয়ান্ট! বাপ কা বেটা। জিনিয়াস-এর জিন কথা বলছে প্রভাত! তা কি ঠিক করলি – ইঞ্জিনিয়ারিং?

প্রভাত - সে ওই জানে ও কি পড়বে, বলেনি তো এখনও কিছু –

চিন্ময় - সে কি রে এখনও আলোচনা করিসনি! সকালে উঠে সেসব নিয়ে আলোচনা না করে বেড়াল নিয়ে রসিকতায় মেতে আছিস! আরে এটা র‍্যাট রেসের যুগ। ইঁদুর-দৌড়ে পেছিয়ে পড়লে বেড়াল আর রসিকতা মানবে না, এক থাবায় শেষ করে দেবে।

প্রভাত - সেটা ওকে বল –

চিন্ময় - হ্যাঁ, বলব তো বটেই। ওর মতো ব্রিলিয়ান্ট যেদিকে কেরিয়ার করতে চাইবে সেদিকেই সাকসেস,

প্রভাত - উন্নতিটা চাওয়া চাই তো

চিন্ময় - তোরা দুজনেই সমান। সব ব্যাপারেই কেমন নির্লিপ্ত, চূড়ান্ত উদাসীন। নিজেও যেমন দুম করে প্রোফেসারিটা ছেড়ে দিলি তীর্থকে মানুষ করবি বলে, একটা

ছন্নছাড়া জীবন শুরু করলি, তীর্থটাও তোর ছত্রছায়ায় থাকতে থাকতে হয়ে উঠছে তোরই মত এক খামখেয়ালি, উদাসীন।

প্রভাত - তার মানে তুই বলছিস আমার ছায়া –

চিন্ময় - দাঁড়া, তোর ছায়ায় হোক মায়ায় হোক, তুই চাস ওর জীবনটা তোরই কার্বন কপি হোক!

প্রভাত - নাঃ। তবে আমার জীবনই বা ছন্নছাড়া দেখলি কোথায়! পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন একটা জীবন আমার। সংসারে দুটো প্রাণী, কারোর কোন বন্ধন নেই। আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী, মাঝে শুধু এক বন্ধনহীন গ্রন্থি। হাঃ হাঃ এটা একধরণের লিভ-টুগেদার বলতে পারিস –

চিন্ময় - হুঁ! রসিকতাও কত তিক্তরস পরিবেশন করতে পারে, তোর কাছে না এলে বোঝা যায় না।

প্রভাত - হাঃ হাঃ তার মানে তোর রসনার আস্বাদন কুঁড়িতে ধ্বসা রোগ ধরেছে।

চিন্ময় - তুই তোর মত করেই ভাব। এই তুই তখন থেকে ওটা কি হাতে নিয়ে বসে আছিস বল তো? কি পড়ছিস? নিশ্চই গুরু-গম্ভীর কিছু!

প্রভাত - আরে না না, এটা একটা উপন্যাস,

চিন্ময় - মনে তো হচ্ছে বেশ পুরনো, নিশ্চই কলেজস্ট্রীট থেকে আমদানি, হাফদামে!

প্রভাত - আমার হাতে আসার আগে এটার ঠিকানা ছিল ডালহৌসির ফুটপাত। এখন আর ছাপা হয় না। তীর্থকে বলে রেখেছিলাম, বারো টাকার বইটা ও পুরো দু’শ টাকায় কিনে এনেছে।

চিন্ময় - বলিস কি রে! কি নাম? কার লেখা?

প্রভাত - ‘ক্রন্দসী কাশ্মীর’, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের লেখা।

চিন্ময় - হুঁ, নামটা মনে হচ্ছে মল্লিকার কাছে শুনেছি একসময়, পড়া হয়নি।

প্রভাত - পড়ে নিস, প্রি–মর্ডাণ কাশ্মীর সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যাবি,

চিন্ময় - রক্ষে কর, কাশ্মীর সম্পর্কে যেটুকু জানি তাই যথেষ্ট।

প্রভাত - কতটুকু জানিস? কিছুটা জানলেও বুঝতে পারতিস দেশভাগের যন্ত্রণা কাশ্মীরিদের কাছে কতটা তীব্র! কতটা নির্মম!

চিন্ময় - এই শোন, ছিল – এখন নেই। দেশভাগের যন্ত্রণা আর সে কারণে দুঃসহ উদ্বাস্তু সমস্যা আজ এক বিটার নস্টালজিয়া মাত্র, যার মৃত্যু ঘটে গেছে প্রায় ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুর সাথে সাথে।

প্রভাত – কিচ্ছু জানিস না, কিচ্ছু না। না অতীত না বর্তমান –

চিন্ময় - কেন, কাশ্মীর মানেই তো ভারত-পাক সীমান্ত ঝঞ্ঝাটের কেন্দ্রবিন্দু; তাছাড়াও কাশ্মীর মানে শীত-শিকারা-আলোয়ান-আপেল। দাঁড়া দাঁড়া আরও আছে, এখন শুনতে পাই কাশ্মীরি লঙ্কা নামেও কি একটা বস্তু আছে, রান্নায় লাগে [তীর্থর প্রবেশ]

তীর্থ - বস্তুটা আসলে কাশ্মীরের শ্রীলঙ্কা। হ্যাঁ কাকু ঐ লঙ্কার রূপে শ্রী আছে, ঝোলে দিলে লাল হয়, ঝাল হয় না। (চা এগিয়ে দিয়ে) চিনি দু’চামচ –

চিন্ময় - থ্যাঙ্ক ইউ

প্রভাত - আসলে কাশ্মীর বল আর কলাবাগান সব জায়গারই ভূগোল ছাড়াও উৎপত্তির একটা ইতিহাস থাকে যা ঠিকঠাক জানা হয়ে ওঠে না অনেক সময়ই। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা দেশকে আমাদের জানা-চেনাতো অনেকটাই ‘ভ্রমণসঙ্গী’ নির্ভর আর কিছুটা টিভির দৌলতে ‘যাচ্ছি’ বা ‘চল যাই’ থেকে।

চিন্ময় - যাকগে, গুরুগম্ভীর ইতিহাস-ভূগোল ছেড়ে এখন আমি তীর্থর কাছে একটা কথা জানতে চাইব –

তীর্থ - আমার কাছে? কি কাকু –

চিন্ময় – বলছি জয়েন্টেতো এরকম ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করলে এখন কোনদিকে যাবে ঠিক করলে?

তীর্থ - ওঃ আচ্ছা! না এখনও সেরকমভাবে কিছু ঠিক করিনি!

চিন্ময় - সেকি! সবাই তো আগে থেকেই সব ঠিক করে রাখে আর তুমি এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারলে না? তোমার সামনে তো দুটো অপশনই খোলা রয়েছে, তবে আমি বলব ডাক্তারিটাই রাইট চয়েস হবে।

তীর্থ - হুঁ, ভাবছি। তবে আমি ভাবছি এসবের কোনটাতেই যাব না।

চিন্ময় - সে আবার কি!

তীর্থ - হ্যাঁ কাকু, আসলে আমি একটা অন্য লাইন নিয়ে ভাবছি –

চিন্ময় - অন্য লাইন! সে ভাল, তবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার – এদের একটা পে-ডিগ্রি আছে, রোজগার ভাল,

তীর্থ - আমি যেটা নিয়ে ভাবছি কাকু সে লাইনে রোজগার আনলিমিটেড, আর পে-ডিগ্রিতে এক নম্বর।

চিন্ময় - তাই নাকি! সেটা কোন লাইন বল তো? আমার মেয়েটা দু'বছর পর এইচ এস, জয়েন্ট দেবে, ওকে এখন থেকেই তৈরি করতে পারব। সত্যি, দেশ যত এগোচ্ছে কতসব নতুন নতুন লাইন খুলে যাচ্ছে, কি প্রভাত আমাদের সময় এতসব ছিল? লাইনটা কি বলো তো তীর্থ, কি করতে চাও তুমি?

তীর্থ - রাজনীতি।

চিন্ময় - কি!!

তীর্থ - হ্যাঁ রাজনীতি, এত চমকে উঠলেন কেন?

চিন্ময় - নাঃ এখানে এসে চমকে ওঠা একেবারেই বেমানান জানি, কিন্তু এরকম পিলে চমকানো কথা শুনলে – আমি বুঝতে পারছি না তুমি হায়ার স্টাডিজ ছেড়ে, নিজের কেরিয়ারের কথা না ভেবে হঠাৎ এরকম একটা জঘন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছ কি করে!

তীর্থ - কৈ আমি তো কেরিয়ার চিন্তা বাদ দিচ্ছি না, রাজনীতিতেই কেরিয়ার করার কথা ভাবছি। তবে হ্যাঁ কনভেনশনাল পড়াশুনোটা বাদ দিতে হচ্ছে কারণ, দেশে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-শিক্ষক-ব্যবসায়ী বানাবার আলাদা আলাদা ইনস্টিটিউশন থাকলেও রাজনীতিক গড়ার কোন সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নেই তো; অথচ দেখুন কি লা-জবাব প্রসপেক্ট এ লাইনে –

চিন্ময় - কি প্রভাত, তোরও কি এই মত?

প্রভাত - তুই সিরিয়াস?

তীর্থ - হ্যাঁ ভাবছি, সিরিয়াসলিই ভাবছি।

প্রভাত - আগে বলিসনি তো –

তীর্থ - এখনও কিছু ঠিক করিনি তো, ঠিক করে ফেললে বলে দিতাম –

প্রভাত - হুঁ! ঠিক আছে, এখন যেখানে বেরবি বলছিলি ঘুরে আয়, তাড়াতাড়ি ফিরিস নইলে ক্যাপসি কেন লপসিও জুটবে না লাঞ্চে।

তীর্থ - কাকু আপনি বসে গল্প করুন আমি একটু ঘুরে আসি, যদি ম্যানেজ করতে পারি তো ভাল, নাহলে দেরি হবে ফিরতে। ও ঘরে ফ্লাস্কে দু'কাপ চা করা রইল দুধ-চিনি-এলাচ দিয়ে [দৃষ্টি বিনিময় / বেরিয়ে যায়]

চিন্ময় - কিরে তুই কিছুই বলবি না?

প্রভাত - হুঁ! হুঁ ভাবছি কি বলা উচিৎ, আদৌ কিছু বলা উচিৎ কিনা সেটা তো আগে ভাবতে হয়,

চিন্ময় - তাই বলে রাজনীতি! তীর্থ রাজনীতি করবে! এই রাজনীতির ভূতটা তুই প্ল্যান্ট করেছিস ওর মাথায়! হ্যাঁরে তোর ভয় করে না?

প্রভাত - নাঃ ভূতের ভয় আমার নেই। ভবিষ্যতের কথাটা একবার ভেবে দেখ, তীর্থর মতো ভাল ছেলেরা যদি ভেবেচিন্তে রাজনীতিতে সত্যি সত্যি এসে পড়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎটা কত নিশ্চিত সুন্দর হয়ে উঠবে!

চিন্ময় - আর তোর নিজের ভবিষ্যৎ! পরোক্ষে আমাদের সকলের ভবিষ্যৎ! কাকে ঠকাচ্ছিস প্রভাত? নাকি প্রায়শ্চিত্ত করছিস!

প্রভাত - জানি না, একজন অনারারি কেয়ার-টেকার হিসেবে যেটুকু করা যায়, শুধু সেটাই ঠিকঠাক করে যাবার চেষ্টা করছি।

চিন্ময় - তারপর?

প্রভাত - তারপর! 'ভাল মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে' ।

চিন্ময় - ভাল। ভাল, তবে সব ভাল তার শেষ ভাল যার। প্রভাত এখনও এমন কিছু দেরি হয়নি, উপকূলে ডিপ্রেশনটা সবে ঘনিয়ে উঠেছে এখনই বাঁধ দে, শক্তপোক্ত করে বাঁধ দে, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, আবার এক হড়কা বানে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে

প্রভাত - (ম্লান হাসি মুখে) বন্যা আজ আসছে,

চিন্ময় - কি!

প্রভাত - বন্যা আসছে আজ। হয়তো এখনই এসে পড়বে, (হাতের ঘড়ি দেখে) ট্রেন তো ঠিকসময় মতোই ঢুকেছে ষ্টেশনে, তাহলেও এত দেরি –

চিন্ময় - বন্যা আসছে বলিসনি তো! ট্রেনে আসছে?

প্রভাত - হ্যাঁ, ও তো চিরকালই ট্রেনবিলাসী; ট্রেনের জানলা দিয়ে চা কিনে খেতে ওর যে কি ভাল লাগে!

চিন্ময় - ওর ছেলেমেয়ে, হাজব্যান্ড সবাই আসছে?

প্রভাত - নাঃ ওরা তো কখনো আসে না বন্যার সঙ্গে, মানে এখনও পর্যন্ত আসেনি কোনদিন;

চিন্ময় - হ্যাঁ তা অবশ্য। সবার কি আর বন্যার মত (দু'জনের দৃষ্টি সংঘাত ঘটে) এত টান থাকে! বেশ তাহলে চলি, এখন আর এখানে আমার থাকাটা বোধহয় ঠিক হবে না,

প্রভাত - ভুলই বা হবে কেন? থেকে যা, অনেকদিন তো দেখা হয়নি, দেখা করে যা, বাট...

[বন্যা আসে]

বন্যা - আসব?

প্রভাত - স্বচ্ছন্দে –

বন্যা - ধন্যবাদ, (ঢুকে ব্যাগ-ব্যাগেজ নামায়)

চিন্ময় - বন্যা!!

বন্যা - চিন্ময় তুই!

চিন্ময় - যাক চিনতে পেরেছিস তাহলে, কেমন আছিস?

বন্যা - ভাল,

চিন্ময় - হ্যাঁ, দেখেও সেটা মনে হচ্ছে, তুই যেন এখন থাকিস কোথায়?

বন্যা - বরোদা, এই বছর দেড়েক হল এসেছি।

চিন্ময় - এর আগে তো বোধহয় দিল্লিতে ছিলি –

বন্যা - পাঁচ বছর। মিস্টার চাকরিটা পাল্টালো, তাই বরোদা, তা হ্যাঁরে মল্লিকা, তোদের মেয়ে, সব ভাল আছে –

চিন্ময় - বিন্দাস। হ্যাঁরে মিস্টার চাকরি পাল্টালো মানে মাল্লুও বাড়ল? ভাদোদরা যা এক্সপেন্সিভ!

বন্যা - (প্রভাতের সঙ্গে হাসি চোখ বিনিময় করে) তোর মত কিপ্টের কাছে কলকাতাও কি আর খুব শস্তা?

চিন্ময় - না না এখানেও এখন খুউব খরচ রে,

বন্যা - দেখিস খরচের দোহাই দিয়ে মেয়ে-বউকে কষ্ট দিস না –

চিন্ময় - আরে ধ্যুস আমি কি সত্যিই কিপ্টে নাকি! হ্যাঁ একটু বুঝে চলি তোদের মতো বেহিসেবি, দরাজ নই। আচ্ছা তুই আর তোর মিস্টার যে এমন হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়াস, এতে তোদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষতি হয় না?

বন্যা - প্রথম প্রথম কিছুদিন খুবই অসুবিধেয় কাটিয়েছি, এখন ঠিক আছে। ওরা দুজনেই বেঙ্গালুরুতে থেকে পড়াশুনো করে।

প্রভাত - জানিস তো ওদের ছেলেমেয়ে দুটো টুইন,

চিন্ময় - হ্যাঁ, তুইই তো বোধহয় বলেছিলি একবার, বন্যার সবকিছুই কেমন অন্যরকম। যাকগে কি নাম রেখেছিস ওদের?

বন্যা - পোশাকি নাম দুটো আছে, তবে আমরা ডাকি নান্নি আর মুন্নি বলে,

চিন্ময় - বাঃ নামকরণেও একটা টুইন স্মেল, ওদের এখন ক্লাস এইট হবার কথা তো!

প্রভাত - হ্যাঁ কথা মতো তাই-ই হয়েছে। জানি তুই হিসেবে বরাবরই পাকা তবে এবার ক্ষান্ত দে, একসাথে বেশি মুখস্ত করতে গেলে তো মনে রাখতে পারবি না,

বন্যা - সত্যি! তোর সেই নন-স্টপ বিবিধভারতী এখনও স্টেশন বন্ধ করেনি! বোস

।। বন্যা এবার পুরো মনোযোগ দিয়ে তাকায় প্রভাতের চোখে, চোখে চোখ পড়তে - ।।

প্রভাত - ভাল, ভাল হয়েছে তীর্থর রেজাল্ট,

বন্যা - সত্যি! কি রকম করেছে জয়েন্টে

প্রভাত - ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফর্টি থ্রি র‍্যাঙ্ক করেছে, মেডিকেলে ওয়ান ফর্টি টু,

বন্যা – বাঃ!

চিন্ময় - কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তারপর যা করবে বলে ঠিক করেছে সে একেবারে ক্যাডাভারাসিয়াল গ্যান্ডিগুলাস। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার নয়, শোন শোন ওর কাছে, চোখ উঠে যাবে চড়কগাছে, তাও একেবারে মগডালে।

প্রভাত - আরে না না এখনও কিছু ঠিক করেনি, কিছু ফাইনাল করেনি, এখনও ভাবছে। [বন্যা অপলক] তুই তো জানিস ওর ভাবনা-চিন্তাগুলো আর পাঁচজন সাধারণের সঙ্গে সবসময় মেলে না –

বন্যা - যেটুকু মেলে তা একমাত্র তোর সাথেই, জানি;

চিন্ময় - এই, এই তোর একটা জানা একদম একশোয় নিরানব্বই। তবে এবার বাছাধন নিজেও বুঝি কিছুটা ফাঁপড়ে, তীর্থপথে এখনও পা মেলাতে পারছে না বোধহয়,

বন্যা - কি? কি ঠিক করেছে ও?

প্রভাত - বললাম তো এখনও কিছু স্থির করেনি, ভাবছে; ভাবছে – সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করবে।

বন্যা - প্রভাত!!

প্রভাত - ওর ভাবনায় আমার কোন ভূমিকা নেই বিশ্বাস করতে পারিস।

বন্যা - আঃ! বিশ্বাস, অবিশ্বাস; কিন্তু ওর ব্যাপারে তোর তো একটা মত থাকবে! সব জেনেও, - না না এটা – এটা কি করে –

প্রভাত - কারও সঙ্গে অহেতুক দ্বিমত হওয়া, অন্যের ওপর নিজের মত চাপিয়ে দেওয়া আমার আদতে নেই, সেটাতো জানিসই – [ভেতরে যেতে এগোয়]

বন্যা - দাঁড়া –

প্রভাত - দেখ তীর্থর ভাবনাটাকে আমি অযৌক্তিক বলে একেবারে ফেলে দিতে পারছি না, আবার সেটা স্বাভাবিকের থেকে একটু বাইরে বলে, হ্যাঁ একটা কিন্তুর অবকাশ থেকে যাচ্ছে,

বন্যা - স্বাভাবিকের থেকে একটু বাইরে! এর পরিণতি তোর অজানা? প্রভাত, তুই বাধা দিবি না?

প্রভাত - বাধা দেব! আমি! বাধা দিয়েছি আমি দিয়েছি কখনও? বন্যা তুই কি চাস আমি তীর্থকে বাধা দিই?

বন্যা - অবান্তর প্রশ্ন – আমি কি চাই! আমার একটা চাওয়াও কি পাওয়া হয়েছে কখনও? হুঁ, আমি কি চাই! বিজন হারিয়ে আমি বিহনে হেরেছি, কিছুতেই হার মানতে চাই না তবু খেই হারিয়ে ভেসে যাই বারবার - একটুক্ষণ সব চুপচাপ –

প্রভাত - নে খুব হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, খেই হারাস, খিদে তো পিছু ছাড়বে না, ব্রেকফাস্ট হয়নি নিশ্চয়ই?

বন্যা - হুঁ? স্যরি, না হাওড়ায় গাড়ি ঢোকার আগে ব্রাশ করে জাস্ট চা খেয়েছি, তুই ব্রেকফাস্ট খাওয়া আমি লাঞ্চ খাওয়াব, প্রভাত তার আগে এককাপ চা খাওয়াবি?

প্রভাত - নো প্রবলেম, তীর্থ দু'কাপ চা করে ফ্লাস্কে রেখে গেছে।

বন্যা - ওরে বাবা, সে তো তোর ঐ দুধ চিনি ছাড়া লাল পাঁচন, স্যরি ওটা আমি মরে গেলেও পারব না।

প্রভাত - ভয় নেই পাঁচন গিলতে হবে না, তীর্থ তোর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে রেখেই বেরিয়েছে, পরিমাণমত দুধ-চিনি-এলাচ দিয়ে চা বানিয়ে রেখে গেছে। তোর ফেভারিট ইলাচি চা।

বন্যা - সত্যি!! (বড় খুশি)

প্রভাত - (স্মিত হেসে) চিন্ময় তোর তো এটা চলবে, খাবি এককাপ?

চিন্ময় - মাফ কর, সকালে দু'কাপে চার চামচ খেয়ে ফেলেছি, এবার খেলে তীর্থও রাগ করবে। আমি এবার চলি –

বন্যা - চিন্ময় তুইও আজ আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করে যা, পারলে মল্লিকাকে ডেকে নে, মেয়েকেও নিয়ে আয়। আজ কতদিন পর আবার একসাথে হবার সুযোগ হচ্ছে বল তো!

চিন্ময় - আরে ইয়ে হুয়ি না বাত, তবে বন্যা মেয়ে বাদ – ক্লাসটেস্ট চলছে। এক্সেলেন্ট, রিয়েলি তোর রিইউনিয়ন আইডিয়াটা গ্র্যান্ড, প্রভাত এর একটা নস্টালজিক ভ্যালু আছে কি বল! (মোবাইলের বোতাম টিপতে টিপতে) এই আমাদের পিকনিকে তো একটা শিওর আইটেম ছিল গাঙ্গুরামের দই, আমি নিয়ে আসছি, হ্যাঁ হ্যালো – এই মল্লিকা

শোন – (মোবাইলে হাত চেপে) এই শোন তোরা এদিকে সব ম্যানেজ কর। আমি দইটা আর পানটা নিয়ে আসছি, হ্যাঁ মল্লিকা, এই শোন না বন্যা - [প্রস্থান]

বন্যা - ওঃ একটা জ্যান্ত নস্টালজিয়া, চলল, আগে হলে অবশ্য দইয়ের পয়সাটা চেয়ে নিত। বেটা পুরোটাই জক মেরে খেতো। কিন্তু গাঙ্গুরামের দই – সবচেয়ে কার প্রিয় ছিল? ক্যাপ্টেন

প্রভাত - হুঁ! কিন্তু তুই যে জ্যান্ত অন্নপূর্ণার মতো সব নেমন্তন্ন করে বসলি, এখন খাওয়াবি কি? আমাদের ঠাণ্ডা আলমারিতে বড়জোর আধসেরটাক চিকেন আর কেজি খানেক পেঁপে পাবি, ব্যস।

বন্যা - তুই ক্ষেপেছিস নাকি আমি রান্না করব! আমি পারি?

প্রভাত - কিন্তু তোর এই দরাজ নেমন্তন্ন দেখে তো মনে হল না তুই পারিস না,

বন্যা - কেন এখানে কোন হোম ডেলিভারি কিচেন নেই কাছাকাছি?

প্রভাত - হ্যাঁ তা আছে, ঐ তো 'বুড়ো আংলার রান্নাঘর' হোম ডেলিভারি, আমরা তো মাঝে মাঝে

বন্যা - ব্যস মিটে গেল, পেমেন্ট তো আমি করব। টেলিফোন নাম্বারটা দে –

প্রভাত - (ছোট্ট টেলি-ইন্ডেক্স একটা এগিয়ে দিয়ে) কি বলবি? গুচ্ছের ফাস্ট ফুড?

বন্যা - আজ্ঞে না, স্লো ফুডই বলব – ভাত-ডাল-ভাজা-মোচা-মাছ-মাংস-চাটনি, সঙ্গে দই আর পান, হবে না?

প্রভাত - যাক তবু রক্ষে। তবে আমি তো ভেবেছিলাম এবার যখন ক'দিন থাকবি, আমাকে তীর্থকে এক আধদিন রেঁধে খাওয়াবি,

বন্যা - ইচ্ছে করে, আর পাঁচজন মায়ের মতো, এয়ো স্ত্রীর মতো তোকে তীর্থকে এটা-ওটা রেঁধে খাওয়াতে ইচ্ছে করে কিন্তু কি করব বল এই কুকিং আর্টটা রপ্ত করার সুযোগই পেলাম না, না বাপের ঘরে - না বরের ঘরে। তবে যা একখানা ফাটাফাটি স্যালাড বানাব-না নিজের হাতে, খেয়ে দেখিস – রায়তা হার মানবে।

প্রভাত - ওরে বাবা সেতো ভারি শক্ত কাজ, পেঁয়াজটাও নিজে হাতে কাটবি তুই?

বন্যা - না ঐ একটা ব্যাপারে একটু হেল্প করিস আমায় – (প্রভাত হাসে) ইয়ার্কি করছিস; আমি এখন চা-কফি-ডিমের পোচ বানাতে পারি কিন্তু; ওমলেটটা ঠিক কায়দায় পাইনা – ধরে – পুড়ে যায়

প্রভাত - হাঃ হাঃ সোনা বাঁধানো কপাল নিয়ে জন্মেছিস –

বন্যা - কপাল! তা বটে, কিন্তু তুই আবার কপাল-কালচার শুরু করলি কবে থেকে! (মোবাইলে বোতাম টিপে অপেক্ষা করতে করতে) ওঃ হো চিন্ময়টা এমন দই নিয়ে হৈ চৈ করতে করতে বেরল, জানা হল না মল্লিকা আসছে কিনা – ধ্যুস বিজি

প্রভাত – তুই হঠাৎ করে চিন্ময়কে নেমন্তন্ন করে বসবি বুঝতে পারিনি, তারপর আবার সঙ্গে মল্লিকা - বাচাল মেয়ে –

বন্যা - হিঃ হিঃ কেন কতদিন পরে মল্লিকাকে দেখতে পাবি থ্রিল লাগছে না? কলেজে তো মল্লিকা তোর প্রেমেই পড়েছিল; মাঝখান থেকে কি করে কি হল, চিন্ময় তোকে ল্যাং মেরে দিল।

প্রভাত - প্রেমটা পুরোপুরি মল্লিকার একতরফা ছিল তাই ল্যাং খাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই,

বন্যা - হ্যাঁ তা অবশ্য, ও একটু বেশি কথা বলে ব'লে তুই কোনদিন ওকে পাত্তা দিসনি। যাকগে মল্লিকা চিন্ময় দুজনেই তো আমাদের খুব কাছের বন্ধুই ছিল, ইউনিভার্সিটি

কাঁপানো 'হাম পাঁচ'-এর সদস্য ছিল! [কথা শেষ করে একটা ট্রলি ব্যাগ ভেতরে রেখে আসে]

প্রভাত - (চমকে) 'হাম পাঁচ'! বহুদিন পর কানে এল নামটা, ইউনিভার্সিটির পাঁচ পড়ুয়া – ক্লাস-ক্যান্টিন-কমনরুম জয় করা সেই 'হাম পাঁচ'। (খুকখুক করে হেসে) পাঁচের প্যাঁচে প্রোপরশনের গণ্ডগোল প্রথম থেকেই, তিনজন ছেলে দুজন মেয়ে। বিজন সরে গিয়ে অবশেষে মিলটা ঘটিয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু –

[শেষ কথাটা বন্যা শুনতে পায়]

বন্যা - ঘটল না। যা ঘটল তার জন্য আমিই যে দায়ী সেটা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে!

প্রভাত - ওটা তোর কিছুটা জানা, সবটা নয়,

বন্যা - চিন্ময় মল্লিকাকে খেতে বললাম বলে তুই রাগ করছিস, তীর্থর ভাল রেজাল্টকে যা হোক করে একটা সেলিব্রেট করতে ইচ্ছে করে না বল? (প্রভাত ঝাঁকুনি খেয়ে তাকায় বন্যার দিকে) তাছাড়া মল্লিকাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা কমে গেছে এখন, কিন্তু আমাদের জীবনে, আমাদের অতীতের সঙ্গে ওদের যোগসূত্রটা কি অস্বীকার করতে পারিস তুই? আমি পারি?

প্রভাত - আমি কোন কিছুই অস্বীকার করছি না, তবু একসাথে হলেই তো আবার সেই পুরনো কথা নিয়ে নতুন করে ঘোলঘুঁটি খেলা, নতুন করে আলোচনা আর পরিশেষে আলোচনার আলোটুকু সরে গিয়ে চনাটুকু পড়ে থাকবে; ভাল লাগে? ব্যথা বাজে না তোর মনে?

বন্যা - সেদিনের কথায় ব্যথার সঙ্গে ভাললাগা মিশে এক আবেশে জড়িয়ে যায় মন, ভয় তো পাবার কথা আমার প্রভাত; তুই এত বিচলিত হোস কেন?

প্রভাত - তীর্থ তোকে ভয় দেখায় না বন্যা? অনুচ্চারে কোন প্রশ্ন করে না তোকে? বন্যা?

বন্যা - করে। বড্ড ভয় করে ওর এই রাজনীতি করার ইচ্ছেতে, এক আতঙ্কের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রভাত প্লিজ তুই ওকে আটকা – প্লিজ – [মিনতিভরা দুচোখে তাকায় প্রভাতের দিকে]

প্রভাত - [নিজেকে গুছিয়ে সামলে নিয়ে] উঁহু আর কোন কথা নয়, অনেকক্ষণ আগে চা খেতে চেয়েছিস, দাঁড়া নিয়ে আসি। তীর্থর হাতের চা –

বন্যা - তীর্থ?

প্রভাত - বেরিয়েছে কাছেই, এসে পড়বে,

।। ভেতরে যেতে পা বাড়িয়েও থেমে যায়, দুয়ারে দাঁড়িয়ে জনৈকা তরুণী।।

প্রভাত - তুমি!

বিহু - আমি বিহু, বিহু কাঞ্জিলাল;

প্রভাত - বিহু! বেশ নাম হল, পরিচয়?

বিহু - আমি তীর্থর বন্ধু।

প্রভাত- আচ্ছা তার মানে তুমি তীর্থ দর্শনে এসেছ! কিন্তু সে তো বাড়ি নেই, তুমি ভেতরে এসে বসবে?

বিহু - অনুমতি পেলে,

প্রভাত - (একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে) এই এথিকটা কোনদিন ভুলো না, এস, তীর্থ এখনি এসে পড়বে বসো, - এই তুমি চা খাবে?

বিহু - খাব –

প্রভাত - বেশ তোমরা গল্প করো, আমি চা নিয়ে আসছি, ওঃ আর উনি হলেন –

বিহু - জানি,

প্রভাত - জানো!

বিহু - তীর্থ বলেছে উনি আজ আসছেন

প্রভাত - বসো –

বিহু - আঙ্কল (সামনে এসে প্রণাম করে)

প্রভাত - হঠাৎ!

বিহু - বন্ধুর বাড়ি এসে তার বাবাকে প্রণাম করব, এতে আবার হঠাৎ কি! [প্রভাত বন্যার দৃষ্টি বিনিময়]

প্রভাত - বসো, [বিহু এসে বন্যাকে প্রণাম করে]

বন্যা - একি একি আমাকে কেন?

বিহু - আপনি তীর্থর আন্টি, যাকে দেখলে তীর্থর ‘মা’ বলে ডাকতে ইচ্ছে করে,

বন্যা - কি!!

বিহু - তীর্থ বলেছে। [বন্যার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে প্রভাতবাবু ভেতরে যান]

বন্যা - তীর্থ তোমাকে একথা বলেছে? [বিহুর প্রতিক্রিয়া] তীর্থ আর কি বলেছে?

বিহু - অনেক কথা –

বন্যা - তার নিজের কথা! অনেক কথা বলেছে তোমাকে?

বিহু - সহজে তো কিছু বলে না, আই মিন নিজের কথা কিছু বলে না। মেজাজে ওর সবসময়ই একখানা শরতের আকাশ ধরা। তবে কখনো কোন কারণে মনে কষ্ট পেলে কিছু কিছু বলে।

বন্যা - কষ্ট! ওর মনে কিসের কষ্ট?

বিহু - তা তো জানি না আন্টি, তীর্থ কষ্ট পেলে আমি তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারি, কষ্টের পেছনটা জানতে পারি না। ও অনেক কথাই বলে, বুঝি – সব কথা বলে না।

বন্যা - তবু তোমাকেই যা কিছু বলে, ভাল; সবাইকে তো নিজের কথা বলা যায় না, তুমি তাহলে তীর্থর সেইরকম বন্ধু – যাকে নিজের কথা বলা যায়!

বিহু - (হাসিমুখে) একদম।

বন্যা - বাঃ বিহু তোমাদের আলাপ কিভাবে? তোমরা – কি একই সঙ্গে পড়!

বিহু - এক সঙ্গে মানে এক ইন্সটিটিউশনে নয়, সেম ব্যাচ, একই কোচিং-এ পড়ি আমরা। আমিও এবার এইচ এস দিয়েছি

বন্যা - জয়েন্ট দাওনি?

বিহু - নাঃ

বন্যা - কেন?

বিহু - ভাল র‍্যাঙ্ক করতে পারব না বলে। আমি স্ট্যাট-এ অনার্স নিয়ে পড়ব ভেবে রেখেছি।

বন্যা - আর তোমার বন্ধু?

বিহু - ওরে বাবা তীর্থর কনফিডেন্স লেভেলটা এত হাই, জয়েন্টে র‍্যাঙ্ক করা নিয়ে ওর নিজের কোন চাপ ছিল না,

বন্যা - কিন্তু ভাল র‍্যাঙ্ক করেও ও তো যতসব আজগুবি ভাবছে। নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলেনি তোমায়?

বিহু - ভবিষ্যৎ! নাঃ (হাসতে হাসতে) ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে – আমার ভবিষ্যৎ? অন্ধকার!

বন্যা - কিন্তু জীবনে একটা লক্ষ্য স্থির করে তো এগোতে হবে! এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কোন আলোচনা করেনি?

বিহু - আন্টি, আমি তীর্থকে যেটুকু বুঝছি – ও আলোচনা করে কিছু স্থির করে না, আর নিজে যেটা করবে বলে স্থির করে, তা নিয়ে আগাম আলোচনাও ও কারও সঙ্গে করে না বড় একটা।

বন্যা - তোমার সঙ্গেও না?

বিহু - নাঃ। অন্তত এখনও পর্যন্ত বিলকুল না।

বন্যা - তবু বলছ তোমাদের বন্ধুতা, ঘনিষ্ঠতা খুবই গভীরে!

বিহু - হ্যাঁ আন্টি, এ গভীরতা ফিতে দিয়ে মেপে তো দেখাতে পারব না তোমায় বরং একটা উপমা দিয়ে বোঝাতে পারি।

বন্যা - উপমা! কিসের উপমা? [প্রভাতবাবু চা নিয়ে এসে দাঁড়ান]

বিহু - আন্টি আমাদের মধ্যেকার বন্ধুতা, ঘনিষ্ঠতা ততখানিই যতখানি আছে তোমার আর আঙ্কল-এর মধ্যে।

বন্যা - (ধমকে) চুপ কর। চুপ। যা জানো না তা নিয়ে কথা বোলো না।

প্রভাত - বন্যা – (বন্যাকে চা দিয়ে বিহুকে বলেনঃ) তুমি বসো – (চা দেন)

বন্যা - তীর্থ তোমাকে আর কি বলেছে?

প্রভাত - আঃ বন্যা – চা খা –

বন্যা - স্যরি -

প্রভাত - এতে একেবারে স্যরি বলার মতো কিছু হয়নি। চুমুক দিয়ে দেখ তো আগের সেই ফ্লেভারটা পাস কিনা?

বন্যা - (চুমুক দিয়ে) হ্যাঁ ঠিক আছে,

প্রভাত - থ্যাঙ্ক ইউ, তুমি বিহু! আচ্ছা তোমরা মানে তুমি তোমার মা বাবার সাথে কখনো অসম গিয়েছিলে?

বন্যা - আমি একটু ভেতরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিই –

প্রভাত - বোস্ চা-টা শেষ কর, পরে যাবি, বিহু যা বলছিলাম

বিহু - হ্যাঁ আঙ্কল! ওঃ (মৃদু হেসে) আমার নাম শুনে বলছেন তো! না আমি নিজে কখনও সেখানে যাইনি। মা বাবা একবার গিয়েছিলেন বেড়াতে সম্ভবতঃ সেকেন্ড হনিমুনে, সে আমার জন্মের আগে। তবে সেখানে থাকতেই নাকি আমার আগমন সুনিশ্চিৎ হয়েছিল বলে ওঁদের বিশ্বাস আর তাই আমার নামের মধ্যে অসমের উৎসবের স্মৃতিকে ধরে রাখা, – মা আমাকে এরকমটাই বলেছে।

প্রভাত - সুন্দর! নিবিড় ভালবাসা তো উৎসবের মতোই ঝলমলে, সুন্দর নাম তোমার। বিহু তীর্থর সঙ্গে তোমার মেলামেশা মানে বন্ধুতা কতদিনের? এই তুমি আবার এরকমটা মনে করছ না তো তোমায় র‍্যাগিং করা হচ্ছে!

বিহু - (হেসে) না না সেকি! না আঙ্কল তীর্থর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়, তবে –

প্রভাত - দেখো, তীর্থর মুখে তোমার নাম আমি কোনদিন শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না; অবশ্য তার যেটা নিজস্ব জগৎ একান্ত ভাবে, তার সন্ধান পাওয়া বড়ই দুষ্কর!

বিহু - জানি। তীর্থ ওর বাইরেটা দিয়ে ভেতরটা এত সুন্দর করে আড়াল করতে পারে যেখানে প্রবেশ করা অলমোস্ট ইম্পসিবল, ট্যু টাফ টু রিচ তীর্থ। তবু বলব যারা ওর কাছাকাছি, আমিই তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের। আমাদের বন্ধুতা অনেকটাই ঘনিষ্ঠ।

প্রভাত - এ্যাঁ! হাঃ হাঃ এই না, না বিহু ঐ 'ঘনিষ্ঠ' শব্দটায় আমার ঘোর আপত্তি আছে। বিহু তুমি অন্য কিছু বল প্লিজ, অন্য কিছু দাবি কর।

বিহু - (অপ্রস্তুত হেসে) কেন? কেন আঙ্কল!

প্রভাত - আমাদের এক বন্ধু, বুঝলে –

বন্যা - আঃ প্রভাত –

বিহু - তোমাদের বন্ধু মানে আন্টিরও? (উৎসাহে/উচ্ছ্বাসে প্রশ্ন)

প্রভাত - অ্যাঁ! হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের বন্ধু মানে আন্টিরও।

বিহু - কলেজ লাইফের বন্ধু?

প্রভাত - হ্যাঁ কলেজ-ইউনিভার্সিটির বন্ধু, এত প্রশ্ন করো না, শোন –

বিহু - স্যরি

প্রভাত - তো সেই বন্ধু বিজন, বিজন সেন, ডাকনাম বাবুয়া, আমরা কয়েকজন অবশ্য তাকে ডাকতাম ক্যাপ্টেন বলে, তো ও কিছু কিছু বাংলা শব্দের নিজের মতো করে

ব্যাকরণ বানাতো যার মধ্যে এই 'ঘনিষ্ঠ' শব্দটা ছিল। ও বলতো 'ঘনিষ্ঠ' হল একটা সমাসবদ্ধ পদ – যার ব্যাসবাক্য হল – ঘন ঘন অনিষ্ঠ করেন যিনি তিনিই হলেন ঘনিষ্ঠ। এটা নাকি দ্বন্দ্ব সমাস হাঃ হাঃ

বিহু - (হাসতে হাসতেই) অপূর্ব। এক্সেলেন্ট, তবে আমরা দুজন সেরকম ঘনিষ্ঠ নই আঙ্কল।

প্রভাত - (গম্ভীর) আমরাও নই বিহু। আমার আর আন্টির মধ্যে কোন অনিষ্টকারী ঘনিষ্ঠতা নেই। উই আর জাস্ট ফ্রেন্ডস, জাস্ট ফ্রেন্ডস।

।। আলো নিভে যায়, দৃশ্যান্তর ঘটে ।।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্চে এখন তীর্থ পায়চারী করছে ছটফটে পায়ে। ভেতর বাহির দুটো দরজাতেই তার দৃষ্টি ঘুরছে ঘনঘন। এবার ভেতর দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে

তীর্থ - কি রে তোর হল? [একটা বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খায়]

বিহু - আসছি –

তীর্থ - ডিভানের চাদরটা টেনেটুনে দিস – [একটা যথেষ্ট কোঁচকানো নাইটি পাট করতে করতে বেরিয়ে আসে বিহু] নে, এবার চটপট কেটে পর –

বিহু - এটা কি হল? (জলের বোতলটা কেড়ে নিয়ে জল খায়)

তীর্থ - কি হল!

বিহু - তুই আমার অসুবিধের কথাটা আজও শুনলি না! তোকে বারণ করলাম এত করে, শুনলি না!

তীর্থ - শোনা যায় বল! কি ইন্সসিস্টিং অ্যান্ড ইন্সপায়ারিং বারণ করা তোর –

বিহু - স্বার্থপর!

তীর্থ - কি বললি স্বার্থপর! (হাসতে হাসতে) তো কার স্বার্থ কে রাখল?

বিহু - অসভ্য –

তীর্থ - (একটা হেয়ার ক্লিপ তুলে বাড়িয়ে ধরে) উঃ!! তোকে বলেছি না ঐ শব্দটা তুই মুখে আনবিই না, ‘অসভ্য’ শব্দটা তোর মুখে মোস্ট ইরিটেটিং অ্যান্ড প্রোভগেটিং, অসভ্য হতে ইন্সিস্ট্ করে।

বিহু - তাহলে আর কি প্রোভগেটিং-এর দোহাই দিয়ে চল আবার যাই –

তীর্থ - এই সত্যি যাবি! আমি কিন্তু রাজি –

বিহু - তীর্থ, তুই কিন্তু খুন হয়ে যাবি আমার হাতে

তীর্থ - ওঃ ডিয়ার খুন তো হয়েই গেলাম দুজনে একসাথে। কার হাতে কে খুন হলাম বল তো বিহু!

বিহু - (আশ্লিষ্ট স্বরে) আমাদের ইচ্ছের হাতে।

তীর্থ - (বিহুর কাছে এসে হাত ধরে বলেঃ) যাই বল একেই বলে বোধ হয় অ্যাকচুয়াল ইন্টেমেসি, ঘনিষ্ঠ হওয়া,

বিহু - (সরে যায় একদিকে) কি! হাঃ হাঃ

তীর্থ - হাসছিস!

বিহু - (হাসতে হাসতে) আচ্ছা তুই কি আমার অনিষ্ট করতে চাস? তুই সেবার তো শুনলি না, আজও-

তীর্থ - মানে? অনিষ্ট করা মানে কি?

বিহু - তোর মুখে ঐ ঘনিষ্ঠ কথাটা শুনে কথাটা মনে এল।

তীর্থ - বুঝলাম না –

বিহু - ‘ঘনিষ্ঠ’ শব্দটার একটা ঐতিহাসিক ব্যাকরণ আছে, ব্যাখ্যাটা আঙ্কলের কাছে শুনে নিস। তবে সত্যি রে তীর্থ আমাদের কিন্তু একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে,

[ডোর বেল। দুজনেই খুব কাছাকাছি ছিল, চমকে উঠে ছিটকে যায় দুদিকে]

তীর্থ - এই টিপটা টিপটা – ডোর বেল – কামিং – বিহু ওঘরে সব ঠিকঠাক আছে?

বিহু - সব ঠিক আছে, ভীতুর ডিম –

তীর্থ দরজা খুলে দিলে বন্যা একগাদা শপিং ব্যাগ নিয়ে ঢোকে

তীর্থ - বাব্বাঃ এ তো গোটা নিউ মার্কেট তুলে এনেছ। তুমি কি বরোদা থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছ শুধু শপিং করবে বলে?

বন্যা - কেন, চারদিন এসেছি এর মধ্যে তো আগে একদিনও বেরোই নি,

তীর্থ - আজ সকালে সেটা পুষিয়ে নিলে, সারা সকাল বাজারেই কাটিয়ে এলে, এবেলা আর না ফিরলেই পারতে –

বন্যা - কেন, ফিরে তোর অসুবিধে করলাম খুব?

তীর্থ - ধ্যুস আমার অসুবিধে কিসের! তোমাদের সুবিধের কথা ভেবেই বললাম, হোয়্যার ইজ দ্য ওল্ড ম্যান?

বন্যা - আসছে, ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছে। বিহু তুমি কতক্ষণ?

বিহু - আমি; অনেক (তীর্থর ইঙ্গিত) ক্ষণ না আন্টি, এই কিছুক্ষণ –

বন্যা - তুমি বসো, যেও না কথা আছে, আমি এগুলো ভেতরে রেখে আসি –

তীর্থ - এতসব কি কিনেছ বল তো?

বন্যা - এই লাঞ্চ প্যাকেট ক'টা, তোর অ্যাচিভমেন্টের টোকেন গিফট, তোর বন্ধুদের মধ্যে প্রথম আলাপ হল বিহুর সঙ্গে ওর জন্যে দু-একটা টুকিটাকি–

তীর্থ - আর তোমার বন্ধুর জন্যে?

বন্যা - আছে, তবে এসবের সবটাই তো এখানের জন্যে নয়, এর কিছুটা আমি বেঙ্গালুরু নিয়ে যাব।

বিহু – তোমার অন্য ছেলেমেয়েদের জন্যে?

বন্যা - হ্যাঁ ছেলেমেয়ে – অন্য ছেলেমেয়ে মানে?

বিহু – স্যরি, তুমি আন্টি তীর্থকে যে চোখে দেখ। মনে হয় তীর্থও তোমার এক ছেলে। ওর তো মা -

বন্যা - হুঁ! তুমি কিছুক্ষণ এসেছ বললে না? তোমার টিপটা আর একটু ডানদিকে সরবে, ঠোঁটে একটু বোরোলিন লাগিয়ে নিও। পালিও না, আসছি -[প্রস্থান]

বিহু - (কপাল চাপড়ে) যাঃ

তীর্থ - কি হল?

বিহু - ক্যাচ-কট্-কট্। এই তোর দস্যুতার জন্যে

তীর্থ - বলছিস কিছু বুঝতে পেরেছে! নাঃ হয়তো সন্দেহ করছে জাস্ট,

বিহু - হ্যাঁ এখন সন্দেহ করেছে, তোকে জিজ্ঞেস করে সব বুঝতে পারবে!

তীর্থ - যাঃ

বিহু - ইদানিং তুই এত বাড়াবাড়ি করছিস – ঠিক একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবি একদিন, আমি কিছু জানি না –

[প্রভাতবাবুর প্রবেশ]

প্রভাত - নাঃ বুঝলি তীর্থ তোর আন্টির সঙ্গে আর দৌড়ে পারা যায় না –

তীর্থ - কোনদিনই পারনি, শুধু আজ কেন!

প্রভাত - (স্বভাববিরুদ্ধভাবে চমকে ওঠেন) হ্যাঁ! হ্যাঁ তা যা বলেছিস, বন্যা সবসময়ই এককদম এগিয়ে

তীর্থ - তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব আজ –

প্রভাত - নতুন কোন কথা? (তীর্থ চুপ) বিহুর সামনে?

বিহু - আমি আন্টির কাছে যাই বাবা, আমার গিফটগুলো বুঝে নিই –

প্রভাত - উঁহু চালাকি করো না বসো, আমাদের হেঁয়ালির আড়ালে কোন কথা হয় না। বল কি বলবি।

তীর্থ - থাক পড়ে হবে;

প্রভাত - হাঃ হাঃ হোঁচট খেলি? খেলি তো? হাঃ হাঃ কর-না কি জিজ্ঞেস করবি –

তীর্থ - আন্টি এলে তুমি খুশি হও সে তো দেখতেই পাই কিন্তু এই খুশিটা তো তুমি অনেকদিন আগেই নিজের মতো করে হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারতে,

প্রভাত - তুই যেরকমটা করে বলছিস তাতে মনে হচ্ছে হয়ত পারতাম। কিন্তু মুঠোয় পুরে খুশি ধরে রাখতে গেলে সে খুশি হয় আঙুলের ফাঁক গলে পালিয়ে বাঁচে নয়তো মুঠোর চাপে দমবন্ধ হয়ে মরে। এর কোনটাই যে আমি চাইনি তীর্থ, তাই তো খুশি

ছড়িয়ে রেখেছি আমার চারপাশে। আমি তো বেশ আছি, আমরা তো খুশিতেই আছি তীর্থ!

তীর্থ - আন্টি তোমার শুধুই বন্ধু, আর কিছু না?

প্রভাত - প্রশ্নটা আন্টিকে করে দ্যাখ, দ্যাখ সেখান থেকে উত্তরে নতুন কিছু পাস কিনা!

তীর্থ - থাক। আমার সব জিজ্ঞাসার উত্তরই তো তুমি, ধ্রুবতারা, বাকি সব প্রশ্নাতীত। চা খাবে তো?

প্রভাত - ধ্রুবতারা! অচল। সূর্যের মতো স্থির সত্য নয়। হ্যাঁ চা খাব।

বিহু - তুই বোস আমি করে আনছি। তোমার তো চিনি ছাড়া লিকার আর তোর – ওঃ – জানি– [প্রস্থান]

তীর্থ - তবে একটা কথা বলি, আন্টিকে 'মা' বলে ডাকতে আমার খারাপ লাগত না কিন্তু,

প্রভাত - তা বেশ তো, ইচ্ছে করলে তুই বন্যাকে মা ব'লে ডাকতেই পারিস, এতে তোর ভাল লাগলে মনে হয় না ওর খারাপ লাগবে,

তীর্থ - আর তোমার? ভাল লাগবে?

প্রভাত - কি আশ্চর্য এক মা-ছাড়া সন্তান মুখে 'মা' ডাক ফিরে পেলে আমার খারাপ লাগবে কেন!

তীর্থ - (ম্লান মুচকি হেসে) রাজনীতি করছ! আচ্ছা আমি যদি সত্যিই রাজনীতি করি, তোমার আপত্তি আছে?

প্রভাত - আমার আপত্তিতে আজ পর্যন্ত তোর কোন ইচ্ছে বা পরিকল্পনা নষ্ট হয়েছে? ভেস্তে গেছে?

তীর্থ - না, তবু –

প্রভাত - তবু যদি আজ আমার অভিমত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাস, বলব এটা তুই করিস না।

তীর্থ - কেন?

প্রভাত - মনে হচ্ছে বন্যারও এতে সমর্থন নেই,

তীর্থ - হোয়াট! আমি কি করব না করব তাতে একজন থার্ড-পার্সনের আপত্তি সম্মতির জায়গা কোথায়?

প্রভাত - এ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিতে আমার মতামতেরও তো কোন তোয়াক্কা করিসনি কোনদিন!

তীর্থ - দেখ, তুমি হয়ত জীবনে কোন একটা বিরাট সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছ তার মুখের দিকে তাকিয়ে, তাই বলে আলটিমেটলি একজন ট্রেসপাসার আমার কেরিয়ার-প্ল্যানিং, লাইফ-প্ল্যানিং-এ মতামত দেবে, নো-নেভার –

প্রভাত - এবার একবার ভেবে দেখ তোর জীবনে কোন ট্রেসপাসারকে 'মা' ডাকতে চাওয়ায় তুই কতটা আন্তরিক!

তীর্থ - দ্যাটস টু ডিফারেন্ট ইস্যুস,

টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বিহুর মোবাইল বেজে ওঠে, তীর্থ সেদিকে তাকিয়ে বিহুকে ডাকে :-

তীর্থ - বিহু তোর ফোন –

বিহু - ধর আমি আসছি –

তীর্থ - প্লিজ হোল্ড অন ফর আ হোয়াইল, [বিহু ঢোকে]

বিহু - আন্টিই চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছিল, এই নাও –

প্রভাত - তোমরা ফোনাফুনি কর আমি চেঞ্জ করে নিই (চা নিয়ে ভেতরে যায়)

তীর্থ - বান্টি কলিং

বিহু - ভাই! (ফোন ধরে) তোর চা'টা নে, (নিজে চায়ে চুমুক দিয়ে) হ্যাঁ ভাই বল,.........আমি? আমি এখন তীর্থদের বাড়িতে.........হ্যাঁ?......হ্যাঁ মনে হচ্ছে ফিরতে আরও কিছুটা দেরি হবে।.........হ্যাঁ? কি!.........ডাক্তার পাত্র! এম ডি!.........হ্যাঁ তো ডাক্তার পাত্র আমায় দেখবে কেন, আমার কি হয়েছে?.........কি বকছিস যা তা! ফাজলামি করিস না, ফোনটা মাকে দে-...........হ্যাঁ মা বান্টি কি বলছে বলো তো?.........তুমি হাসছ!...........ও ইয়ার্কি করছে না, তো...........কি! ডাক্তারপাত্র মানে পাত্র ডাক্তার! ....আমাকে পছন্দ করতে আসছে? ....হ্যাঁ রেজাল্ট বেরিয়েছে তো কি? তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়?......... ফানি! ....তা নয়তো কি?...........আমি কি হাটের গরু যে পছন্দ করে বেছে নিয়ে ঘরে তুলবে আমায়!...........আর আমার কেরিয়ার!.........অপূর্ব!.........জানি না কখন ফিরব, আদৌ ফিরব কিনা আজ আগে ভেবে দেখি...........স্যরি, ধরে নাও আমি এখন পরিষেবা সীমার বাইরে।

[লাইন কেটে দেয়]

তীর্থ - কনগ্রাচুলেশন

বিহু - ইডিয়ট – এই ইডিয়ট আমাকে বিয়ে করবি?

তীর্থ - [ম্লান হেসে] সেটা আরও ইডিয়টিক হয়ে যাবে।

বিহু - তুই ভাবতে পারিস এটা দুই হাজার চোদ্দ সাল, আমার বাবা মা আমার বিয়ে দেবে ঠিক করছে, আমি জানি না। কোন এক বিয়ে বাড়িতে আমাকে দেখে নাকি পছন্দ হয়েছে ডাঃ পাত্র না মিত্রর, তার বাড়ি থেকে যোগাযোগ করে কথা বলতে আসছে আজ। ভাব একবার লাল চেলি পরে একমাথা সিঁদুর নিয়ে একটা অজানা অচেনা লোকের চোখে চোখ রেখে ক্যামেরার সামনে আমি পোজ দিচ্ছি, আমি! আমার শুভদৃষ্টি হচ্ছে। অল বোগাস!

তীর্থ - [ভীষণ গম্ভীর] তুই বাড়ি যা –

বিহু - (চমকে) মানে! (তীর্থ কড়া চোখে একবার তাকিয়ে ভেতরে চলে যায়) তীর্থ – তীর্থ –

খাঁ খাঁ শূণ্যতার মাঝে দাঁড়িয়ে একা বিহু। বুঝে পায়না কি করবে। একটু ছটফট করে তারপর শিথিল শরীরে পায়ে চটি গলিয়ে,ব্যাগ কাঁধে তুলে নিয়ে মোবাইল-এ বোতাম টিপতে টিপতে অনিচ্ছুক পায়ে বেরিয়ে যায় সে। এক-দু মুহূর্ত মঞ্চ থাকে শূণ্য। ভেতর থেকে এবার বেরিয়ে আসেন বন্যা। হাতে ক'টা বিহুর জন্যে আনা গিফট্ প্যাক, শূণ্য ঘরে এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়ে হতাশ মনে বসে পড়েন। এতক্ষণের স্তব্ধতা ভাঙে ধীর আবহে, আস্তে আস্তে মুছে যায় মঞ্চের সব আলো, আমরা পৌঁছে যাই পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় দৃশ্যে।।

তৃতীয় দৃশ্য

মঞ্চ পূর্বাপর, সময় : ভোর গড়িয়ে সবে সকাল, দৃশ্যে : ইজিচেয়ারে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়া প্রভাতবাবু। টেবিলল্যাম্পটা তখনও জ্বলছে, জানালা দিয়ে এক মনমরা বিষণ্ণ আলো এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। ডিং ডং বেল বাজে, সাড়া নেই। দ্বিতীয় বার বাজে, প্রভাতবাবু চোখ-নাকের মাঝে চশমা তুলে নিয়ে হাতের ঘড়ি দেখেন, ল্যাম্পটা নেভান তৃতীয় বার বেল বাজলে দরজা খুলে দেন : সামনে সুবেশ এক সৌম্য ব্যক্তি।

সিদ্ধার্থ - আমি সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থ বসু ফ্রম ভদোদরা –

প্রভাত - সুস্বাগতম –

সিদ্ধার্থ - 'সকালবেলায় উঠে দেখি দাঁড়িয়ে আছো তুমি একি' – তবে এ বাড়িতে এখনও সকাল হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না –

প্রভাত - আসতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?

সিদ্ধার্থ - বিন্দুমাত্র না,

প্রভাত - বন্যা জানে আপনি আসছেন?

সিদ্ধার্থ - আরে ক'ঘণ্টা আগে আমিই কি থোরি জানতাম আমি আসছি! আজই আসছি!

প্রভাত - রাত থাকতেই বেরোতে হয়েছে, ঘুম হয়নি নিশ্চই –

সিদ্ধার্থ - খাপছাড়া খাপছাড়া হয়েছে, বাকিটা আকাশপথে ঝিমিয়ে নিয়েছি,

প্রভাত - বন্যাকে যদি একটা ফোন করে দিতেন ও আপনাকে রিসিভ করতে যেতে পারত –

সিদ্ধার্থ - কেন! অফিসের কাজে কলকাতা আগমন, ব্যবস্থা তো তাদের করা উচিৎ, তারাই করেছে। রাত দশটায় কাজ সেরে বেরোচ্ছি, ফ্যাক্স এসে গেল, ই-টিকিট এসে গেল, কলকাতার তাজবেঙ্গলে সকাল ন'টায় কনফারেন্সের নেমন্তন্ন। এজেন্ডা স্টাডি করে, ল্যাপটপে দরকারি অপারেশনের সব ছুরি-কাঁচি ভরে নিয়ে যখন ঘড়ির দিকে চোখ গেল দেখি দিন বদলের সময় হয়ে গেছে। আমি তো জানি আমার গিন্নি ততক্ষণে মুঠোফোনের গলা টিপে রেখেছে। ভাবলাম যাক একটা মোক্ষম সারপ্রাইজ দিয়েই খুশি করব আমার বন্যাকে!

প্রভাত - রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত অফিস করেন, তার মানে তো বন্যাকে ঠিকমত সময়ও দিতে পারেন না বলুন!

সিদ্ধার্থ - অ্যাঁ হাঃ হাঃ আপনি সত্যি হাসালেন মশাই! আমাদের একজোড়া ছেলেমেয়ে, তারা যথেষ্ট বড় হয়ে গেল, কাজে-অকাজে দু-দশ দিনের ছাড়াছাড়ি ছাড়া আমরা সবসময়ই ঝাড়া হাত-পা কাছাকাছি, এর পরেও বলবেন আমাদের দাম্পত্যে সময়ের ঘাটতি ঘটছে! ইটস্ নট আ ফেয়ার জাস্টিস প্রভাতবাবু

বন্যা - [চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বন্যা] গুড মর্নিং –

সিদ্ধার্থ - ইয়েস, ভেরী গুড মর্ন – হাঃ বন্য, লাভলি, বিউটিফুল

বন্যা - আর ইউ ক্রেজি!

সিদ্ধার্থ - সার্টেনলি নট, তোমার এই নাইটগাউনটা রিয়েলি নাইস, অ্যান্ড আই নেভার স ইট

বন্যা – ওঃ এটা তুমিই সেবার এনে দিয়েছিলে বোধহয় ফ্রম হংকং, তবে পরতে বোধহয় দেখনি, এটা এখানেই রাখা থাকে আমি এলে পরি, (চা পরিবেশন করে)

সিদ্ধার্থ - উঁ-উ বাট ইট লুকস্ ইউ চার্মিং ইয়ার অ্যান্ড হট, ইভন্ দ্যান দিস টী

বন্যা - আঃ কি হচ্ছে সিদ্ধার্থ! (প্রভাতের দিকে দৃষ্টির পলক ফেলে) তোমার ছেলেমেয়েরাও এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে মনে রেখ।

সিদ্ধার্থ - হতে দাও হতে দাও ওদের মস্ত বড় হতে দাও। কিন্তু ডার্লিং আমরা আমাদের একটুও বুড়ো হতে দেব না। উঁ-উ না একটুও না।

প্রভাত - ওয়ান্ডারফুল, কিন্তু বন্যা সিদ্ধার্থবাবু হঠাৎ এসে পড়ে তোকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলেন, তুইও তো কিছু কম দিলি না, বাউন্সারটা হুক করে একদম ছক্কা মেরে দিলি!

বন্যা - সিম্পল, ঘুমটা ভোর পর্যন্ত গড়ালো না বলে শেষ রাতে উঠে সামনের ব্যালকনিতে গিয়ে বসেছিলাম; দেখলাম প্রায় নিঃশব্দে রাজহাঁসের মতো একটা সাদা গাড়ি এসে থামল সদরে, তা থেকে নেমে সিদ্ধার্থ হাতের একটা চিরকুট থেকে বাড়ির নম্বর মিলিয়ে ডোর বেলে হাত রাখছে। সকালের আগেই তাই আজ সকাল শুরু করে দিলাম।

সিদ্ধার্থ - আমার আগমন তোমার মনে চমক জাগাতে না পারলেও খুশি করতে পেরেছে দেখে মনের ভয়টা আমার ঘুচল।

প্রভাত - এতো আপনার আগমন নয় মিঃ সিদ্ধার্থ, আপনার আবির্ভাব। নাইস, নে তোরা দাম্পত্যালাপ চালা আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি – [চা নিয়ে ভেতরে যান]

সিদ্ধার্থ - বন্য তোমার বয়ফ্রেন্ড – স্যরি এক্স, কিসের প্রফেসর ছিলেন – বাংলা?

বন্যা - ফিলসফি, বাট হি ইজ মাই ফ্রেন্ড ইয়ার, জাস্ট ফ্রেন্ড, নো নিড টু স্পেসিফাই বয়ফ্রেন্ড অর এক্স,

সিদ্ধার্থ - ওক্কে ওকে, হি ইজ আ জেন্টল গাই, (চায়ে চুমুক দিয়ে) হুঁউ ইটস আ নাইস টী অলসো

বন্যা - [নিজের চা নিয়ে রিলাক্সড হয়ে বসে] তোমার হঠাৎ এখানে কি কাজ পড়ল?

সিদ্ধার্থ - পার্সোনাল নয়, পুরোপুরি অফিসিয়াল – (বন্যা তাকিয়ে) ওঃ ইয়েস।

বন্যা - কলকাতায় তো তোমাদের জাস্ট একটা অফিস আছে, বিজনেস তো তোমরা এখানে কর না তেমন –

সিদ্ধার্থ - রাইট, বাট এখন আমরা এ রাজ্যেও ইন্টারেস্ট নিচ্ছি, ইনভেস্ট করতে চলেছি। একটা বিশাল প্রোজেক্ট নিয়ে কথা বলে কাজ এগোতেই টপ ম্যানেজমেন্ট দায়িত্বটা আমাকে দিয়েছে। অবভিয়াসলি আমি বাংলায় কথা বলতে পারি বলে। ইন ফ্যাক্ট এই কোম্পানি অনেক বেশি টাকা অফার করে আমাকে জয়েন করালোই তো এই মিশনটা সামনে রেখে।

বন্যা - হঠাৎ!

সিদ্ধার্থ - কি হঠাৎ?

বন্যা - তোমাদের কোম্পানির বিজনেস পলিসিতে এই হঠাৎ পরিবর্তন?

সিদ্ধার্থ - পরিবর্তন ফর প্রোগ্রেস অ্যান্ড মোর প্রোগ্রেস,

বন্যা - প্রোগ্রেস! এখানে! এই রিজিয়ন-এ!

সিদ্ধার্থ - ইয়েস, হোয়াই নট? এখানে তো অলরেডি একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে ডিয়ার ডার্লিং, এখন শুধু প্রোগ্রেস দিয়ে পরিবর্তনটাকে জোরালভাবে এস্ট্যাবলিশ করা দরকার। আর সেটা করতেই আপাতত একটা পার্ট-প্রোগ্রামে আমরা সামিল

হচ্ছি। এর আগেও একবার চেষ্টা হয়েছিল, যে কোন কারণেই হোক তখন হয়নি, এখন আমি এখানে জয়েন করার পর কোম্পানি নতুন করে শুরু করছে।

বন্যা - তখন হয়নি, এখন হবে আশা করছ?

সিদ্ধার্থ - হুঁ করছি। এই তুমি খুব খুশি হয়েছ না?

বন্যা - ফানি – তোমাদের কোম্পানির লাভ-লোকসানের সাথে আমার খুশি হওয়া না হওয়ার কি সম্পর্ক?

সিদ্ধার্থ - বাট আই সি! আমি তো ভেবেছিলাম তোমার প্রিয় শহরে এসে আমাদের নেওয়া স্টেপটাতে তুমি খুশি হবে। আফটার অল তুমিও তো একসময় পরিবর্তনের একটা ঝড়ে যথেষ্ট আন্দোলিত হয়েছিলে বন্য, তুমিই বলেছ, তোমার কাছেই শোনা সে কাহিনি! কি ভুল বলছি?

বন্যা - না চেয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু আমরা যে পরিবর্তনটা চেয়েছিলাম, এটা সেটা নয় । আর –

সিদ্ধার্থ - আরে বাবা, তোমাদের চাওয়ার পাল থেকে হাওয়া ছুটে গেছে বলে হাতের হালটাও ফেলে পালাবে? "হাল ছেড়ো না বন্ধু বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে দেখা হবে তোমায় আমায় অন্য যুগের ভোরে।" বন্য তোমাদের চাওয়া বদলের বান তটে এসে পৌঁছয়নি বলে ছোট ছোট ঢেউয়ে ভেসে এগিয়ে যেতে অসুবিধে কোথায়?

বন্যা - আই অ্যাম রিয়েলি সারপ্রাইজড, এই সকালে তুমি তো একজন পাক্কা রাজনীতিকের মতো কথা বলছ সিদ্ধার্থ!

সিদ্ধার্থ - এই, এই বন্য প্লিজ, একটা গ্রেড ওয়ান মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির একজন টপ একজিকিউটিভের আর যা যা ভাইসেস থাকুক, পলিটিক্যাল বায়াসনেস নৈব নৈব চ। বরং বন্য তুমি যেভাবে রিঅ্যাক্ট্ করছ, আমি তো দেখছি তোমার মধ্যে একসময়

যে যথেষ্ট রাজনীতি ছিল, তার অনেকটাই এখনও বেঁচে রয়েছে! নাইস, চালিয়ে যাও। থ্যাঙ্ক গড, ছেলেমেয়েরা কেউ তোমার কাছে থাকে না, থাকলে হয়ত রাজনীতির ছোঁয়াচ তাদেরও ছুঁয়ে ফেলত –

বন্যা - হোয়াট!!

সিদ্ধার্থ - কি হল! কি বললাম যে এতখানি চমকে উঠলে! আরে এটা ট্র্যাডিশন থেকে হতে পারে, জিন, জিনগত কারণে হতে পারে, হতেই পারে। হ্যাঁ অবশ্য কাছে-দূরে থাকাটা সেক্ষেত্রে একবারেই ইররেলিভেন্ট,

বন্যা - [মাথার দু'পাশের রগ চেপে ধরে বসে পড়ে, শান্ত হতে কয়েক মুহূর্ত সময় বিয়ে বলে:] প্লিজ স্টপ ইট,

সিদ্ধার্থ - যা বাবা:, আমি তো অনেক আগেই ফুল স্টপ ফেলে দিয়েছি। (কাছে এসে) ছাড়ো না একজন আনাড়ির কথা –

তীর্থ - আন্টি চা – [সিদ্ধার্থকে দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে যায়]

বন্যা - অ্যাঁ!

তীর্থ - চা –

সিদ্ধার্থ - [বন্যার কাছ থেকে সরে এসে] আরে! এ কাকে দেখছি আমি, এত মিল! এতটা!

বন্যা - (চমকে, এক ঝটকায় উঠে পড়ে তীর্থকে আড়াল করার চেষ্টা) মিল! কিসের মিল! কার সাথে মিল!

সিদ্ধার্থ - দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি কিসের মিল, কার মিল নিয়ে হাতড়াচ্ছ, আমি জানি না – তুমি তীর্থ, আমি সিদ্ধার্থ, বসু। কি তীর্থ কোথাও মিল নেই?

তীর্থ - (স্রাগ করে) বাট আই অ্যাম ট্যু গ্ল্যাড টু মিট ইউ স্যর, বসুন –

সিদ্ধার্থ - হ্যাঁ! হ্যাঁ, (বসতে বসতে) এক যাত্রায় রথ দেখা, কলা বেচা, আবার বেচা-কেনা সেরে লাভের কড়ি গুছিয়ে নিয়ে ঘরে ফেরা, একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম!

বন্যা - তুমি আর এক কাপ চা খাবে তো!

সিদ্ধার্থ - তোমার মুখ দেখে বলতে ভরসা পাচ্ছিলাম না।

বন্যা - তোমরা বসো আমি চা নিয়ে আসছি –

সিদ্ধার্থ - হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি কিন্তু, আমার হাতে বরাদ্দ সময় খুব বেশি নেই। অফিসের গাড়ি এখুনি এসে পড়বে।

বন্যা - সে কি তুমি ব্রেকফাস্টও করে যাবে না?

সিদ্ধার্থ - না না আমার প্যাকড্ শিডিউল, সকাল ন'টায় তাজবেঙ্গলে কনফারেন্স, ওখানেই ব্রাঞ্চ সেরে নিয়ে সাড়ে বারোটা নবান্নতে সি.এম. মিট, ফের তিনটেয় তাজে রিপোর্ট অ্যান্ড রিভিউ, এরপর অবশ্য কিছুটা সময় আছে, রিটার্ন ফ্লাইট আমার রাত ন'টায়।

বন্যা - তাহলে ডিনারটা এখানে করে যেও –

সিদ্ধার্থ - দ্যাটস নট আ ব্যাড আইডিয়া, আচ্ছা নান্নি মুন্নির কাছে যাচ্ছ কবে?

বন্যা - কাল সকাল আটটা চল্লিশে ফ্লাইট, বসো চা আনছি – [প্রস্থান]

[বন্যার চলে যাওয়া লক্ষ্য করে দেখে, দৃষ্টি ফেরায় সিদ্ধার্থ তীর্থর দিকে]

সিদ্ধার্থ - তো তীর্থবাবু! ও হো তোমাকে তো কনগ্রাচুলেশনই জানানো হয়নি, (হাত বাড়িয়ে) কনগ্র্যাটস ফর ইওর এক্সেলেন্ট পারফরমেন্স,

তীর্থ - (করমর্দন করে) থ্যাঙ্ক ইউ,

সিদ্ধার্থ - আমি তো হঠাৎ করেই এসে পড়েছি, তোমার গিফট পাওনা রইল, পার্সেল করে পাঠিয়ে দেব।

তীর্থ - নো নিড অফ মি, ইটস ওকে, আচ্ছা আঙ্কল, নান্নি-মুন্নির তো এখন ক্লাস এইট না?

সিদ্ধার্থ - হ্যাঁ, এবার নাইনে উঠবে।

তীর্থ - কেমন প্রোগ্রেস হচ্ছে ওদের?

সিদ্ধার্থ - মুন্নিটা ওর মায়ের ব্রেন পেয়েছে, ব্রিলিয়ান্ট, নান্নি খানিকটা আমার মতো, জাস্ট অ্যাভারেজ, এবার বল তো তুমি কি ঠিক করলে? কি নিয়ে পড়বে? আই মিন কি করবে ঠিক করেছ? অ্যাডমিশন -?

তীর্থ - না, অ্যাডমিশন ফর্ম তুলিনি এখনও।

সিদ্ধার্থ - সে ঠিক আছে, ভাল রেজাল্ট হাতে থাকলে এক-দু'দিন দেরিতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু একটা ভেবে টেবে লাইন তো ঠিক করে নিতে হবে,

তীর্থ - মোটামুটিভাবে একটা ঠিক করেছি, অ্যাডমিশন লাগবে না, ভাবছি এন্ট্রিটা কিভাবে নেব!

সিদ্ধার্থ - এন্ট্রি! এই দেখ, বললাম যে আমি মধ্য-মেধার একজন, পরিষ্কার করে না বললে -

তীর্থ - ভাবছি সমুদ্রবিদ্যায় নেমে একবার দেখা যাক –

সিদ্ধার্থ - [বিস্ময়ে] মানে ওসিয়োনোলজি! দেখবে নেমে!

তীর্থ - হ্যাঁ ঐ রকমই কিছু, তবে নোনা সমুদ্রে নয়, এক'শ কুড়ি কোটির ভারতবর্ষের জনসমুদ্রে। ভেসে পড়ব রাজনীতির ভেলায় চেপে। [বিস্ময়ে মূক সিদ্ধার্থ] ভাবছি সিরিয়াসলি রাজনীতি করব।

সিদ্ধার্থ - ক্ – কি!

তীর্থ - ঠিকই শুনেছেন। আচ্ছা কথাটা শুনে সবাই এত চমকায় কেন?

সিদ্ধার্থ - (স্বগতোক্তি) হোয়াট আ কোইন্সিডেন্ট!! (সামলে নিয়ে) আরে ব্র্যাভো ব্র্যাভো, মাইন্ডব্লোইং ডিসিশন। কামাল কি বাত।

তীর্থ - থ্যাঙ্ক ইউ –

সিদ্ধার্থ - হাঃ হাঃ 'বুঝেছি আমার নিশার স্বপন হয়েছে ভোর / মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে রয়েছে ডোর।' রিয়েলি অ্যামেজিং

।। ভিন্ন ভিন্ন কারণে দুজনের মুখেই মুগ্ধতার আলো ।।

তীর্থ - আঙ্কল, আপনার আজকের এই সি.এম. মিট করা, তার আগে আজকের কনফারেন্স, সবই কি বিজনেসের অঙ্গ?

সিদ্ধার্থ - হুঁ হুঁ অফকোর্স,

তীর্থ - সি এম-কে মিট করাও?

সিদ্ধার্থ - বাপ রে বড়দিদিমণির অনুমতি ছাড়া এখানে কিছু হবে নাকি?!

তীর্থ - আপনাদের কোম্পানি এখানে ঠিক কি করতে চাইছে?

সিদ্ধার্থ - দাঁড়াও তোমাকে খুব শর্টে বুঝিয়ে দিচ্ছি, আমাদের কোম্পানি মুলতঃ মেডিক্যাল টুলস অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টস ম্যানুফ্যাকচার করে। আমাদের স্টুয়ার্টসেন-র এক্স-রে মেশিন ভুবনবিখ্যাত, কোম্পানির তৈরি পেসমেকার-কোয়ালিটি বিশ্বে এক নম্বর। তো আমরা বেঙ্গলে মাত্র কয়েক একর জমি আর মিনিমম একটু ইনফ্রাস্ট্রাকচার চাইছি, যা পেলে আমরা কয়েক হাজার ছেলেমেয়ের ব্রেড অ্যান্ড বাটার-এর ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব। প্রাইমারিলি এটা নিয়ে স্টার্ট করে, পরে আমাদের এক বিশাল পরিকল্পনা আছে। আর সে পরিকল্পনা সাকসেস পেলে তীর্থ, এ রাজ্যের ইকোনমিটাই আমরা পাল্টে দিতে পারব বলে বিশ্বাস রাখি।

তীর্থ - (অবিশ্বাসের হাসি) বিজনেস, যদিও আমি এর অ-আ-ক-খ কিছু বুঝি না তবু এক এক্স-রে মেশিন দিয়েই একটা রাজ্যের গোটা ইকোনমি পাল্টে দেবেন এমন একটা বিশ্বাস রাখায় বোধহয় ঝুঁকিটা একটু বেশিই।

সিদ্ধার্থ - (বিস্ময়ে ক্ষণিক থমকে বলেন) আমি কিন্তু ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে ভবিষ্যতের কোন রঙিন ছবি তোমাকে দেখাচ্ছি না ইয়ংম্যান, এক্স-রে মেশিন-যা দিয়ে মানুষের ভেতর পর্যন্ত দেখা যায় সাদায় কালোয়; আর যারা সেটা দেখতে পায় তারাই তো বদলের আগাম চেহারা বাৎলাতে পারে।

তীর্থ- আপনি কখনো এ রাজ্যে বাস করেননি, হ্যাঁ হয়তো কাজে কর্মে রাজধানী কলকাতায় এসেছেন দু-একবার –

সিদ্ধার্থ - হাঃ হাঃ তীর্থ বাঙালির ছেলে, ভারতবর্ষের যে কোন শহরেই জন্মাক – বড় হোক, এমন সকলেরই মনের রাজধানী কিন্তু জানবে কলকাতা। আর ভুলে যাচ্ছ কেন তোমার শহরটা তোমার আন্টিরও শহর। তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়টা সে কানপুর থেকে এসে কাটিয়েছে এই কলকাতায়। কলকাতা ঘিরে তার স্মৃতি বিলাসই আমাকে কিঞ্চিৎ বেশি করে কলকাতাপ্রেমী করে তুলেছে। সেই প্রেমের সুবাদেই, কোম্পানির কাছ থেকে যখন এই দায়িত্বটা অফার করা হল, আমি খুশি মনে লুফে নিলাম।

তীর্থ - কলকাতা বা এই রাজ্যটাকে কতটুকু চেনেন যে এখানে আপনার কোম্পানিকে প্রোমোট করার দায়িত্ব নিলেন খুশি মনে?

সিদ্ধার্থ - এই দেখ চিনি না বলে চিনে নিতে পারব না – এতটা পেসিমিস্ট হলে তো চ্যালেঞ্জটাই জীবন থেকে হারিয়ে যাবে ইয়ংম্যান, চ্যালেঞ্জ যতদিন আছে জীবন তো ততদিনই সজীব, রঙিন, না হলে সে তো বিবর্ণ – ম্যাড়মেড়ে সাদা থানের মতো এক দুঃসহ যাপন। কে চায় বল সে জীবন? তুমি চাও? এই যে তুমি যা করতে চলেছ তার কতটুকু জানো তুমি? পথ চেনো?

তীর্থ - নাঃ চলতে চলতে চিনব।

সিদ্ধার্থ - তবে! 'পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে এ পথ চেনা।' তোমার স্পিরিটকে আমি অ্যাপলস করি ইয়ংম্যান, (হাততালি, বন্যা ঢোকে)

তীর্থ - থ্যাঙ্কস

বন্যা - হঠাৎ এত হাততালির ঘটা?

সিদ্ধার্থ - দেব না? হাততালি দেব না? তোমার তীর্থর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা শুনেছ?

বন্যা - না ওর মুখ থেকে আমি কিছু শুনিনি, কিছু বলেনি আমায় –

সিদ্ধার্থ - শোন শোন কি অসাধারণ এক আর্টিস্টিক ডিসিশন নিয়েছে তোমার তীর্থ –

বন্যা - আর্টিস্টিক! কি রকম?

সিদ্ধার্থ - তীর্থ ঠিক করেছে এবার সে দেশের কাজে নামবে এবং সেটা রাজনীতির অঙ্গনে। রাজনীতি শিল্পের সেবায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ। হাঃ হাঃ বল – হোয়াট আ ডায়নামিক অ্যান্ড অ্যামেজিং ডিসিশন!

বন্যা - শিট্, রাজনীতি করতে গেলে রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা চাই, রাজনৈতিক শিক্ষা থাকা চাই, দেশের মানুষ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। ওর কি আছে? অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার ভাল হলেই সব হয় না। দেশ, দেশের মাটিকে চিনতেও একখানা সহৃদয় উপলব্ধির দরকার হয়, অঙ্কের কোন ফর্মূলায় ফেলে তা পাওয়া যায় না। পরীক্ষায় ঝুরি ঝুরি নম্বর পেলেও রাজনীতিতে ও শূণ্য পাবে, শূণ্য – আ বিগ জিরো।

তীর্থ - তুমি আমাকে কতটুকু চেনো আন্টি! [এক নিঃশ্বাসে কথা বলে আবার তীর্থর শান্ত স্বরে ঝটিতি তাকান] কতটুকু চেনো আমাকে যার ওপর দাঁড়িয়ে এত বড় সার্টিফিকেটখানা দিলে আমায়!

সিদ্ধার্থ - জিরো ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক ননসেন্স ডিজিট, একে অবজ্ঞা করো না বন্য। শূণ্যতাকে বাইরে থেকে যতই নিরীহ দেখাক, তারও যে একটা পাল্টা মার আছে তা আগে থেকে কেউ টের পায় না।

বন্যা - তোমাকেও বলি সিদ্ধার্থ, তোমার মাথাটা কি একদম খারাপ হয়ে গেছে! তুমি ওর এই অদ্ভুত চাওয়াটাকে সমর্থন করছ!

সিদ্ধার্থ - ও তো ওর জীবনটা নিজের মতোই যাপন করবে, দখল নিতে যেওনা, ও বড় হয়েছে, নিজের সঙ্গে নিজের চেনার জানার সময় হয়েছে।

বন্যা - সিদ্ধার্থ!

সিদ্ধার্থ - তবে তুমি ঠিকই বলেছ তীর্থ, এই এক'শ কুড়ি কোটির হরেক বিপুল জনতার দেশে রাজনীতির ব্যাপ্তি পারাপারাহীন এক সমুদ্রের মতো। মনে রেখো রাজনীতির অঙ্গন সমুদ্রতটের মতো কোন ট্যুরিস্ট স্পট নয় –

তীর্থ - বুঝলাম না,

সিদ্ধার্থ - তীর্থ, এই সমুদ্রের মতো গভীর উন্মত্ত রাজনীতিতে নামার আগে ঠিক করে নাও শুধুমাত্র একজন পর্যটকের মতো নিরাপদ সি-বিচে পায়চারী করে নুড়ি কুড়িয়েই বেড়াবে নাকি নুলিয়া হয়ে উন্মত্ত গভীরে নেমে হাত বাড়িয়ে দেবে বিপন্নকে উদ্ধার করতে! ইয়ংম্যান ভেবে নেমো, নেমে ভাবতে গেলে হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে যাবে, থৈ পাবে না।

সামান্য স্তব্ধতা। তীর্থ তাকিয়ে তাকিয়ে সিদ্ধার্থের দিকে বন্যা বিচলিত। ভেতর থেকে ভেসে আসছে এফ.এম-এ
"এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার..."

তীর্থ - থ্যাঙ্কস, আপনার সাথে দেখা হয়ে সত্যি অনেক উপকার হল আমার। আবার দেখা হবে– [উঠে পড়ে]

সিদ্ধার্থ - অবশ্যই, ওবেলা ডিনার টেবিলেই হবে।

তীর্থ - না তা হবে না, আমি একটু পরেই বেরিয়ে যাব দু'একদিনের জন্যে,

বন্যা - কোথায় যাবি?

তীর্থ - হুঁ! ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাব, হ্যাঁ যাচ্ছি – কোথায় যাচ্ছি সেটা বেরিয়ে ঠিক করব।

বন্যা – এভাবে লক্ষ্য স্থির না করে পা বাড়াস কেন তীর্থ? কোথায় গিয়ে পৌঁছবি? [বুকের কাছে এসে বলে]

তীর্থ - (পুর্ণদৃষ্টি নিয়ে তাকায় বন্যার চোখে) আগে পা বাড়াই, পথে একবার নেমে গেলে একটা লক্ষ্য ঠিক হয়ে যাবে ঠিক, তারপর চলতে চলতে পায়ে পায়ে পৌঁছে যাব, যেখানে পৌঁছানর।

বন্যা - (সস্নেহে গায়ে হাত দিয়ে) লাগেজ প্যাক করবি না?

তীর্থ - কয়েকটা দিনের ব্যাপার, ওটুকু লাগেজ আমার গোছানো থাকে; যাই স্নানটা করে নিই। [প্রস্থান]

বন্যা - (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) এটা তুমি কি করলে সিদ্ধার্থ! ওকে এইভাবে পলিটিক্সে ইন্সপায়ার করলে?

সিদ্ধার্থ - রিয়েলি? আরে সত্যি যদি ও আমার কথায়, শুধুমাত্র আমার কথায় ইন্সপায়ার্ড হয়ে থাকে তাহলে তো বলতে হবে 'আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল আমার'!

বন্যা - আজ যদি তোমার নিজের ছেলে নান্নি এসে এমন প্রস্তাব নিয়ে দাঁড়াত, তুমি এইভাবে এক কথায় সম্মতি দিতে পারতে?

সিদ্ধার্থ - না, বলতাম মায়ের মত নাও, মায়ের মতো হও।

বন্যা – সিদ্ধার্থ - [বাইরে গাড়ির হর্ণ]

সিদ্ধার্থ - ইয়েস ডার্লিং –

বন্যা - [সিদ্ধার্থর কাছে এসে তার চোখে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে] তুমি শুধু তীর্থ আর সিদ্ধার্থ নাম দুটোর অন্তঃমিল দেখেই তখন অত বিহ্বল হয়ে পড়লে! তীর্থর মুখের দিকে ঐভাবে তাকিয়ে আর কোন্ মিলের সন্ধান করছিলে সিদ্ধার্থ?

সিদ্ধার্থ - তুমি ডার্লিং, আজ এসে থাকা ইস্তক প্রতিটি ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করে যাচ্ছ, ইটস নট ফেয়ার অ্যাট অল,

বন্যা - (একটু সময় নিয়ে) তোমাকে আমি এখানে অনেকবার নিয়ে আসতে চেয়েছি, এত বছরের মধ্যে তোমার কখনো সময় হয়নি, আসতে বললেই বলেছ – 'বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছ, ক'দিন রেস্ট নিয়ে এস। বলেছ মঠ-মিশনে না গিয়ে কেউ যেমন শান্তিনিকেতনে যায় তোমারও শান্তির নিকেতন আছে কলকাতায়, গেলে তীর্থ দর্শনের সুখ পাবে তুমি।' বরাবর অ্যাভয়েড করে গেছ এইভাবে। আজ নিজে থেকেই এলে আর এসে এক দমকা বাতাসে সবকিছু এলোমেলো করে দিয়ে গেলে! সত্যি করে বলো তো তুমি কি চাও!

সিদ্ধার্থ - আপাতত বিদায়, দুয়ারে দাঁড়ায়ে রথ – চলি –

[বেরোনোর দরজার মুখে বিহু]

বিহু - [অচেনা সিদ্ধার্থকে কাটিয়ে সটান চলে আসে বন্যার কাছে] আন্টি –

বন্যা - এস –

বিহু - আন্টি –

বন্যা - শুনছি তোমার কথা – এক মিনিট, আলাপ করিয়ে দিই – সিদ্ধার্থ, আমার হাজব্যান্ড, এ হচ্ছে বিহু – তীর্থর খুব কাছের বন্ধু,

সিদ্ধার্থ - (চোখেতে হাসি-খুশির ঝিলিক ওঠে) ট্যু গ্ল্যাড টু মিট ইউ বেবি, (বন্যার কাছে সরে এসে গভীর গলায় বলে) বন্য সমস্ত সফল পুরুষের পেছনে থাকে এক নারীর প্রেরণা, প্রেরণায় প্রবঞ্চনা থাকে না; তীর্থর নতুন যাত্রাপথে হয়তো আমাদের বেবি –

বন্যা - সিদ্ধার্থ! [গাড়ির হর্ণ]

সিদ্ধার্থ - সাবধানে থেকো, নান্নি-মুন্নিকে বলবে পরীক্ষার চাপ যতই থাক তাদের পাপাকে ফোন করতে যেন ভুলে না যায় – আসি –

সিদ্ধার্থ বেরিয়ে যায়, একহাতে বিহুর হাত জড়িয়ে ধরে থাকে বন্যা, বিহু একবার বন্যার মুখের দিকে তাকায়, একবার তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরের দরজায়। এক-দুই মুহূর্ত কাটে। টেবিলের ওপর ভুল করে ফেলে যাওয়া সিদ্ধার্থবাবুর মোবাইল বেজে ওঠে। বন্যা চমকে ওঠে তারপর ধীর পায়ে গিয়ে ফোন ধরে

বন্যা - হ্যালো – [অপর প্রান্ত থেকে এক গভীর স্বরে – হ্যালো! বন্যা চমকে ওঠে, ভয়-বিস্ময়-ব্যগ্রতায় বন্যার কথা তুতলিয়ে যায়] হ্যালো? হ্যালো কে বলছেন? কথা বলছেন না কেন? হ্যালো কথা বলুন –

আবহে দ্রুতলয়ের কোন সুর যা একটা টেনশন তৈরি করে, লয় বাড়তে থাকে, আলো ছোট ধরা এখন শুধু বিস্ফারিত চোখের বন্যার মুখ। দ্রুত পর্দা নেমে আসে

বিরতি

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাকবিরতি দৃশ্যের শেষটুকু নিয়ে শুরু চতুর্থ দৃশ্য
আলো জ্বললে দেখা যায়

সিদ্ধার্থ - (চোখেতে হাসি-খুশির ঝিলিক ওঠে) ট্যু গ্ল্যাড টু মিট ইউ বেবি, (বন্যার কাছে সরে এসে গভীর গলায় বলে) বন্য সমস্ত সফল পুরুষের পেছনে থাকে এক নারীর প্রেরণা, প্রেরণায় প্রবঞ্চনা থাকে না; তীর্থর নতুন যাত্রাপথে হয়তো আমাদের বেবি –

বন্যা - সিদ্ধার্থ! [গাড়ির হর্ণ]

সিদ্ধার্থ - সাবধানে থেকো, নান্নি-মুন্নিকে বলবে পরীক্ষার চাপ যতই থাক তাদের পাপাকে ফোন করতে যেন ভুলে না যায় – আসি –

সিদ্ধার্থ বেরিয়ে যায়, একহাতে বিহুর হাত জড়িয়ে ধরে থাকে বন্যা, বিহু একবার বন্যার মুখের দিকে তাকায়, একবার তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরের দরজায়। এক-দুই মুহূর্ত কাটে। টেবিলের ওপর ভুল করে ফেলে যাওয়া সিদ্ধার্থবাবুর মোবাইল বেজে ওঠে। বন্যা চমকে ওঠে তারপর ধীর পায়ে গিয়ে ফোন ধরে

বন্যা - হ্যালো – [অপর প্রান্ত থেকে এক গভীর স্বরে – হ্যালো! বন্যা চমকে ওঠে, ভয়-বিস্ময়-ব্যগ্রতায় বন্যার কথা তুতলিয়ে যায়] হ্যালো? হ্যালো কে বলছেন? কথা বলছেন না কেন? হ্যালো কথা বলুন – আমি শুনতে চাই – হ্যালো –

[একটু বেশিক্ষণ চুপচাপ অপরপ্রান্ত]

মহিলা কণ্ঠ - আমি স্টুয়ার্টসেন কোম্পানি থেকে রিনি বলছি, রানৌলি ওয়ার্কস, বলছি যে–

বন্যা - স্যরি, বাট আপনার আগে কোন মেল ভয়েস ‘হ্যালো’ বলল, তারপর –

মহিলা কণ্ঠ - ম্যাম স্যরি, অ্যাট দিজ মোমেন্ট উই আর ইন গ্রেট হারি, প্লিজ সে এই নাম্বারটা তো মিঃ সিদ্ধার্থ বসুর, তাই না?

বন্যা - হ্যাঁ হ্যাঁ উনি তো একটু আগেই একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে বেরিয়ে গেলেন, তাড়াহুড়োয় হ্যান্ডসেটটা ভুল করে ফেলে রেখে গেছেন –

মহিলা কণ্ঠ - আই সি, বাট আপনি?

বন্যা - আমি সিদ্ধার্থের স্ত্রী বন্যা,

মহিলা কণ্ঠ - থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর কাইন্ড কোঅপারেশন, বাই,

বন্যা - না না ছাড়বেন না, শুনুন –

মহিলা কণ্ঠ - ইয়েস?

বন্যা - দেখুন একটু আগে মানে আপনার আগে কেউ একজন –

মহিলা কণ্ঠ - ম্যাম এই মুহূর্তে আমরা ভীষণ ব্যস্ত, মিঃ সিদ্ধার্থকে টেলিকনফারেন্সে আমাদের এখুনি প্রয়োজন, এটা তো কনফারেন্স লাইন হয়তো কেউ বলেছেন, বাট নাও উই আর স্যরি টু ডিসকন্টিনিউ, আমাদের পরে কোন সময় কথা হবে, বাই - [অপর প্রান্ত থেকে ফোন কেটে দেয়]

[ভারসাম্য হারানো শরীরটা বন্যার টলছে]

বিহু - কি হল আন্টি! কার ফোন! কি বলছে! তুমি এরকম – বসো বসো এখানে, [স্থাণুবৎ বন্যা বসে পড়ে একটা সোফায়] হ্যাঁ কার ফোন ছিল বল তো? মনে তো হল একজন মহিলার গলা –

বন্যা - তার আগে একটা পুরুষ কণ্ঠ, শুধু হ্যালো একখানা –

বিহু - হ্যাঁ তো! এই সেটটা তো সিদ্ধার্থ আঙ্কলের, গলাটা কি তোমার চেনা? তুমি আঙ্কলের কোম্পানি সার্কেলের কাকে কাকে চেন, তাদের কারোর গলা –

বন্যা - না রিনি–বিনি-মিনি আমি কাউকে চিনি না। কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বর আমার চেনা, বহুদিনের চেনা।

বিহু - [সিদ্ধার্থের ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে] মাই গুডনেস, মেয়েটি বলল না – রানৌলি ওয়ার্কস! বাট ফর্মার নাম্বার ওয়াজ ফ্রম অ্যাব্রড! ফানি, দ্যাট মিনস সাম টেক্সট আর মিসিং, শুধু একটা হ্যালো, আর সেটাই তোমার বহুদিনের চেনা লাগল! কোন ভুল হচ্ছে না তোমার?

বন্যা - না। বহুদিন আগে শোনা ঐ গলার স্বর বহুদিন পড়ে শুনেও চিনতে আমার কোন অসুবিধে বা ভুল হয়নি।

বিহু - ফাইন, ঐ গলার স্বর হারিয়ে যায়নি কান থেকে, মানে মানুষটাও হারিয়ে যায়নি মন থেকে! মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সে কেউ! আচ্ছা তোমার কোনও বন্ধু সে? [বন্যা তাকায়] কে হতে পারে! আচ্ছা তোমাদের সেই কমন ফ্রেন্ড বিজন সেন নয়তো?

বন্যা - বিহু!! [বন্যার চিৎকারে প্রভাত বেরিয়ে আসে]

প্রভাত - বন্যা – কি হয়েছে? কি হয়েছে বিহু? কিরে কি?

বন্যা - প্রভাত, বিজন –

প্রভাত - বিজন! কি বিজন! বোগাস! বিজন –

বিহু - আঙ্কল একটা ফোন এসেছিল –

প্রভাত - ফোন! বিজন তোকে ফোন করেছে?

বন্যা - আমাকে নয়, সিদ্ধার্থকে। সিদ্ধার্থর ফোনে কলটা এসেছিল।

প্রভাত - শান্ত হ’। তুই জানিস সেটা সম্ভব নয়, ওটা একটা ভুতুড়ে ফোন। তোর বুঝতে কোনও গোলমাল – ঠিক আছে, কি বলল?

বন্যা - কিছু না, শুধু একটা ‘হ্যালো’ – তারপর আমার গলা শুনেই লাইনটা একজন মহিলাকে ধরিয়ে দিল।

প্রভাত - শুধু একটা ‘হ্যালো’ বলল আর তুই তাকে চিনে ফেললি! বিজন! যে আমাদের চোখের সামনে ভেসে গেল হড়কা বানে, দু’দিন ধরে নিজেরা সবাই মিলে খুঁজলাম, সরকারি লেভেলে খোঁজা হল পাওয়া গেল না আর আজ এতদিন পরে হঠাৎ সে ফিরে এল, ফোন করল, তাও তোকে আমাকে নয়, তোর হাজব্যান্ডকে। এটা তুই বিশ্বাস করছিস, আর আমাকেও বিশ্বাস করতে বলছিস! বেশ ফোন নাম্বারটা দে, কল ব্যাক করলেই বোঝা যাবে।

বিহু - কোড দেখে মনে হচ্ছে ফোনটা এসেছে ইউ.এস.এ. থেকে, যদিও মহিলাটি বলল –

প্রভাত - ও যে যাই বলুক আমি তো বলছি ওটা একটা ভুতুড়ে ফোন, আর মৃত মানুষ কখনও (বন্যা কড়া চোখে তাকায়) আচ্ছা বেশ তোর যদি ভুল না হয়, বলতে হবে সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে বিজনের যোগাযোগ আছে। আর এটা সত্যি হলে, বেশ আবার তাকে খুঁজে দেখতে হবে। যেটা অসম্ভব বলে জানি সেটা সম্ভব হলে দেখা হবেই।

বন্যা - তারপর?

প্রভাত - সেটা তুইও জানিস না আমিও জানি না। আচ্ছা একটা কথা বল তো – যে মহিলাটি পরে তোর সঙ্গে কথা বলল সে নিজের পরিচয় কি দিল, না না তার আগে বল সে কি তোর নাম বা পরিচয় জেনেছে?

বন্যা - হ্যাঁ, মেয়েটি, মনে হল খুব অল্প বয়স, নাম রিনি। আমাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করল, বললাম।

প্রভাত - হুঁ! আশ্চর্য!

বন্যা - কি আশ্চর্য! প্রভাত?

প্রভাত - বিদেশ থেকে ফোন এল সিদ্ধার্থবাবুর নাম্বারে! ফোনটা অফিসিয়াল! বেশ, কিন্তু সিদ্ধার্থ বসু প্রথমদিন এলেন এখানে আর ভুল করে ফোনসেটটা ফেলে চলে গেলেন! নাও দ্য মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন ইজ সিদ্ধার্থবাবু কতদিন ধরে, কতটা চেনেন ঐ পুরুষকণ্ঠের অধিকারীকে?! বন্যা অঙ্কটা খুব জটিল রে, অবশ্য অঙ্কটাই থাকে না যদি তোর কানের কোন গণ্ডগোল–

বন্যা - আঃ আমি তো বলছি আমার কোন ভুল হয়নি, হচ্ছে না কোন ভুল। ঐ গলা বিজনের।

প্রভাত - তাহলে অঙ্কটা সত্যিই জটিল, উত্তরও মিলবে না সরলে।

বন্যা - এখন পরিণামটা কি হতে পারে বুঝতে পারছিস!

প্রভাত - টেনশন করিস না, এত টেনশনের কিছু নেই;

বন্যা - নেই?

বন্যা - না, বরং বিহু এসেছে অনেকক্ষণ, ও বোধহয় কিছু বলতে চায় দেখ, এনি প্রবলেম?

বিহু - নো –

বন্যা - তুই চলে যাচ্ছিস, কিছু বলবি না? (প্রভাত দাঁড়ান / অস্বস্তি নিয়ে বিহুকে দেখেন) তীর্থ! তীর্থর কি হবে?

প্রভাত - শুধু তীর্থর কথাই ভাবছিস? (আড়চোখে বিহুকে দেখে নিয়ে) বন্যা –

বিহু - এক মিনিট। একটা প্রশ্ন – তোমাদের বন্ধু বিজন সেন মারা গেছে?

প্রভাত - [বন্যার সঙ্গে দৃষ্টির সংঘাত এড়িয়ে, এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলেন] হ্যাঁ।

বিহু - কবে – কোথায় – কিভাবে?

প্রভাত - তুমি অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেললে। বিহু তুমি যেদিন প্রথম এ বাড়িতে এলে অনুমতি না নিয়ে দুয়োর পেরিয়ে ভেতরে পা রাখোনি, তোমার এথিক্যাল সেন্সটা ভাল লেগেছিল, বলেছিলাম মনে রাখতে।

বন্যা - আঃ প্রভাত কি হচ্ছে! ও তীর্থর বন্ধু

প্রভাত - হেতুহীন কৌতূহল! জটিলতা বাড়িয়ে বন্ধুকে ক্ষতির খাতায় পৌঁছে দিতে পারে, ওকে বোঝা। [প্রস্থান]

বিহু - আন্টি –

বন্যা - স্যরি, হ্যাঁ বিহু বিজনকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি, অনেকদিন আগে তাকে খুইয়ে ফেলেছি, অথচ আজ মনে হচ্ছে –

বিহু - হারানো মানেই সবসময় খোয়ানো নয়। একবার হারালে তাকে আবার ফিরে পাওয়া যায় অনেকসময়। আমার এখন মনে হচ্ছে তুমি ফোনে ঠিকই শুনেছ এবং চিনেছ। এখন ফেরা বা ফেরানো সবটাই –

বন্যা - তুমি আগু-পিছু কিছু না জেনেই এতগুলো কথা বলছ কেন? এটা কোন বাচ্চার খেলনা হারিয়ে যাওয়া নয় যে খুঁজলেই ঘরের কোণা থেকে ফিরে পাওয়া যাবে তাকে।

বিহু - কিন্তু এও তো তোমাদের ফেলনা কিছু নয় আন্টি, চোখ থেকে হারিয়ে ফেলেও মনের কোণে ঠাঁই দিয়ে রেখেছ, হাতড়ে দেখতে দোষ কি?

বন্যা - বিহু –

বিহু - চলে যেতে বলছ?

বন্যা - না, তা বলছি না। তুমি কিছু বলতে এসেছিলে শোনা হয়নি, আমারও তোমাকে কিছু বলার আছে, বলা হয়নি। কাল সকালেই আমি বেঙ্গালুরু চলে যাব, তার আগে কথাগুলো শোনা-বলা দরকার।

বিহু - বেশ তো বলো কে আগে বলবে, কে শুনবে আগে,

বন্যা - তুমিই ইচ্ছে করলে আগে বলে নিতে পার, তবে একটু অপেক্ষা কর; দেখি, তীর্থ বেরোচ্ছে – হাতের কাছে সব ঠিকঠাক পেল কিনা – একটু অপেক্ষা কর –

[প্রস্থান]

বিহু - তীর্থ বেরোচ্ছে! কোথায় যাচ্ছে! আশ্চর্য!

তীর্থ - (ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, ভেতরে শোনানোর মতো করে বলে) আমি বেরোচ্ছি –

বিহু -	তীর্থ –

তীর্থ -	তুই! সকালবেলাই? কি বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছে?

বিহু -	সে আপদ ঝামেলা তো দু'দিন ধরে চলছেই, কিন্তু তীর্থ এদিকেও খুব বিপদ।

তীর্থ -	বিপদ! কার?

বিহু -	আন্টির।

তীর্থ -	ওঃ তো!

বিহু -	আঙ্কলেরও বিপদ।

তীর্থ -	(ভেতর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে) দুটো বিপদ আলাদা আলাদা না ভাইস-ভার্সা?

বিহু -	তুই ইয়ার্কি ভাবছিস, আমি কিন্তু সিরিয়াস। এই বিপদ তোকে-আমাকেও ছুঁয়ে ফেলতে পারে যে কোন সময়ে।

তীর্থ -	বাব্বাঃ তা এত বিপদের কথা তুই জানলি কি করে?

বিহু -	জেনেছি যে করেই হোক।

তীর্থ -	বিপদটা ঠিক কি, সেটা জেনেছিস?

বিহু -	জেনেছি, তবে এখনও ক্লিয়ারলি নয়।

তীর্থ -	তাহলে ছাড়। কি বিপদ, কিসের বিপদ, না জেনে ফর নাথিং ভয় পাওয়ার কোন মানে হয় না, এখন যেখানে যাচ্ছি যেতে দে –

বিহু -	কোথায় যাচ্ছিস?

তীর্থ - সেও এক মজার ব্যাপার হয়েছে বুঝলি, আরে কি করছ আর কি পড়ছ – এসব শুনতে শুনতে বোর হয়ে গিয়ে ভাবলাম – যাই কাউকে কিছু না ব'লে ক'দিনের জন্য কোথাও গিয়ে একটু ঘুরে আসি। গন্তব্য কিছু স্থির নেই। কিন্তু বাদ সাধল একটু আগে আসা একটা মজার ফোন। কলার নাম বলল না কিন্তু ইন্টারেস্টিং সব অফার্সের বিরাট প্যাকেজ। কোনটাই আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেনি। তবু আপাতত গন্তব্য স্থির করে সেদিকেই পা বাড়িয়েছি, দেখি না কি হয়!

বিহু - একটা উড়ো ফোন পেলি আর গন্তব্য স্থির করে ফেললি!

তীর্থ - অ্যাবসোলিউটলি।

বিহু - কার ফোন, কোথা থেকে ফোন এসব না জেনেই –

তীর্থ - আরে ধ্যুর কি হবে! দেখি না গিয়ে, আর সবটাই যে অজানা তা তো নয়। বরং – কিছুটা পার্সোনাল ডিস্ক্রিশনে থাক আপাতত।

বিহু - কিন্তু হুট করে ছুট লাগালেই তো বিদেশ পৌঁছনো যায় না তীর্থ!

তীর্থ - [চমকে ওঠে] মানে!

বিহু - ফোনটা এসেছিল কোথা থেকে? বিদেশ থেকে! ইউ.এস.এ.!

তীর্থ - আশ্চর্য!

বিহু - বললাম তো আমাদের সবাইকে জড়িয়ে একটা বিপদ কিন্তু ঘনিয়ে আসছে দ্রুত।

তীর্থ - এর মানেটা কি!

বিহু - তোর কাছে যে ভুতুড়ে ফোনটা এল তার মানেটাই বা কি! ফোনে কার আমন্ত্রণ তুই কোথায় পেলি? আমন্ত্রণ কোথায়? কতদূরে?

তীর্থ - দাঁড়া দাঁড়া, ফোনটা এসেছিল হ্যাঁ দূর দেশ থেকে ঠিক! দেখা করতে বলেছে কলকাতারই একটা ঠিকানায় একজনের সাথে, যাকে নাকি আমি চিনি,

বিহু - কে সে? কিসের প্রয়োজন তার? তোরই বা কিসের প্রয়োজন তার সাথে? যাবি না তুই। (হতম্ভবের মতো তীর্থ তাকায় বিহুর দিকে) তীর্থ বিষয়টাতে এই মুহূর্তে গুরুত্ব না দিলে বিপদ কিন্তু হান্ড্রেড মাল্টিপল্-এ বাড়বে।

তীর্থ - হুঁ, একটা রহস্য! আচ্ছা তুই যে বিপদের কথা বলছিস তারও বার্তা কি এসেছে এরকমই একটা ডিসট্যান্ট কল থেকে?

বিহু - একজ্যাক্টলি, প্রোব্যাবলি ফ্রম সেম ডিস্ট্যান্স (তীর্থ এখন সত্যি গভীর ভাবনায় আত্মগত) তুই বিজন সেন নামে কাউকে চিনিস?

তীর্থ - হুঁ! হ্যাঁ! বিজন সেন নামটা বেশ কয়েকবার শোনা। সে তো মারা গেছে বেশ, বেশ অনেক বছর আগে – একটা অ্যাক্সিডেন্টে।

বিহু - তথ্যটা ঠিক নয়। বিজন সেন বেঁচে আছে আজও।

তীর্থ - তাই নাকি! বিজন সেন লোকটা বেঁচে আছে, তুই কনফার্মড?

বিহু - অলমোস্ট,

তীর্থ - তাহলে কেন এই মিথ্যেটা একজিস্ট করছে এতদিন ধরে! – তাহলে আমাকে ফোনটা করেছিল বিজন সেন! বলল ‘আমাকে তোমার একজন সুহৃদ ভাবতে পার’! – শত্রু নয়, সুহৃদ!

বিহু - ফাইন,

তীর্থ - কি ফাইন?

বিহু - জটিলের জট খোলার সূত্র একটা মিলেছে বোধহয়!

তীর্থ - আচ্ছা বিজন সেনই হোক বা এক্স ওয়াই জেড যেই হোক আমাকে ফোন করল, আমার নম্বর পেল কোথায়!

বিহু - ইডিয়ট, ফেসবুকে তোর অ্যাবাউটস দেওয়া আছে না! চয়েসও কিছু আছে নিশ্চয়ই!

তীর্থ - হুঁ, ঠিকই বলেছিস যে ফোন করেছিল সে আমার অনেক খোঁজখবরই রাখে, ইভন্ আমার আপডেট প্ল্যানিংটাও! আচ্ছা বিহু বিজন সেন বেঁচে আছে, আর তোর কথা মতো আসন্ন বিপদের সে-ই যে ভগ্নদূত, তুই জানলি কি করে?

বিহু - (সিদ্ধার্থবাবুর ফোন সেটটা তুলে ধরে) কিছুক্ষণ আগে এটাতেও একটা ফোন এসেছিল, ফ্রম ইউ.এস.এ. অ্যান্ড দ্য ভয়েস ওয়াজ অফ শ্রীযুক্ত বিজন সেন। এই সেটটা আন্টির হাজব্যান্ড সিদ্ধার্থ বসুর, ভদ্রলোক সেটটা ভুল করে ফেলে রেখে গেছেন।

তীর্থ - হুঁ? কলার তার নাম বলল – বিজন সেন!

বিহু - নাঃ ভয়েস ইজ আইডেন্টিফায়েড বাই আন্টি।

তীর্থ - ইজ ইট! এতদিন পর বন্ধুর গলার আওয়াজ শুনে চিনতে পারা, বাব্বাঃ এ তো রহস্যের ঘনঘটা! আচ্ছা ঠিক আছে রহস্যব্যূহে কর্ণের মতো ঢুকে তো পড়ি, জীবনে এই একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েই দেখা যাক – [বিহুর দু'হাতে নিজের দু'হাতের তালি দিয়ে বেরোতে প্রস্তুত হয়]

বিহু - তীর্থ (তীর্থ ঘুরে দাঁড়ায়) তোর এই কর্পোরেট লুকটা আগে তো কোনদিন দেখিনি –

তীর্থ - হ্যাঁ, যেখানে যাচ্ছি সেখানে এই লুকটা কাজে লাগবে ভেবেই – বলতে পারিস এ আমার রণসাজ –

বিহু - বাট ইউ আর লুকিং ট্যু হ্যান্ডসাম অ্যান্ড সিমপ্লি চার্মিং

তীর্থ - (দুষ্টুমি চোখে চারদিকে চোখ বুলিয়ে) তাহলে এই কমপ্লিমেন্টে একটা শিলমোহর লাগিয়ে দে তাড়াতাড়ি –

বিহু - অসভ্য

তীর্থ - উঃ!

নিজের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে না পেরে ছুটে এসে পড়ে তীর্থর বুকে, গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। মুহূর্ত পড়ে বিচ্ছিন্ন হয় অনিচ্ছার আলস্যের মধ্যেই –

তীর্থ - চলি –

বিহু - আয়

তীর্থ বেরিয়ে গেলে বাইরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় বিহু, তারপর অর্থপূর্ণ আবহের মধ্যে এক মুহূর্ত পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করে

হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক –

আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।

।। আবহে ধরা সুরের মূর্ছনা আমাদের পৌঁছে দেয় এক অন্য মাত্রার পরিবেশে।।

ওগো তুমি নিরুপম,

হে ঐশ্বর্যবান,

তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান

গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়

হে বন্ধু বিদায়।

[জোরালো আবহের মধ্যে আলো নেভে। দৃশ্যান্তর ঘটে]

পঞ্চম দৃশ্য

এখন অনেক রাত। নিঃঝুম নীরবতার মাঝে অপেক্ষায় উদ্বেগে শ্রান্ত অবসন্ন দুজন মানুষ। মাঝরাতে রাজপথে চলা একটা দুটো গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ মিশে যায় হালকা আবহের সুরে। বড়ই শঙ্কা জাগানো এই রাত। একসময় ফোন কানে তুলেও নামিয়ে রাখে বন্যা।

প্রভাত - সুইচড্ অফ?

কোন উত্তর না দিয়ে, ফোনটা নামিয়ে রেখে ভেতরে যেতে পা বাড়ায় বন্যা। হঠাৎ করে "উই শ্যাল ওভারকাম" রিংটোনে বেজে ওঠে বন্যার মোবাইল। ছুট্টে এসে ফোন তুলে স্ক্রিনে নাম দেখে, "সিদ্ধার্থ", শান্ত স্বরে বলে –

বন্যা - হ্যাঁ, পৌঁছে গেছ?

সিদ্ধার্থ - হ্যাঁ এইমাত্র ঘরে পৌঁছলাম। আমি তো ভাবছিলাম তোমার মুঠোফোন এতক্ষণে গলা পা হয়ে রয়েছে। তো তুমি এখনও জেগে রয়েছ দেখছি! তবে বন্য ডিনারটা যা খাইয়েছ না, একদম একঘর। পিটার ক্যাটের চেলো কাবাব, লা জবাব। একদম হলমার্ক ব্র্যান্ড।

বন্যা - হুঁ, কিন্তু এ তো তোমার পরমানন্দ ঠাকুরের রান্না নয়, দু'চামচ কার্মোজাইম খেয়ে নিও। নাও গুড নাইট

সিদ্ধার্থ - না না দাঁড়াও, কি ব্যাপার তোমার গলাটা এরকম শোনাচ্ছে কেন! ঘুমিয়ে তো পড়োনি, তবু এরকম দুঃস্বপ্নে ঘুম ভাঙা গলা কেন?

বন্যা - নাঃ সেরকম কিছু নয় –

সিদ্ধার্থ - তাহলে কিরকম কিছু? কি প্রবলেম বন্যা!

বন্যা - ওঃ বললাম তো কিছু হয়নি সেরকম,

সিদ্ধার্থ - সত্যি বলছ! ঠিক আছে শুয়ে পড়। তোমার বয়ফ্রেন্ড থুড়ি তোমার সুজনবন্ধু প্রভাতবাবু, তিনি নিশ্চয়ই –

বন্যা সেও এখানে, আমার সামনে বসে রয়েছে।

সিদ্ধার্থ - ওঃ তাই বল, সকালে বেঙ্গালুরু উড়ে যাবার আগে জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে! পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন! চালিয়ে যাও। তবে বন্য কয়েক ঘণ্টা ঘুম কিন্তু তোমারও দরকার! রাতের বারো আনা –

বন্যা - এত কিছু ভেবে বসো না, পড়ে থাকা চার আনা রাতে আর তোমারও চোখে ঘুম আসতে চাইবে না।

সিদ্ধার্থ - দু'পেগ স্কচ নিয়ে বসেছি, শেষ হবে, লাইট নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। এবার গুডনাইট বলি–

বন্যা - আসলে তীর্থ তো সেই সকালে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি, মোবাইলও অফ করা রয়েছে।

সিদ্ধার্থ - ওঃ এই ব্যাপার! তাই এত উদ্বিগ্ন! কিন্তু সকালে তো বলছিল দু'এক দিনের জন্যে কোথায় যাবে দেখ সেরকমই কোন –

বন্যা - তখনই তো তোমাকে বললাম ও সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে বেরোয়নি। কলকাতারই কোন একজায়গায় কার সাথে দেখা করতে বেরিয়েছে।

সিদ্ধার্থ - হ্যাঁ হয়ত সেখান থেকেই আবার রওনা হয়ে গেছে অন্য কোথাও –

বন্যা - বাড়িতে না বলে? এতখানি ইররেস্পন্সিবিল তীর্থ নয়।

সিদ্ধার্থ - হয়তো ওর আরও কাছের কাউকে বলে গেছে।

বন্যা - কাছের কেউ? আমি না হয়, কিন্তু প্রভাতের চেয়ে আরও কাছের কেউ ওর আছে নাকি!

সিদ্ধার্থ - ওকে এতদিন যা বুঝিয়েছ ও তাই বুঝেছে। কিন্তু তীর্থ বড় হয়েছে, নিজে জানতে শিখেছে, বুঝতে শিখেছে, চিনতে শিখেছে। অনুশাসনের শিকল ছেঁড়ার শক্তি এসেছে ওর মনে।

বন্যা - স্কচ কতটা খেয়েছ এর মধ্যে? ইররেলিভেন্ট কথা বলছ! প্রভাতের চেয়ে আপন ওর আর কে আছে?

সিদ্ধার্থ - কেন ঐ যে কুহু না বিহু – সে তো ওর খুব কাছের। ও কিছু জানে না? কিছু বলেনি?

বন্যা - না ঐ ছোট্ট মেয়েটাও কিছু জানে না। ওকে ফোন করেছিলাম; মাঝখান থেকে ওকেও অ্যাংজাইটিতে ফেলে দিলাম।

সিদ্ধার্থ - ছোট্ট মেয়ে! বাচ্চা মেয়ে! দিল মে সাচ্চা! খোঁজ নিয়ে দেখ তীর্থ সম্পর্কে ও তোমার চেয়েও অনেক বেশি জানে। অনেক বেশি চেনে তীর্থকে। নাও গুডনাইট। সুবহ্ মে ফির মিলেঙ্গে। বাই

বন্যা - ওঃ, আমি না থাকলেই লিমিটলেস খাবে, মাতাল হবে, আর উল্টোপাল্টা বকবে অনর্গল।

[প্রভাত এতক্ষণ ফোনে চেষ্টা করছিল, হতাশ হয়ে]

প্রভাত - নাঃ

বন্যা - সাড়া নেই কোনও! (প্রভাত মাথা নাড়ে) প্রভাত এবার কিন্তু আমার খুব ভয় করছে।

প্রভাত - কিন্তু মাথা মুন্ডু না জানতে পারলে ভয়টাই বা করব কিসে! তীর্থ যথেষ্ট সেন্সেবল্।

বন্যা - তুইও তো ভয় পাচ্ছিস! এরকমটা আগে কখনো ঘটেছে?

প্রভাত - এরকম ঘটনা যে আগে কোনদিন ঘটায়নি একদম, তা নয়। তবে সেসব সময় তো আজকের এই প্রেক্ষিতটা ছিল না। বিহুর মুখে আজ যা শুনলাম, ও এরকম একটা অবিবেচকের মতো পা বাড়াবে আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। কেমন যেন একটা অন্য রকম লাগছে।

বন্যা - ব্যাপারটা এখন ভয়ের বেড়াও পার করে আতঙ্কে এসে ঠেকেছে প্রভাত!

প্রভাত - দেখতে দেখতে রাতও গড়িয়ে চলেছে। সকালে তোর ফ্লাইট আটটা চল্লিশ, না?

বন্যা - হ্যাঁ, কিন্তু এখন আর সেসব নিয়েও ভাবতে পারছি না। ফার্স্ট মর্নিং-এ নান্নি-মুন্নিকে একটা ফোন করে দেব দরকার হলে। জানি না সিদ্ধার্থ কি ভাববে, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। (দু'হাতে মাথাটা ধরে মুখ নামিয়ে নেয় আবার ঝটিতি মুখ তুলে বলে) প্রভাত কিছু হলে তুই-আমি-তীর্থ-নান্নি-মুন্নি আমার সংসার সব ভেসে যাব একসাথে অথৈ-এ। শেষ হয়ে যাব রে। মনে হচ্ছে ডুবন্ত টাইটানিকের ডেকে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই, কারও কোন লাইফ জ্যাকেট নেই, একটাও লাইফ বোট নেই হাতের কাছে।

প্রভাত - (কড়া চোখে তাকিয়ে) কিছু হওয়া মানে কি হওয়ার কথা তুই বলছিস?

বন্যা - কিছু না, কিছু বুঝতেই পারছি না কি বলব। প্রভাত তুই ঠিক দেখেছিলি না? হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস, মুহূর্তে তীব্র হয়ে উঠল, বিজন বেগ সামলাতে না পেরে তোর পাশ থেকে পড়ে গিয়ে ভেসে গেল জলের তোড়ে, ঐ হড়কা বানে। তোর ঠিক মনে আছে – না প্রভাত!

প্রভাত- মুহূর্তে, মুহূর্তের মধ্যে তীব্র হয়ে উঠল জলের উচ্ছ্বাস। পা ভিজিয়ে বসেছিলাম দু'জনে পাশাপাশি, এডগার স্নোয়ের 'রেড স্টার ওভার চায়না' নিয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিলাম আমরা। হঠাৎই এক জল গর্জনে কেঁপে উঠে পা তুলে নিয়ে পালাতে যাব,

আমি পারলাম, বিজন পারল না। এক টানে টেনে নিল ওকে। আমি হাত বাড়ালাম, নাগাল পেলাম না। বিজন চিৎকার করে ডাকল – কমরেড –

বন্যা - আমি তো একটু আগেই তখন ডানপাশে ঝোপের আড়ালে ভিজে কস্টিউম পাল্টাতে গেছি, হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের গর্জন সার বিজনের আধখানা আর্তচিৎকার ঐ কমরেড ডাক শুনে ছুটে এলাম; এগোতে পারলাম না, পাড় ভেঙে নদী তখন পায়ের কাছে। তুই একটা গাছ আঁকড়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপছিস জলের তোড়ের দিকে চেয়ে, আশেপাশে বিজন তখন কোথাও নেই।

প্রভাত - তুই তখন অর্ধনগ্ন।

বন্যা - মনে আছে। মাথার ঠিক ছিল না –

প্রভাত - চিন্ময় আর মল্লিকা তখন বাঁপাশের জঙ্গলে ঢুকে ক্যামেরায় ভিজে পাখির ছবি তুলছে।

বন্যা - কিন্তু চিন্ময়রা তো সেদিন রাত পর্যন্ত আমাদের কাছে ফিরতেও পারল না। ঐ দুর্যোগে আমরা দু'জন মাত্র। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত। শুনসান রাতের নিবিড় অন্ধকার আমাদের ঘিরে ফেলেছে ততক্ষণে। অন্ধকারের আড়ালে বসে সে রাতেই আমি তোকে সব বললাম। সব জানালাম তোকে।

প্রভাত - মনে আছে। মল্লিকাকে নিয়ে গাছে উঠতে পারেনি বলে ইলেক্ট্রিফিকেশনের জন্যে যে টাওয়ার বসানো হচ্ছিল তারই একটার অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিল ওরা। পরের দিন সকালে যখন গ্রামবাসীদের নিয়ে আমরা বিজনকে খুঁজতে বেরিয়েছি ওরা এসে দাঁড়ালো আমাদের পাশে। ভয় আর অজানা আতঙ্কে তখন ওরা দু'জন মরার মতো সাদা, বাকহারা দুটো শব যেন এসে দাঁড়াল। তবে ওরাও দেখেছিল বিজনের ভেসে যাওয়া – জলের আওয়াজে বিজনের কমরেড ডাকটা বোধহয় শোনেনি –

বন্যা - আচ্ছা ওদের হাতে তো ক্যামেরা ছিল, সে সময়ের কোন ছবি ওঠেনি ওদের ক্যামেরায়?

প্রভাত - তুই কি পাগল, ঐ সময়ে ঐ দুরন্ত দুর্যোগে প্রাণ বাঁচানোই দায়, ছবি তোলা সম্ভব!

বন্যা - তোরা তিনজনেই দেখেছিস সেদিন দুরন্ত প্লাবনে ওকে ভেসে যেতে, অথচ ফোনে – নাঃ না না আমারই তাহলে ভুল হচ্ছে কোথাও, বিজনের গলা ওটা ছিল না বল! প্রভাত –

প্রভাত - জানি না, তোর কনফিডেন্সটাই তো সব গোলমাল পাকিয়ে দিচ্ছে। তারপর তীর্থও একটা ফোন পেয়ে উদভ্রান্তর মতো দৌড়ল। কি ফোন, কার ফোন, কোথায় যাচ্ছে কাউকে কিছু বলে গেল না। বিছু তো শেষ পর্যন্ত ওর কাছেই ছিল, ওকে তো অন্তত, - জানি না, ভাবতে পারছি না কিছু। দু'টোর মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকলে ব্যাপারটা অবশ্যই জটিল। ধ্যুস এভাবে অন্ধকারে হাতড়ে – কি যে করছে ছেলেটা সারারাত ধরে –

বন্যা - যদি সে সবকিছু জানতে পেরে গিয়ে থাকে এর মধ্যে? প্রভাত –

খুব জোরে বাইরে একটা ট্যাক্সি এসে থামার আওয়াজ, কথার ফাঁকে এদের খেয়াল ছিল না সময় গড়িয়ে গিয়ে সময় এখন গোধূলি ভোর। চমকে ওঠে ওরা দুজনেই।

প্রভাত - স্টেডি, পরিস্থিতি যাই হোক স্পোর্টিংলি ফেস করতে হবে। ব্যবহারে যেন একটুও এদিক-ওদিক না হয়। খুব সাবধানে –

বন্যা - আমার হাত-পা কাঁপছে প্রভাত। চোখে অন্ধকার দেখছি আমি,

প্রভাত - সেদিন এর চেয়েও বেশি অন্ধকার ছিল। তীর্থ যথেষ্ট সেন্সেবল্ – ফেস হিম–

বন্যা - হ্যাঁ!

প্রভাত- যা দরজাটা খুলে দে –

বন্যা - দরজা তো সারারাত খোলাই রয়েছে, পাল্লা দুটো শুধু ভেজানো,

দুম করে দরজা খুলে পাল্লা দুটো ধরে এসে দাঁড়ায় বিহু। অনিদ্রায় ধ্বস্ত অবিন্যস্ত চেহারা তার।

বিহু - এখনও আসেনি? (সবাই চুপ) তাহলে! আমার তো মনে হয় এবার সব জানিয়ে পুলিশকে একটা খবর –

প্রভাত - নো, নেভার, আমরা আমাদের কোন ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য নেওয়া অপছন্দ করি।

বিহু - কিন্তু –

প্রভাত - আমাদের কথাটা আমি বলে দিয়েছি। [বিহু চুপ করে তাকিয়ে থাকে প্রভাতের দিকে]

বন্যা - বিহু আমরাও তো যথেষ্ট উদ্বিগ্ন তবু আমরা আরও একটু দেখতে চাইছি। (কাছে টেনে) বসো, (বিহু বসে) সারা রাত ঘুমোওনি -?

বিহু - ঘুম!

বন্যা - সেই, বোকার মতো প্রশ্ন করছি,

বিহু - বিজন সেনের আর কোন ফোন আসেনি?

বন্যা - কি! কি বলছ তুমি!

বিহু - আর কোন ফোন আসেনি?

বন্যা - নাঃ। কি করে আসবে! যে ফোনটায় আসতে পারত সেটা তো সিদ্ধার্থ নিয়েই গেছে।

প্রভাত - তুই বন্যা একটা কমপ্লিট বোকার মতো কাজ করেছিস। নাম্বারটা তো তখনই নোট করে রাখবি!

বন্যা - হ্যাঁ, ঐটা বড় ভুল হয়ে গেছে। ফোনটা পাবার পর থেকে মাথাটা আর করছিল না।

বিহু - কেন নাম্বার পেলে কি করতে?

প্রভাত - তুমি নাম্বারটা নোট করে রেখেছ?

বিহু - হুঁ।

প্রভাত - ওয়েল ডান, দাও তো নাম্বারটা, একবার দেখি –

বিহু - এখন?

প্রভাত - হ্যাঁ, হোয়াই নট?

বিহু - সেখানে এখন অনেক রাত । আর, আমি সেখানে ফোন করেছিলাম।

বন্যা - (দারুণ চমকে) কি!!

প্রভাত - (চমকে ভীতু স্বরে) হোয়াট!!

বিহু - আস্তে। কিন্তু সেখান থেকেও তীর্থ কোথায় – তার উত্তর পেলাম না।

প্রভাত - তুমি ঐ নাম্বারে কাকে পেলে? কার সাথে কথা হল তোমার?

।। এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বিহু তাকায় স্থির চোখে যার সামনে প্রভাতবাবু গুটিয়ে যান।।

বন্যা - কে কথা বলল তোমার সঙ্গে বিহু?

বিহু - তুমি ঠিক বলেছ মা, ঠিকই শুনেছ তুমি, উনি বিজন সেন।

প্রভাত - কি কথা হল তার সঙ্গে?

বিহু - নাঃ। তীর্থ এখন কোথায় সে উত্তর উনি দিতে পারলেন না।

প্রভাত - না, সে ঠিক আছে কিন্তু তোমার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ, তাতে কি কথা হল?

বিহু - হল অনেক কথা, আরও অনেক কথা হবে – সে কথাও হল; কিন্তু এখন এই সকালে তীর্থ কোথায় আছে, কেমন আছে সেটাই তো সবচেয়ে বড় কথা তাই না?

প্রভাত - [উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও কথা চেপে যাওয়ার চেষ্টাটা বুঝে উঠে পড়েন, শরীরটা যেন একটু ঝুঁকে] তীর্থ এলে আমাকে ভেতরে একটা খবর – [মাথাটা একবার তুলে অন্যদের দেখে নিয়ে ভেতরে চলে যান]

[একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিহু তাকায় বন্যার চোখের দিকে]

বন্যা - চা খাবে?

বিহু - খাবো।

বন্যা - (ভেতরে যেতে পা বাড়িয়েও একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়েন) তুমি সব জেনে গেছ না?

বিহু - (এসে বন্যার গলা জড়িয়ে ধরে) জানাটা যে আমার বড্ড দরকার হয়ে পড়েছে মা!

বন্যা - মা!

বিহু - তুমি যে আমার বীর কর্ণের বড় দুঃখিনী মা, আমার!

বন্যা - (লজ্জায় চোখ বুজে) তীর্থও সব জেনে গেল! কি করবে এখন ও আমাকে! ক্ষমা না ঘেন্না?

বিহু - মহাভারতের কুন্তি মা কি কর্ণের চোখে খুব ঘৃণ্য চরিত্র ছিল এক?

বন্যা - বিহু ‘মহাভারত’ এক মহাকাব্য মাত্র, ইতিহাস নয়। সেখানে একটা কল্পযুগের রিপ্রেজেন্টেশন আছে, তার কোন পরম্পরা নেই এ যুগে। তীর্থ কোথায়?

বিহু - সঠিক জানি না। ওর মোবাইল সারারাত বন্ধই ছিল, এখনও তাই। শেষ রাতে একটা মেসেজ পাঠিয়ে আবার বন্ধ করে রেখেছে।

বন্যা - কি মেসেজ!

বিহু - সিম্পল, সকালে যত তাড়াতাড়ি পারি যেন এখানে পৌঁছে যাই, অপেক্ষা করি, ব্যস।

বন্যা - তবে যে তুমি এসেই পুলিশে খবর দেবার কথা বললে –

বিহু - স্যরি, ওটা জাস্ট একটা অ্যালার্জি টেস্ট বলতে পার!

বন্যা - ভয় দেখাচ্ছিলে? (মুখে হাসি নিয়ে বিহু চুপ) কাকে?

বিহু - তোমাকে নয়। এক সাহসী, অসম সাহসী মহাপুরুষকে।

বন্যা - পাপের কথা যখন সব জানতে পেরেছ, শাস্তিটাও দেখে যাও নিজের চোখে। তীর্থ আসুক–

বন্যা - পাপ! কোনটা পাপ মা! ভালবাসা? পরিস্থিতির বিচারে যদি কোন অন্যায় ঘটেই থাকে, এতদিন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করার পরও কি তা শাস্তির অপেক্ষায় থাকে!?

বন্যা - বিহু, বিজন তীর্থ – তীর্থ সম্পর্কে কি জানে? তীর্থর কথা ও কতখানি জানে?

বিহু - উনি সব জানেন। তীর্থ কোন পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে উনি জানেন, আমার পরিচয় জানেন, সবটাই জানেন। ইলাচি চায়ের প্রতি তোমার আজও অটুট দুর্বলতার কথা উনি জানেন। এখানকার সব আপডেট ওঁর মুখস্ত। ইভন্ তীর্থ যে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সেটাও – তোমার মোবাইলে উই শ্যাল ওভারকাম রিংটোনটা উনি অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন।

বন্যা - অথচ আমরা! কিছুই জানিনা। ইভন্ সে যে – বিশ্বাসই করিনি কোনদিন! কি অদ্ভুত!

বিহু - [পরম মমতায় গায়ে হাত দিয়ে] চা খাওয়াবে না? সকালে চা খাইনি এখনও –

বন্যা - (গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে) খাওয়াব। তীর্থর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, চল চা–

[প্রভাত ট্রেতে চা সাজিয়ে নিয়ে ঢোকে]

প্রভাত - [ট্রে নামিয়ে একটা কাপ তুলে দেন বন্যাকে] এটা তোর – [বিহুকে চা এগিয়ে দিয়ে নিজে এক কাপ নেন] বিজনের সাথে তোমার কথার ডিটেইলস চাইছি না, শুধু বল বিজন এদেশে ফিরছে কবে?

বিহু - সম্ভবত কোনদিন না। এটা অবশ্য কারণ নয়, কিন্তু এটা সত্য, উনি শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী। ওঁর দু'খানা পা নেই।

বন্যা - কি! বিজন প্রতিবন্ধী! ওর দু'খানা পা নেই! তুমি দেখেছ?

বিহু - নাঃ। আমি দেখিনি, তীর্থ দেখেছে।

বন্যা - কবে?

বিহু - কাল।

প্রভাত - বাবা ছেলের পরিচয় করিয়ে দিল কে? সিদ্ধার্থ বসু?

বিহু - না। [ডোর বেল]

বন্যা - কে!! (উঠে পড়ে)

প্রভাত - বোস, এটা তীর্থ না,

বিহু - ওঃ হো সিঁড়ির দরজাটা খোলা ছিল বলে আসার সময় আমি তালাটা লাগিয়ে এসেছি, খুলে দিয়ে আসি - [প্রস্থান]

বন্যা - প্রভাত, তুই হঠাৎ সিদ্ধার্থর নাম করলি কেন? এর মধ্যে সিদ্ধার্থ –

প্রভাত - তোর স্বামী চাকরি করে বিজনের কোম্পানিতে।

বন্যা - কি!!

প্রভাত - সিদ্ধার্থবাবুর এই হঠাৎ করে আসা, ভুল করে মোবাইল ফেলে যাওয়া সঙ্গে ওঁর কোম্পানির নাম, সব মিলিয়ে একটা খচখচে হেঁয়ালি ঠেকছিল মনে কাল থেকে। এখন নেট ঘেঁটে, অঙ্ক কষে শেষপর্যন্ত হেঁয়ালিটা সল্ভ করা গেল।

বন্যা - স্টুয়ার্টসেন কোম্পানির মালিক বিজন!

প্রভাত - হ্যাঁ, কমরেড বিজন এখন স্টুয়ার্টসেন কোম্পানির আধখানা মালিক।

বন্যা - আমার বিশ্বাস হয় না –

প্রভাত - হবে। কোম্পানির নামটা ভাঙ, দু'জন মালিক – একজন পিটার স্টুয়ার্ট অন্যজন বিজন সেন। (ম্লান হেসে) হোয়াট আ আয়রনি! তোর ভরণপোষণের সব ভার নিয়ে বসে আছে বিজন। কমরেড তুমি সত্যিই গ্রেট।

[দরজা ঠেলে ঢোকে চিন্ময়, পেছনে বিহু]

বন্যা - চিন্ময় তুই!

প্রভাত - ওঃ তাহলে তুই!

চিন্ময় - হ্যাঁ বেড়াল নয়, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে আমি,

প্রভাত - কিন্তু এতদিন পর! এতটা সময় পার করে দিলি!

চিন্ময় - কমরেড সময় পেরিয়েছে ক্যালেন্ডারের পাতায়। কিন্তু পাতার পর পাতা পেরিয়ে ঠিক সময় তো এসেছে এখনই, এই তো সময়।

প্রভাত - তীর্থর জন্যে অপেক্ষা করছিলি এতদিন?

চিন্ময় - ক্যাপ্টেনের নির্দেশ ছিল তাই।

বন্যা - হ্যাঁ রে বিজন এখন প্রতিবন্ধী!?

চিন্ময় - এটা এখনকার ব্যাপার নয় রে বন্যা। সেদিনের পর থেকেই। হ্যাঁ দুটো কাঠের পায়ে হাঁটতে হয় ওকে। তবে মননে-মস্তিষ্কে একদম ফিট। আগের চেয়ে এখন আরও ধারালো, আরও শার্প ক্যাপ্টেন।

প্রভাত - বিজন তীর্থর ব্যাপারে সবই জানে? সবটাই!

চিন্ময় - নিখুঁতভাবে। তোদের সম্পর্কে সে আমার চেয়েও ভাল জানে, অনেক বেশি জানে।

- ক্ষণিক স্তব্ধতা নামে মঞ্চে –

বিহু - মা, রাত্তিরে একদম ঘুম হয়নি, আমি একটু স্নান করে নিই; আর স্নান করে আমি সবার জন্যে চা নিয়ে আসছি – (ভেতরে যায়)

প্রভাত - কি! বন্যা তোকে কি ডাকল? মা!

বন্যা - হ্যাঁ, আজ এসে থেকে তো ঐ ডাকেই ডাকছে।

চিন্ময় - তাই তো ডাকবে। ওঃ আরেকটা কথা, বিজন কিন্তু তোকে বারবার থ্যাঙ্কস্ জানিয়েছে।

প্রভাত - থ্যাঙ্কস্! কেন? তীর্থর জন্যে!

চিন্ময় - হ্যাঁ যেভাবে তুই তীর্থকে এতদিন –

প্রভাত - মানে! ‘এতদিন’ মানেটা কি! কি বলতে চাইছিস তুই?

চিন্ময় - কিছু না, শোন –

প্রভাত - শোন, তীর্থর দায়িত্ব সেদিন আমি নিজে চেয়ে নিয়েছি সেটা কারোর থ্যাঙ্কস্ পেতে নয়।

চিন্ময় - সে কথা কেউ বলছেও না। কিন্তু বুঝতে পারছি না আজ তুই অধিকার হারানোর ভয় পাচ্ছিস কেন?

প্রভাত - কিসের অধিকার? হুঁ! জন্ম দিলেই বাবা হওয়া যায় না,

চিন্ময় - যায়ও নি; কিন্তু লালন করেও আলটিমেটলি সে অধিকার পাওয়া যায় না।

প্রভাত- যায় যায় এক'শবার যায়; আর তীর্থ –

চিন্ময় - কি? কি তীর্থ? তীর্থ কি? কাকের বাসায় কোকিল বেড়ে ওঠে, সময় হলেই ফুড়ুৎ,

প্রভাত - সেটা মানুষের মধ্যে হলে বেইমানি। তীর্থকে আমি বেইমানি করতে শেখাইনি, তাই কিছু না জেনেও ওর মন বন্যাকে 'মা' ডাকতে চায়।

চিন্ময় - তুই একটা সেন্টিমেন্টাল ফুল,

প্রভাত - বাপ-ছেলে না হয়েও স্নেহ আর সম্মানের বলয়ে লিভ টুগেদার ক'রে তীর্থ-আমি কেউ অখুশি নই আমরা।

চিন্ময় - কিছু বলার নেই তোকে, কিছু বলতে গেলে এখনই হয়তো হেগেলের দর্শন আওড়াবি, নয়তো কান্টের উপদেশমালা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরবি!

বন্যা - তোরা এবার থামবি প্লিজ! সিদ্ধার্থ, নান্নি-মুন্নি, এদিকে তীর্থ, আমার কথাটা তোরা একবার ভেবে দেখেছিস, কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমি!

চিন্ময় - তোর কথা আমরা ভাবব কেন? বিজন আছে – বিজন ভাববে,

বন্যা - আঃ।

চিন্ময় - আর সিদ্ধার্থবাবু, তোর দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে খুব শক্ত জমি। ফুললি ট্রাস্টেবেল্,

বন্যা - সিদ্ধার্থ! আবারও সিদ্ধার্থ! [এই সময় ভেতরে বাথরুমে যথেচ্ছ জল পড়ে যাওয়ার শব্দ, বন্যা ডাকে] বিহু – (বিড়বিড় করে বলে) সারারাত জেগে এই সকালে এত জল ঢালছে! বিহু – নাঃ দাঁড়া তো – (ভেতরে যায়)

প্রভাত - তোর সাথে বিজনের যোগাযোগ হয়েছে কবে, কিভাবে?

চিন্ময় - (একগাল হেসে) বলছি বোস,

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি চিন্ময়ের মুখের ওপর স্থির রেখে প্রভাত বসে অন্যমনস্ক ভাবে। চিন্ময় বলতে শুরু করলে তার বক্তব্যের চলচ্চিত্ররূপ ফুটে ওঠে মঞ্চের পেছনে সাদা পর্দায়

চিন্ময় - পুরুলিয়া পর্বের বহুদিন পর, তীর্থ তখন ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠেছে, একদিন – না ভুল বললাম – দিনটা তখনও শুরু হয়নি, রাতশেষের সদ্য ভোরে সবে তখন এক কুসুম কুসুম আলো জানলার কাঁচে এসে ছড়িয়ে পড়েছে – আমি আর মল্লিকা খাটের ওপর অঘোরে ঘুমোচ্ছি, বেড সাইড টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল–

রূপায়িত চলচ্চিত্র

মঞ্চের আলো নিভে যায়, পর্দায় দেখা যায় টেলিফোন বাজছে, বাজছে আই.এস.ডি. রিংটোনে। চিন্ময় চোখ খোলে; টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে টেবিল ঘড়ি তুলে নিয়ে দেখে, টেলিফোন সেটের কলার আইডেন্টিফিকেশনে চোখ রাখে তারপর কিন্তু কিন্তু নিয়ে ফোন কেটে দেয়

মল্লিকা - (ঘুম জড়ানো গলায়) কে-এ?

চিন্ময় - আই.এস.ডি. কল, বাইরে থেকে আর কে ফোন করবে আমাদের! কেটে দিলাম –

মল্লিকা - আহা এই ভোর রাতে কেউ হয়তো খুব দরকারে কাউকে খুঁজছে, তাড়াহুড়োয় বেচারা রং নাম্বার ডায়াল করে বসে আছে –

চিন্ময় - হ্যাঁ-অ্যাঁ এত ভোরে ফোন এলে বড় ভয় করে – কি জানি কি দুঃসংবাদ কোথা থেকে –

মল্লিকা - আলোটা নিভিয়ে দাও – (পাশ ফিরে শোয়)

চিন্ময় আলো নেভাতে হাত বাড়ায়। টেলিফোন আবার বেজে ওঠে, শব্দে মল্লিকাও এপাশে ফেরে। কলার আইডেন্টিফিকেশনে চোখ রেখে চিন্ময় বলে

চিন্ময় - কি করি বল তো? সেম নাম্বার ফ্রম অ্যাব্রড

মল্লিকা - [শরীর আধখানা তুলে] ধরো, ধরে বলো এটা রং নাম্বার –

চিন্ময় - [কাঁপা কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে] হ্যালো! (অপরপ্রান্ত চুপ) হ্যালো?

(ফোনে শুধু কণ্ঠস্বর শোনা যায়, ক্যামেরায় বিজনকে ধরা নয়)

বিজন - নিজের গায়ে চিমটি কেটে দ্যাখ, স্বপ্ন দেখছিস না, ফোনটা সত্যিই বাজছিল–

চিন্ময় - (গলা কেঁপে যায়) কে! কে বলছেন?

বিজন - আমি বিজন রে –

(বিস্ফারিত চোখে উঠে বসে মল্লিকা, চিন্ময়ের কাঁধের কাছে মল্লিকা)

চিন্ময় - বিজন! কে বিজন!!

বিজন - কমরেড আমি ক্যাপ্টেন বলছি –

মল্লিকা - (অস্ফুটে) বিজন!!

বিজন - হ্যাঁ রে মল্লিকা আমি বিজন বলছি –

চিন্ময় - বিজন তুই! তুই –

বিজন - বেঁচে আছি, যদিও বহাল তবিয়তে না বলে কিছুটা বেহাল তবিয়তে বলাই ভাল, আমার নিজের দুটো পা নেই রে।

চিন্ময় - আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এখনও –

বিজন - কোনটা? বেঁচে আছি না আমার দুটো পা নেই?

চিন্ময় - হুঁ! মনে হচ্ছে স্বপ্ন সবটাই,

বিজন - হাঃ হাঃ মল্লিকার গালে একটা জোরসে চিমটি কাট, একখানা গুঁতো যা খাবি, ধাতস্থ হয়ে যাবি ঐ এক গুঁতোয়।

চিন্ময় - তুই কোথা থেকে বলছিস?

বিজন - অনেক দূর থেকে। পুঁজির পাঁজর আমেরিকার বোস্টন থেকে।

চিন্ময় - তুই ওখানে গেলি কি করে?

বিজন - সে এক লম্বা ইতিহাস, ডিটেইলসে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। খুব সংক্ষেপে বলতে ব্যাপারটা এইরকম – তোরা তো জানিস আমার জ্যাঠামশাই একজন খুব উঁচুদরের পলিটিক্যাল কানেকশনওয়ালা সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি; যদিও সে-সব পলিটিক্সের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের কোন যোগাযোগ ছিল না। তা তিনিই এক হাই-প্রোফাইল ইনভেস্টিগেশন করিয়ে দু'দিন পর আমার মৃতপ্রায় শরীরটাকে খুঁজে পেয়েছিলেন দুর্ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে। তারপর পরপর ঘটে গেছে আমাকে নিয়ে অনেকগুলো ঘটনা, যার অনেক কিছুই আমার কাছে এখনও বিবর্ণ বিবরণ মাত্র, নয়তো অজানা। যখন চেতনায় পুরোপুরি ফিরতে পারলাম, দেখলাম হাসপাতালের একটা কেবিনে ঠ্যাং দুটো খুইয়ে প্রাণে বেঁচে রয়েছি। জায়গাটার নাম শুনলাম বোস্টন।

চিন্ময় - বেশ, কিন্তু এতদিন পর এই রাতশেষে আমাকে ফোন করেছিস কেন, বল।

বিজন - কমরেড তোদের কাছে একটা হেল্প চাইব, করবি? মল্লিকার সাথে পরামর্শ করে নিয়ে উত্তর দিলেও চলবে –

চিন্ময় - যে কোনরকম হেল্প করতে পারি বলে যে বিশ্বাসটা আমাদের ওপর রেখেছিস তার অমর্যাদা হবে না, এখন বল কি তোর নির্দেশ।

বিজন - কি বলে যে তোদের –

চিন্ময় - উঁহু, ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা – শব্দগুলো বাদ দিয়ে নির্দেশবার্তা দে।

বিজন - বেশ, এখন থেকে তীর্থর সব আপডেট আমার চাই।

চিন্ময় - তীর্থ!!

বিজন - হ্যাঁ আমার সন্তান তীর্থ। প্রভাতের কাছে যে মানুষ হচ্ছে,

চিন্ময় - তাহলে তুই জানিস? সেদিন অ্যাক্সিডেন্টের আগেই তুই জেনেছিলি বন্যা প্রেগন্যান্ট!

বিজন - হ্যাঁ আগেরদিনই ব্যাপারটা জেনেছি, বন্যা খবরটা দিল। আমরা ঠিক করলাম কলকাতায় ফিরে রেজিস্ট্রি করে নেব। হাঃ! কিন্তু সেদিন বানের জল ঢুকে পড়ে সব পরিকল্পনাই তো ভেস্তে দিয়ে গেল,

চিন্ময় - হুঁ, আমরা জানতে পারলাম আরও দু'দিন পর। যখন চেষ্টা করেও তোকে খুঁজে পেলাম না আমরা, বন্যা বারবার সেন্সলেস হয়ে পড়ছে, খবরটা ডিজক্লোজ করল প্রভাত। ও আরও একদিন আগে জেনেছে ঐ দুর্ঘটনার রাতেই। আমরা অনেক চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম স্পট থেকে সরে পড়তে হবে তাড়াতাড়ি। বেশ কিছু দূরের একটা গ্রামে সবাই মিলে আত্মগোপন করলাম প্রশাসন আর মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই। গ্রামটাতে আমাদের সংগঠন ছিল মজবুত অবশ্য সেটা তোর জন্যেই। যাইহোক এটা আমরা করেছিলাম দুটো কারণে; এক মনে আশা যদি তুই ফিরে আসিস কোনভাবে আর দুই, পুলিশের ঝামেলায় যেন একজনও না পড়ি, বিশেষত বন্যা। আর এই অভিযানে মল্লিকার মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও কম্যান্ডার-ইন-চিফ নির্বাচন করলাম আমরা প্রভাতকে। তারপর –

বিজন - তারপরের সব ঘটনাই আমার আনুপূর্বিক জানা। [সামান্য আবেগে] চিন্ময়, পাহাড়ের কোলে সে মিশনটা ছিল আমাদের পলিটিক্যাল, পরিস্থিতির প্যাঁচে পরে সব ওলট-পালট হয়ে গেলেও মিশনটাকে কতখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলি সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু সেদিন তোরা সবাই মিলে মনুষ্যত্বকে যে উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে পেরেছিস তার জন্যে সত্যি কোন ধন্যবাদ বা প্রশংসাই যথেষ্ট নয়, আমার কৃতজ্ঞতারও শেষ নেই। আর অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েও প্রভাতের কাছে আমি আজীবন মনুষ্যত্বে বামন হয়েই রয়ে যাব রে।

চিন্ময় - আচ্ছা, অতদূরে বসেও সব খবরই যখন পাচ্ছিস, রাখছিস তখন নতুন করে আবার আমাকে মল্লিকাকে তোর ইনফর্মেশন সাপ্লাই এজেন্সিতে টানছিস কেন?

বিজন - মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তোদের খারাপ লাগছে, জড়াতে চাইছিস না – ঠিক আছে, আমি আশা করছি মানেই তো একভাবে নিরাশ করার সবটুকু অধিকার রইল তোদের হাতে।

চিন্ময় - এত ইমোশনাল, সেন্টিমেন্টাল হওয়াটা তোকে মানায় না ক্যাপ্টেন, আমি শুধু বুঝতে চাইছি এতদিন পর তোর অসুবিধের কারণটা কি ঘটল?

বিজন - কারণ সোর্স-লিঙ্কটা আমার হঠাৎ করেই কেটে গেছে। এখন তোরা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

চিন্ময় - এও মাথার ওপর দিয়ে গেল –

বিজন - জ্যাঠামশাই আমাকে খুব ভালবাসতেন, গত শুক্রবার কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছিস এক্স চিফ জাস্টিস দিব্যেন্দু সেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে –

চিন্ময় - হ্যাঁ, হ্যাঁ তোর জ্যাঠামশাই প্রয়াত হয়েছেন, এখানকার সব কাগজেই খবরটা বেরিয়েছে। ঐদিন আমি প্রভাতের বাড়ি গিয়েছিলাম – প্রভাতও দেখেছে খবরটা।

আচ্ছা একটা কথা বল তো, তুই আমাদের কাছে হেল্প না চেয়ে প্রভাতকে ফোন করতে তো পারতিস, ঐ তো ক্লিয়ার আপডেট দেওয়ার পক্ষে সবচেয়ে যোগ্য হতো!

বিজন - না, আমি চাইনা প্রভাত-তীর্থ-বন্যা এরা এখনই সব জেনে যাক। ইভন্ আমার বেঁচে থাকার খবরটাও আপাতত গোপনই থাক ওদের কাছে। সময় হোক সবাই সবটা জানবে। এখনও সে সময় হয়নি।

[মল্লিকা চিন্ময়ের কাছ থেকে রিসিভার নিয়ে]

মল্লিকা - বিজন তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বিজন - হ্যাঁ বল মল্লিকা – কি বলবি! আমার অনুরোধটা রাখা সম্ভব হচ্ছে না!

মল্লিকা - না না সে কথা নয় –

বিজন - তা হলে!

মল্লিকা - বিজন তোর একটা অনুরোধও আমাদের কাছে ছিল নির্দেশ, কিন্তু আজ এমন সেন্টিমেন্ট দিয়ে তুই – একটা অন্য কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম কিন্তু –

বিজন - ঠিক আছে বল কি বলবি –

মল্লিকা - না থাক, আমার কথা সব কেমন ঘেঁটে যাচ্ছে, নে চিন্ময়ের সাথে কথা বল–

চিন্ময় - বলছি তোর যখন সেদিনের কথা আগে পরে সব মনে আছে জানা আছে, নিশ্চয়ই তোর একথাও মনে আছে – প্রভাত আর তুই বসেছিলি পাশাপাশি, যখন তুই জলের ধাক্কায় মাটি ধ্বসে পড়ে গেলি প্রভাত হাতটা বাড়িয়ে দিলেই তোকে ধরে ফেলতে পারত, বাঁচাতে পারত, অন্তত একটা চেষ্টা করতে পারত; কিন্তু সেদিন সে সেটা করল না। তোর বাড়ানো হাতটা ধরল না। এটা ক্রাইম নয়? পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকেও তো এটা চরম গদ্দারি!

বিজন - একথাটা তোরা কি করে জানলি! তোরা তো সে সময় ছিলিই না সেখানে! বন্যাও না,

চিন্ময় - না সে সময়টাতে আমি আর মল্লিকা বনের আরও গভীরে ঢুকেছিলাম পাখির ছবি তুলতে। কিন্তু সেই দুর্ঘটনার মুহূর্তে আমার ক্যামেরার চোখ পড়েছিল তোদের ওপর। তুই কমরেড বলে হাতটা বাড়িয়ে দিলি,প্রভাত হাত বাড়ালো না। পর মুহূর্তে আরও একটা বড় ঢেউ এসে তোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল নদীর দুরন্ত স্রোতে। তুই ভেসে গেলি, হারিয়ে গেলি তুই, ছবিটা কিন্তু ক্যামেরায় বন্দি হয়ে গেল।

বিজন - হাঃ হাঃ তোরা আমাকে সেন্টিমেন্টাল বলছিলি! নিজেরা তো দুজন একটা চূড়ান্ত ফুলিশ সেন্টিমেন্ট বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিস।

চিন্ময় - তাই!

বিজন - হাঃ হাঃ ছবিটা এখনও থাকলে নষ্ট করে ফেল। হারিয়ে আবার ফিরেই তো এসেছি। আর প্রভাতকে নিয়ে মনে কোন বিদ্বেষ রাখিস না চিন্ময়। দেখ, প্রভাত সেদিন যেটা করেছিল সেটা হয়তো সঙ্গত নয়, কিন্তু স্বাভাবিক।

চিন্ময় - স্বাভাবিক!!

বিজন - খুব স্বাভাবিক। দেখ, একই রাজনৈতিক ইডিওলজিতে আমরা সহমত ছিলাম, আবার 'হামপাঁচ'-এর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের একটা কেমিস্ট্রিও তো কাজ করতো! কি ছিল সেটা - না, মল্লিকা ভালবাসত প্রভাতকে, তুই ভালবাসতিস মল্লিকাকে। প্রভাতের নীরব ভালবাসা ছিল বন্যার প্রতি, উচ্ছ্বল বন্যা ভালবাসত আমাকে – আর, প্রভাত যে সেটা জানত না তা নয়, কিন্তু হিউম্যান বিয়িং – গভীর গাম্ভীর্যের আড়ালে তারও মনে এক জেলাসি জন্মেছিল খুব স্বাভাবিকভাবে; আর তাই প্রভাত যেটা করেছিল বা তোর মতে করেনি দুটোই তো ছিল স্বাভাবিক। পরিণতিটা কি হতে পারে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না সেই মুহূর্তে। কিন্তু তারপর?!

চিন্ময় - হুঁ!

বিজন - তবে! তোরা সবাই মিলে মিডিয়া আর প্রশাসনের অগোচরে অতদিন ধরে ঐ গহীন জঙ্গলে আত্মগোপন করে রইলি নিদারুণ অভাব আর কষ্টের সঙ্গে যুঝে, এত টাফ আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউন লাইফের আর ক'টা নিদর্শন আছে! (হেসে) অবশ্য এতটা তোরা পারতিস না অলক্ষ্য থেকে জ্যাঠামশাই যদি না তোদের হেল্প করতেন!

চিন্ময় - তাই নাকি! আমরা অদৃশ্য একটা শক্তির গোপন সাহায্য অনুভব করতাম। ভাবতাম হয়তো সেটা কোন কমরেডই গোপনে থেকে – এমনকি আমরা সন্দেহের তালিকায় প্রথম প্রথম তোকেও –

বিজন - হাঃ হাঃ না, জ্যাঠামশাই, জাস্টিস পরে চিফ জাস্টিস দিব্যেন্দু সেন। তীর্থর জন্ম হল ঐ জঙ্গল ঘেরা গ্রামেই; এরপর তো প্রভাত পারত বন্যাকে প্রোপোজ করতে, ওকে নিজের করে নিতে, কিন্তু ইট'স্ প্রভাত, ও তা করল না। তোদের সবার সঙ্গে আলোচনা করে একটা মাস্টার প্ল্যান বানালো, বন্যার গায়ে কোন কলঙ্ক লাগতে দিল না। এক রোমহর্ষক গল্প বানিয়ে বন্যাকে তার বাবা-মার হাতে তুলে দিল। তোরা ওকে পাঠিয়ে দিলি কানপুর, যেখান থেকে এসে বন্যা কলকাতায় পড়াশুনা করতো একটা মেসে থেকে। কি তাই তো?

চিন্ময় - তুই এত ডিটেইলস জানলি, অথচ –

বিজন - এরপর সদ্যজাত শিশুকে পাহাড়ের কোল থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে এই পরিচয় দিয়ে প্রভাত তীর্থকে নিয়ে ফিরল কলকাতায়। প্রিম্যাচিওরড্ ডেলিভারি, অপুষ্ট শিশু, তাকে সুস্থ করে বাঁচিয়ে তুলতে চারটে বছর প্রভাত লড়াই করেছে নিজের দিনরাত এক করে। তীর্থ সুস্থ হয়ে উঠল কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তার এডুকেশন শুরু করতে দেরি হয়ে গেল আরও দু'টো বছর। তীর্থকে নিয়ে প্রভাতের লড়াইটা ছিল একার। তোরা সেসময় প্রভাতের সম্পর্কে একরাশ বিদ্বেষ নিয়ে নিজেদের সরিয়ে রাখলি। চিন্ময়, তুই আর মল্লিকা এরপর কিছুদিন বাদেই বিয়ে

করে নিলি, কলকাতায় থেকেও প্রভাতকে না জানিয়ে। প্রভাত কিন্তু বন্যাকে আজও সত্যি ভালবাসে, ভালবাসাকে কোনওরকম অসম্মান না করেই। কি চিন্ময়, এরকম একজনকে গদ্দার বলা যায়?

চিন্ময় - বিজন তুই –

বিজন - আর একটা কথা, যে কারণে অবন্ধুসুলভ আচরণের জন্য তোরা ওকে দুষ্ট করিস সেই একই কারণে প্রভাতের নিজের মনেও যথেষ্ট অনুতাপ আছে, নিশ্চয় আছে; ওর দর্শন ওকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে হয়তো, তাই তো তীর্থ-লালনের গুরু শাস্তি ওর নিজের চেয়ে নেওয়া। কিন্তু মজাটা কি জানিস, শাস্তিটা যে কবে থেকে একটু একটু করে ওর মনে প্রশান্তি এনে দিতে শুরু করেছে সেটা ও নিজে টের পায়নি। ভেবে দেখ প্রথমে একজন ধাত্রীমায়ের মতো, পরে আপন সন্তানের মত স্নেহ মমতা দিয়েই তীর্থকে মানুষ করছে না! আবার বন্যাকেও সে তীর্থসুখ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখেনি। বন্যা তো মাঝে মাঝেই আসে কলকাতায়। হ্যাটস অফ টু প্রভাত, মাই কমরেড।

চিন্ময় - বন্যা যে বিয়ে করেছে, ওর দু'টি সন্তান –

বিজন - নান্নি-মুন্নি। জানি, টুইন বেবি

চিন্ময় - এটা নিয়ে তোর কিছু বলার নেই?

বিজন - বলা মানে আপত্তি বা খারাপ লাগার কথা বলছিস? তা কেন, ও তো ঠিক কাজ করেছে, নর্মাল লাইফে ফিরে না গেলে বরং সব কিছু ওলট পালট হয়ে যেতো, তোদের একসাথে সবার বিপদ ঘনিয়ে আসত। কমরেড, ভাল-মন্দের হিসেব নিকেশে হৃদয়ের কাছে হাত পাতলে আবেগ এসে ভুল করিয়ে দিতে পারে, মগজের কাছে প্রশ্ন পাঠাও; ঠিক সিগন্যাল পেয়ে যাবে নির্ভুল হিসেবে।

চিন্ময় - বন্যার খবরও পাস ঠিকঠাক মতো?

বিজন - না সবসময় এই আপডেটটা ঠিক থাকছে না। তবে এবার একটা ব্যবস্থা মনে হচ্ছে করে ফেলতে পারব। যাক সেটা আরও ক'দিন পরে হলেও ক্ষতি নেই। এখন তীর্থর ব্যাপারে তোরা যদি আমায় আশ্বস্ত করিস –

চিন্ময় - কমরেড তোমার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি আজও কি ভীষণ অটুট, আমরা বিস্মিত। চিন্তা করিস না, বহুদিন পর দু'দিন আগেই প্রভাতের বাড়ি গিয়েছিলাম, তীর্থ এইট থেকে নাইনে উঠেছে ফার্স্ট হয়ে।

বিজন - আবারও টুপি খুলে অভিবাদন জানাই প্রভাতকে। বয়সে দু'বছর নষ্ট হয়ে গেলেও তীর্থর আই.কিউ. নষ্ট হতে দেয়নি একবিন্দু। মন্দের ভাল। এই বয়সে তীর্থর মাধ্যমিক হয়ে যেত।

চিন্ময় - এখানে দুটো খবর তোকে দিই, যার একটা আমার কাছে বিশেষভাবে অদ্ভুত, আর একটা হয়তো তোরও ভাল লাগবে না।

বিজন - যেমন?

চিন্ময় - প্রভাত ওর প্রোফেসারি চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছে এই বছরই, নাইন থেকে তীর্থকে আরও সময় দিতে হবে, সেই জন্যে। এটা অদ্ভুত না?

বিজন - আর অন্যটা?

চিন্ময় - হ্যাঁ জানিস তীর্থটা যথেষ্ট ব্রিলিয়ান্ট হয়েছে ঠিকই তবে ওর বিহেভিয়ারের মধ্যে কোথাও যেন একটা অসঙ্গতি, একটু চাপা স্বভাবের, এটা সবসময় নয় তবে মাঝে মাঝে এই লক্ষণটা কিন্তু দেখা যায়। জানি না প্রভাত এটা নিয়ে কিছু ভাবে কিনা!

বিজন - হাঃ চিন্ময়! তোর কাছে অদ্ভুত আর অসঙ্গত লাগলেও আমার কাছে দুটো ঘটনাই জলের মতো পরিষ্কার। তোকে দ্বিতীয় বিষয়টা আগে ক্লিয়ার করি, তীর্থর জন্ম পাহাড়ের কোলে এক জঙ্গলে। ওর চরিত্রের মধ্যে জঙ্গলের রহস্যময়তা থাকাটা কিছু

অস্বাভাবিক নয়। আর তোর প্রথম বিস্ময়ের উত্তরে বলি – এই হচ্ছে প্রভাত। এই হচ্ছে ডেডিকেশন! মমত্ত্বের সাথে কি গভীর দায়িত্ববোধ বল তো! রিয়েলি ওকে যত জানছি ততই – যাক গে, তাহলে তোরা কি কথা দিচ্ছিস আমায়?

চিন্ময় - এরপরেও জিজ্ঞেস করছ কমরেড! তবে একটা কথা বড় জানতে ইচ্ছে করছে, বলবি?

বিজন - যদিও টেলিফোন কোম্পানি লাইন কেটে দেওয়ার সিগন্যাল দিচ্ছে, তবু তাড়াতাড়ি বল, জানা থাকলে উত্তর দিয়ে দিই।

চিন্ময় - তুই এখন ঐ ধনী রাষ্ট্রের মিনারে বসে কি করিস?

বিজন - হাঃ হাঃ সেসব শুনলে শালা খিস্তি করবি আমায়। আজ রাখছি রে, প্রশ্ন এড়াচ্ছি না, দু'দিন পরেই আবার ফোন করব। চিন্ময় জীবন দিয়ে বুঝেছি রে বিপ্লবকে সশস্ত্র করে তুলতে গেলে, কোরাপশনে দীর্ণ ভারতবর্ষে আন্দোলনকে শক্ত পায়ে দাঁড় করাতে হলেও আগে স-অর্থ হতে হবে। ভাবনাটা প্রতিক্রিয়াশীল বলে উড়িয়ে দিস না রে শালা। (হাসতে হাসতে) কিরে এরপর ফোন করলে কথা বলবি তো?

চিন্ময় - ভাগ শালা – [বিজনের হাসি উঠেই হঠাৎ ফোনটা কেটে যায়]

[পর্দা অন্ধকার করে মঞ্চে আলো ফেরে]

[সবকিছু বলে চিন্ময় তাকিয়ে থাকে প্রভাতের দিকে তার প্রতিক্রিয়া বুঝতে]

প্রভাত - বিজন আমাদের সবকিছু জানে, সব খবর রাখে অথচ বিজন বেঁচে আছে আমরা সে খবরটুকুও জানতাম না। কি অদ্ভুত না!!

।। বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ।।

সিদ্ধার্থ - 'দেয়ার আর মোর থিংগস্ ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ, দ্যান আর ড্রিমট্ অফ' – হোরাশিও

প্রভাত - সত্যিই তাই, কত না স্বপ্নাতীত বিস্ময়ের বাস এ বিশ্বভূমি! শেক্সপিয়রের এই বলে-যাওয়া সার সত্যটা আমরা মনে রাখতে পারি না, বিচলিত হই বারবার।

চিন্ময় - কি ব্যাপার সিদ্ধার্থবাবু ফিরে গিয়ে ফিরে এলেন! কোম্পানির নতুন কোন জোয়াল চাপল ঘাড়ে

সিদ্ধার্থ - নাঃ আজ শুধু নিজের জন্য আসা, কোন হুকুম তামিলের তাড়া নেই আজ।

চিন্ময় - বেশ একটু বসুন, বন্যা ভেতরে আছে, আসছে। আমরা একটু কথা বলে নিই।

সিদ্ধার্থ - বলুন বলুন –

চিন্ময় - তো বুঝলি তারপর থেকে অর্থাৎ তীর্থ ক্লাস এইট থেকে নাইনে ওঠার পর থেকেই নিয়মিত যোগাযোগ কথাবার্তা চলত আমাদের, বিজনের সঙ্গে

প্রভাত - আর তখন থেকেই জাসুসি শুরু করে দিলি –

চিন্ময় - বলতে পারিস, তবে ওর সাথে লাস্ট কথা হয়েছে গতকাল। স্কাইপ্-এ ওর সাথে মুখোমুখি কথা হয়েছে তীর্থর। সিদ্ধার্থবাবুও কথা বললেন ওঁর সুপ্রিম বসের সঙ্গে। আমি একটা ব্যাপারে অবাক হলাম প্রভাত, তীর্থ কিন্তু পাল্টা কোন প্রশ্ন করল না, শুধু শুনে গেল যেন সবটাই ওর জানা।

প্রভাত - এবং বিশ্বাসও করে গেল অপ্রশ্নে!

চিন্ময় - একদম, আমি মল্লিকা বেশ অবাকই হয়েছি।

প্রভাত - অবাক হওয়ার সত্যিই কি কিছু আছে! তীর্থর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়েছিস?

চিন্ময় - ভাল করে তাকানোরও কিছু নেই, একঝলক তাকালেই ওর মুখে বিজনের মুখ দেখা যায়।

প্রভাত - তবে! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব সরব হলে বিস্ময়ের কোন ঘোর তো থাকে না বরং বিশ্বাসের জোরটাই খুঁজে পাওয়া যায়। (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) ভাল, তো সিদ্ধার্থবাবু আপনি নিশ্চয়ই অবাক হননি নতুন করে, [সিদ্ধার্থর মুখে ম্লান হাসি] এখন! সব শুনে জেনে খুব ঘেন্না হচ্ছে তো এখন?

সিদ্ধার্থ - কার ওপর?

প্রভাত - এই আমার ওপর, নিজের স্ত্রীর ওপর,

সিদ্ধার্থ - ব্যস? তাহলে তো তালিকাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, নিজেকেই বা বাদ দিই কি করে এই তালিকা থেকে? না কোন ঘেন্নাটেন্না আমার আসে না। আপনাদের রাজনীতি বা রাজনৈতিক আদর্শ আমি তার কেউ নই, কোনদিন ছিলামও না। কিন্তু ভুল হোক, ঠিক হোক এই যে আদর্শ-তত্ত্বর প্রতি আপনাদের ডেডিকেশন, তাকে ধরে থাকার যে স্পিরিট, তাকে আমি শ্রদ্ধাই করি।

প্রভাত - কিন্তু –

সিদ্ধার্থ - হ্যাঁ, বলতে পারেন আমার সঙ্গে তো একধরণের প্রতারণা করা হয়েছে, সেটাই বা জড়ভরতের মতো আমি মেনে নিচ্ছি কি করে! দশ বছর আগে হলে হয়তো আমার মনেও এ প্রশ্ন জাগত কিন্তু আমার যাপিত জীবনের দিকে তাকিয়ে বলছি – না, বন্যা তো আমার সঙ্গে কোন প্রতারণা করেনি। বন্যার কাছ থেকে আমি ভালবাসা পেয়েছি, সুখ পেয়েছি, সখ্য পেয়েছি, নান্নি-মুন্নি পেয়েছি। আর কি চাই! প্রভাতবাবু আমার ছোট্টবেলাটা কেটেছে এক অরফ্যানেজে, সেই অনাথ আশ্রমের প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন একজন প্রচারবিমুখ মানুষ, নাম শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দু সেন, অ্যান এক্স চিফ জাস্টিস

চিন্ময় ও প্রভাত - হোয়াট!

সিদ্ধার্থ - সেই মহাপুরুষের নেকনজরে পড়েছিলাম বলেই আমার শিক্ষা-উচ্চশিক্ষা-বিদেশে গিয়ে পড়াশুনো সবই তাঁর বদান্যতায়। জীবিকার বাইরে স্যরের একটা প্রিয় সখ ছিল জ্যোতিষ চর্চা, বিশেষত হরোস্কোপ স্টাডি ছিল ওঁর প্রিয় সাবজেক্ট। তখন সবে বিদেশ থেকে ফিরে এখানে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছি, উনি একদিন ডেকে বললেন – সিদ্ধার্থ একটি মেয়ের হরোস্কোপ স্টাডি করে দেখলাম বেশ মজার জানো, আমার মন বলছে তাকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে। আরও বললেন – এক্ষেত্রে আমি কিন্তু সরাসরি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না, ঘটকালিটাও তোমায় নিজেকেই করতে হবে। একটা ঠিকানা ধরিয়ে দিলেন হাতে। স্যরের প্রস্তাব নিয়ে কানপুর যাওয়া, তারপর ছত্রিশদিনের মাথায় বিয়েটা সেরে ফেলা। সবরকম সাহায্য করলেন নেপথ্যে থেকে। অনুষ্ঠানে নিজে রইলেন উহ্য।

চিন্ময় - এক্সেলেন্ট! বন্যার অতীত সম্পর্কে জানতে চাননি কোনদিন?

সিদ্ধার্থ - না।

চিন্ময় - বিয়ের পরেও না?

সিদ্ধার্থ - কোনদিনই না। নিজের অতীত কিছু গোপন করিনি, বন্যও ওর অতীত সম্পর্কে যা বলেছে, তার বাইরে অহেতুক কৌতূহলে সিঁদ কাটতে যাইনি। সুখী হওয়ার এ মন্ত্র শিখেছি আমার জীবন সংগ্রাম থেকে। (আবেগঘন মুহূর্ত-স্তব্ধতা) ফলে বুঝতেই পারছেন যার জীবন আলেখ্য এমন, তার চাওয়া পাওয়ার অঙ্কটাও খুব ছোট্ট-সরল, তাড়াতাড়ি মিলে যায়, মিলিয়ে নিতে কোন অসুবিধে হয়না।

প্রভাত - আজ কি এসেছেন বন্যাকে নিয়ে যাবেন বলে?

সিদ্ধার্থ - হ্যাঁ, সব হারিয়েও যাতে নিজেকে নিঃস্ব ভাবতে না হয়, তার পাশে থাকতে এসেছি।

- মঞ্চে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধতা নামে -

চিন্ময় - কিরে সবাই তো একখানা করে লাইফ বোট পেয়ে গেল, সামনের মহাশূণ্যে তুই ভাসবি কোন ভেলায়?

প্রভাত - (হঠাৎ কঠিন স্বরে) তীর্থ কোথায়? কখন আসবে সে?

চিন্ময় - কাছি কেটে সে পানসি তোর ভেসে গেছে ভাঁটির টানে। [প্রভাত কঠিন চোখে তাকায়] তীর্থ গেছে অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে ওর ঝিম নিঝুম জন্মগ্রামটাকে একবার দেখে আসতে। হয়তো সত্যাসত্য নিজের চোখে চেখে দেখতে গেল–

প্রভাত - গেল! আমাকে না বলে!

চিন্ময় - তীর্থ ওর বাবাকে বলে গেছে।

প্রভাত - [উর্দ্ধশূণ্যে তাকিয়ে] বাঃ কমরেড, তুমি অনুমতি দিলে! উত্তরসূরি নির্বাচন করে ফেললে! অথচ তীর্থর ওপর কতখানি অধিকার তোমার সে প্রশ্নের মুখোমুখি হলে না তো একবার! [বাইরে ট্যাক্সির হর্ণ]

সিদ্ধার্থ - ওঃ হো ভুলে গিয়েছিলাম ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়েই রেখে এসেছি, ছেড়ে দিয়ে আসি –

চিন্ময় - ট্যাক্সি!

সিদ্ধার্থ - হ্যাঁ, নিজের কাজে এসেছি, অফিসের গাড়ি পাব কোথায়? আসছি ছেড়ে – [প্রস্থান]

চিন্ময় - প্রভাত, বন্ধু হিসেবে বলছি – কমরেড অধিকারের প্রশ্ন তুলে নিজেকে বিব্রত করিস না। [বন্যা আসে]

বন্যা - প্রভাত – ওঃ চিন্ময় আছিস এখনও! একটা ডাক্তার ডেকে আন্‌-না রে, বিন্থটার খুব জ্বর।

চিন্ময় - ওঃ তোরা পারিসও, জ্বর এসেছে ডাক্তার না ডেকে একটা ট্যাক্সি ডাক, তুলে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দে

বন্যা - নাঃ সেটা এখনই সম্ভব নয় –

চিন্ময় - কেন খুব জ্বর?

বন্যা - হুঁ

চিন্ময় - হবেই তো এই সিজন চেঞ্জের সময় সাতসকালে গায়ে জল ঢালার ধুম কি!

বন্যা - বাজে বকিস না তো, ও গায়ে জল ঢালেনি,

প্রভাত - যাকগে, এখন এ নিয়ে ঝগড়া না করে, চিন্ময় দেখ – সিদ্ধার্থবাবু অলরেডি ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন কিনা, ওটা পেলে ডাঃ বর্মণকে একবার ধরে এনে একটা চেক-আপ করিয়ে নিতে হবে।

চিন্ময় - যত্তসব উটকো ঝামেলা কেন আগ বাড়িয়ে কাঁধে নিস! দাঁড়া দেখছি, তবে বর্মণ ডাক্তারকে কল দিয়ে আমি এবার বাড়ি যাবো, মল্লিকা সেখানে ছটফট করছে –

[প্রস্থান]

বনায় - সিদ্ধার্থ এসেছে?

প্রভাত - হ্যাঁ, তোকে নিয়ে যেতে এসেছে।

বন্যা - কোথায় নিয়ে যাবে?

প্রভাত - নিশ্চয়ই তোর আপন কুলায় । [ভেতর দিকে যেতে পা বাড়ায়]

বন্যা - এ কি আমাকে একা ওর মুখোমুখি রেখে তুই কোথায় যাচ্ছিস?

প্রভাত - দেখি ও'ঘরে অ্যাকোনাইট থার্টি আছে, আধঘণ্টা অন্তর দুফোঁটা করে দিতে থাকি, সিজন চেঞ্জের জ্বর,

বন্যা - বিহুর ব্যাপারটা কিন্তু আমার বিশেষ সুবিধের লাগছে না প্রভাত –

প্রভাত - কেন, জ্বর ছাড়া আর কি কি লক্ষণ দেখছিস?

বন্যা - হুঁ! বিহু বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে।

প্রভাত - বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে মানে? কোথায় এসেছে? কার কাছে এসেছে?

বন্যা - এসেছে তীর্থর ভরসায়, কিন্তু একটু আগে তীর্থর মেসেজ পেয়ে ও আরও অসুস্থ বোধ করছে।

প্রভাত - কি মেসেজ করেছে তীর্থ!

বন্যা - লিখেছে ও যেন এখানে আর অপেক্ষা না করে বাড়ি চলে যায়, নিজে কবে ফিরবে সেসব কিছু খবর নেই। মেসেজটা পেয়ে ও আরও ফ্যাকাশে মেরে গেছে, জ্বরটাও বেড়েছে। কাল রাত্তির থেকেই বেশ ক'বার বমি করেছে,

প্রভাত - রাত্রে ঘুম হয়নি, দুশ্চিন্তা, তারপর হয়তো রাত্রে উল্টোপাল্টা কিছু খেয়েছে, অ্যাসিড হয়ে গেছে –

বন্যা - দাঁড়া যাসনি। প্রভাত, আমি কিন্তু অন্য কিছু ভাবছি, বিহু কনসিভ করেছে,

প্রভাত - কি! কে!

বন্যা - তীর্থ।

প্রভাত - তীর্থ! আমার তীর্থ!

বন্যা - তীর্থ, বিজনের তীর্থ। বিজনের মতোই ব্রিলিয়ান্ট, বিজনের মতোই বেপরোয়া। [ভেতর থেকে বমি করা এবং প্রচুর জল পড়ার শব্দ] ঐ-ঐ আবার বমি করছে – [ভেতরে যেতে পা বাড়ায়]

প্রভাত - তুই দাঁড়া, আমি দেখছি। হোমিওপ্যাথিতে এরকম ক্ষেত্রে - দেখতে হবে বাক্সে, কি ওষুধ দেওয়া যায় এসময়, তুই এখানেই থাক – ওরা আবার বাইরে গিয়ে এত দেরি – [প্রভাত ভেতরে যায়, ভেতরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় বন্যা, কয়েক মুহূর্ত পরে দৃষ্টি ঘোরাতেই দেখে বাইরের দরজায় সিদ্ধার্থ]

বন্যা - তুমি!

সিদ্ধার্থ - হুঁ, আশা করনি, একেবারেই আশা করনি?

বন্যা - তা নয়, রাত্রে ফিরেই আবার সকালে – [একটা চেয়ারে বসে] যা বলার বল, শাস্তি দেবে তো – যা দেওয়ার দাও শাস্তি,

সিদ্ধার্থ - [কাছে এসে চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে] আরও শাস্তি চাও! তীর্থকে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে অনেক শাস্তিই তো পেলে বন্য, আরও? এবার একটু স্বস্তি নাও। (জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় বন্যা) চল, নান্নি-মুন্নিকে দেখতে যাবে না?

বন্যা - ওঃ (চমকে হাতের ঘড়ি দেখে)

সিদ্ধার্থ - সে ফ্লাইট তো অনেক আগেই বেঙ্গালুরু পৌঁছে গেছে, সম্ভবতঃ পাইলটের ইডলি-সম্বরে নাস্তাও হয়ে গেছে। (আবার চোখ তুলে দেখে সিদ্ধার্থর হাসিমুখ) হুঁ কিছু অর্থদন্ড গেল, যাক। আমি সন্ধ্যের ফ্লাইটে দুটো টিকিট বুক করে এলাম, যাবে না? [সঙ্কোচে বন্যার মুখে কথা সরে না, ইঙ্গিতে বলে যাবে] এবার চল নান্নি-মুন্নিকে পার্মানেন্টলি আমাদের নিজেদের কাছে রেখে নিজেদের মনের মতো করে মানুষ করি। না হলে কে আবার কবে এমন করে তোমাকে ব্যথা দিয়ে পালাবে!

বন্যা - সিদ্ধার্থ তুমি এমন করে বলছ কেন! আমি যখন যেখানেই থাকি বারবার দৌড়ে দৌড়ে আসিনি তীর্থর কাছে? নান্নি-মুন্নির কাছেও তো এতবার যাইনা, কর্তব্যে কি আমার খুব অবহেলা হয়েছে?

সিদ্ধার্থ - কর্তব্য! সন্তানের প্রতি মায়ের কর্তব্যের চেহারাটা ঠিক কেমন, আমার বুদ্ধিতে বা অভিজ্ঞতায় তার কোন স্বরূপ ফুটে ওঠে না বন্য, তাই এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই, তবে 'মা' ডাকার অধিকার-অনুমতি যে ওকে দাওনি – যাকগে। বন্য আমার মতো একজন অনাথই শুধু বুঝতে পারে মহাভারতে কুন্তীর ওপর কর্ণের অভিমান ছিল কত তীব্র!

বন্যা - তোমরা সবাই শুধু কর্ণ-কুন্তির উপাখ্যান দিয়েই বিচার কর, দুটো সময় কি এক!

সিদ্ধার্থ - নাই বা হল সময় এক, নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি তীব্র অভিমানে তীর্থর সরে সরে যাওয়া আর তাকে কাছে না পাওয়ায় তোমার মা-হৃদয়ের হাহাকার! কোনও অমিল তো দেখি না দুইয়ে –

বন্যা - (দু'চোখ ভরা জল নিয়ে) নান্নি-মুন্নিকে এনে দাও, ওদের এনে দাও আমার কাছে সিদ্ধার্থ। আমি আর, আর ওদের কাছছাড়া করে রাখব না। আমাকে একটিবার সুযোগ দাও সিদ্ধার্থ, আর একটিবার

[সিদ্ধার্থর বুকের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ে বন্যা]

সিদ্ধার্থ - কাঁদো কাঁদো, লুকিয়ে রাখা সব কান্না ঝরিয়ে দাও। এই অশ্রুস্নান তোমার বড় দরকার ছিল,

[ধীরে ধীরে আলো নেভে, দ্রুত ফিরে আসে আলো]

ফিরে আসা আলোয় এখন দেখা যায় প্রভাতবাবু ছোট ফ্রেমে বাঁধানো তীর্থর সেই এঘর থেকে সরিয়ে দেওয়া ছবিটা খুব যত্ন নিয়ে মুছতে মুছতে এঘরে আসেন। তখনও ছবি মুছতেই ব্যস্ত তিনি, ভেতর-দরজায় এসে দাঁড়ায় বিহু। ডাক দেয় বড় নম্রস্বরে

বিহু - বাবা –

প্রভাত - (পেছনে না তাকিয়েই উত্তর দেন, দিয়ে যান -) অ্যাঁ?

বিহু - আজ কি খাবে? কি রান্না করব?

প্রভাত - হ্যাঁ করনা – ঘরে কি আছে দেখ, তাই দিয়ে তাই দিয়ে বানিয়ে ফেল একটা কিছু –

বিহু - ঘরে তো আছে খানিকটা চিকেন, আর গুচ্ছের ক্যাপসিকাম।

প্রভাত - ব্যস ব্যস তাহলে তো হয়েই গেল, রেঁধে ফেল, বিহু মনে করে ওষুধটা খেয়েছিস?

বিহু - খেয়েছি।

প্রভাত - সাবধানে গ্যাস ধরাবি, ওরে কুকিং হল একটা আর্ট, সবাই এটা রপ্ত করতে পারে না বুঝলি! তোকে আমি একটু একটু করে সব শিখিয়ে দেব দাঁড়া –

বিহু - তাহলে ঐ করছি,

প্রভাত - হ্যাঁ হ্যাঁ রেঁধে ফেল – যা রাঁধবি, একদম লক্ষ্মীছেলের মতো খেয়ে নেব [তীর্থর ছবিটা টেবিলে রাখেন}

বিহু - তাহলে ঝুরঝুরে ভাত আর গরমগরম ক্যাপসি-চিকেন -

প্রভাত - হ্যাঁ! (ভীষণ চমকে গলা দিয়ে যেন এক আর্তনাদ ছিটকে বেরোয় ঐ 'হ্যাঁ' শব্দখানির সাথে, তারপর ডিলিরিয়ামের মতো করে আপন মনে কারও সাথে যেন কথা বলে যান) ক্যাপসি-চিকেন রাঁধবি! তাহলে ওর সঙ্গে ক'টা রুটি বানিয়ে ফেল না, চিকেনটা রুটির সঙ্গেই ভাল যায়

।। প্রভাতবাবুর কথা শেষ হয় না, অফ ভয়েসে ঝংকার দিয়ে ওঠে তীর্থর স্বর কথন।।

আহা রে! হাঁ করে দিল্লি বল! রুটি বানাতে গেলে আটা মাখোরে, লেচি কেটে কেটে সেগুলো গোল গোল করে বেলোরে, তারপর তা গরম গরম সেঁকে বুড়োকে খাওয়াও রে, মজা আর কি! তাছাড়া বুড়ো বয়সে এত নোলা ভাল না।

ভয়েস ওভারে তীর্থর কথা চলার মধ্যেই নিঃসঙ্গ এক বাঁশির সুর এসে মেশে, প্রভাতবাবু একটু একটু করে গুটিয়ে যেতে থাকেন। ঝাপসা চোখের সামনে হাতের ছবিটা তুলে ধরে এক হেরে যাওয়া মানুষের মতো করে বলেন –

প্রভাত - ঠিক বলেছিস তীর্থ আমার বড় লোভ রে, তাই তো বড় ভয় আমার; তোকে পিঠে করে মানুষ করেছি, সেই নিরাপদ পিঠ ছেড়ে তুই পা বাড়ালি রাজনীতির পাষাণ-পথে! দেখিস ভাই ও পথের নীরস অনাদর যেন তোকে মনে প্রাণে দেউলে করে না দেয়! আয় তীর্থ আয় গ্লোবিল খাবি! চুপ করে চুপটি করে দাঁড়া ওখানে।

বিহু - বাবা –

প্রভাত- হ্যাঁ

বিহু - কার সাথে কথা বলছ তুমি! কোথায় তীর্থ! কে তোমার কাছে গ্লোবিল খেতে হাত পেতে এসে দাঁড়াবে?

প্রভাত - ওঃ হ্যাঁ ওর তো এখন হাত জোড়া; ওর ছোট্ট কাঁধে এখন বড় স্বপ্নের পতাকা, উড়িয়ে দিতে চলেছে এক পাহাড়চুড়োয়! তবে সাবধান কমরেড আর কোন ধার করা তত্ত্বকে আদর্শ ভেবে নিয়ে লুকোচুরির রাজনীতি করো না। মাটির ঋণ শুধতে মানুষের চেয়ে বড় হাতিয়ার আর নেই, তাকে সাথে নিয়ে বুক চিতিয়ে চলাই রাজনীতি সেটাই তরুণের স্বপ্ন। রাজনীতি নিছক এক রোম্যান্টিসিজম নয় রে তীর্থ, একদিনের হারজিতে এর স্বপ্নদৌড় থেমে পড়ার নয়।

বিহু - তুমি আবারও! অসুস্থ হয়ে পড়বে তুমি – একদম ঘুমোচ্ছ না, শুধু –

প্রভাত - এই, তুমি কে?

বিহু - আমি বিহু,

প্রভাত - বিহু! বেশ নাম হল, পরিচয়?

বিহু - আজও চিনলে না আমাকে!

প্রভাত - অনুমতি না নিয়ে তুমি ভেতরে ঢুকলে কি করে!

বিহু - অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে না রেখে আজ তো নিজেই হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছ ভেতরে,

প্রভাত - হাত বাড়িয়ে দিয়েছি! দিতে পেরেছি?

বিহু - পেরেছ। একদিন যা পারনি তার জন্যে তো নিত্য যন্ত্রণায়, অনুশোচনায় আর প্রায়শ্চিত্তে কাটিয়ে দিলে জীবনের এতটা সময়, তবু –

প্রভাত - তবু তবু আমার এক বাহন-দশা রোগ, কেমন গাধা-গাধা ভাব, পিঠ থেকে ভার নেমে গেলে পিঠটা ভারী উসখুশ করে, (অবরুদ্ধ কান্না হঠাৎ করেই বুক ফেটে বেরিয়ে পড়ে) তবু জ্বালা তো আমার জুড়োয় নারে মা! মা রে একটু ঘুমোতে চাইরে মা, একটু ঘুম পাড়িয়ে দিবি-

বিহু - এস, আমার কাঁধে মাথাটা রাখো, ঘুমোও, বিশ্রাম কর। তীর্থ গড়ার কারিগর তুমি, ছোট্ট তীর্থ আসছে তাকে তো আবার গড়ে পিঠে নিতে হবে তোমায়, একটু বিশ্রাম করো –

বিহুর কথার মধ্যেই প্রভাত একদম গুটিসুটি পাকিয়ে পাশে বসে শুধু মাথাটা এলিয়ে দেয় বিহুর কাঁধে। শিশুর মতো ফুঁপিয়ে চলে প্রভাত, একটা ছোট্ট আলোয় ধরা ওদের দুটো মুখ। পেছনের পর্দায় পাহাড়ের কোলে কোন এক স্রোতস্বিনীর ধারে উপলখণ্ডে বসে থাকা তীর্থর এক স্থিরচিত্র। আবহে গান বাজে – জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই / কোথা হতে আসি.........

ধীরে পর্দা নামে

ইউনিকর্ন

অদিতি চক্রবর্তী

… … এইভাবে কত এলেবেলে, আঁটুবাঁটু সন্ধ্যা অদ্ভূত
বিষন্ন প্রশ্রয়ে মনমরা হয়ে যায়
ওইখানে হা হা করে নিমপাতা ঝরে
কৃষ্ণপিচপথে মরে পড়ে থাকে সমস্ত সুন্দরের ভুল
আমার কিছুই করার থাকে না
এমনকি জগতের সকল বিষাদ যেদিন জড়ো হয়ে তাকাল, সেদিনও!

… সেদিনও… !!
আমি শূন্যতা শিখে শিখে,
শূন্যতা শিখে শিখে নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করেছি
কবে যেন কত যুগ আগে অলৌকিক চরণলীলায় কেউ নাকি বলেছিল –
যেখানে মাটি অপত্যবৎসল
সেখানে মানুষ মাটিতে শুয়ে শুয়ে শুষে নেয় সঞ্জীবন।

নামহীনা

দুর্বার

তোমার খোলা পিঠে -
তোমার অবহেলিত চুলের আঁকি-বুঁকি,
ছবি এঁকে রেখেছে আমার আঙুল অসাবধানতায়।
হাওয়ায় ভেসে আসা
তোমার শরীরী গন্ধ
আমার জীর্ণ ফুসফুস ভরিয়ে তোলে।
তোমার শরীরের প্রতিটি বাঁকে
যৌনতার চোরাবালি,
ডুবে যাওয়ার তীব্র আহ্বান।
তোমার ঠোঁটের নেশা;
সেই হাসির মাদকতা
আমার নেশাতুর মন আশ্বাস খোঁজে।

তোমার চোখের পলকে... মুহূর্ত হারাই
তোমার বলা কথায় ... হারাই ভাষা।
তোমার অঙ্গুলি-হেলনে... যুক্তি হারাই,
আমার একলা পাওয়া-হারানোর
"নামহীন" ভালবাসা!

বিশ্বাস

সৌদীপ দেব

আলোটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে,
আর এক এক করে ফুটে উঠছে সেই দিনগুলো।
প্রথম যেদিন খবরটা শোনে -
মাকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল
বছর পঁচিশের অন্তর্মুখী ছেলেটা
তবু গভীর বিশ্বাসে বলেছিল
"ও ঠিক ফিরে আসবে।"
যেদিন শিয়ালদার হোটেলে মনমরা ছেলেকে দেখে
থাকতে না পেরে বাবা বলে উঠল,
"সব নিজের মধ্যে কেন চেপে রাখিস?"
সেদিনও শুকনো হেসে ছেলেটা বলেছিল,
"সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখে নিও।"
আর করুণমুখে সাহায্য চাওয়ায়
যখন সেই মেয়েটা ভিখিরির মত দুরছাই করে বলল,
"আমাকে এসব বলা বন্ধ করো",
তখনও কান্না চেপে বলেছিল,
"আমি জানি, একদিন ভুল বুঝবেই।"

আজ হাইওয়ে ধরে -
আলোর দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ছেলেটা।
তুমি বলেছিলে ঠিকই
ওকে বিশ্বাস করা যায় না,

তবু ও এগিয়ে চলেছে আলোর দিকে।
মনে একটুকরো বিশ্বাস - অন্ধকার কাটবেই;
তুমি একদিন ফিরবেই ওর কাছে,
আর আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখবে তোমরা।
সবই নিয়তি!
অন্তর্মুখী, বোকা, চাপা ছেলেটা বোঝেনি
আলোর দিকে এগোলেই অন্ধকার কাটে না।
আধ মিনিটের ব্যাপার -
ছেলেটার সর্বস্বান্ত শরীরটা নিঃস্ব হয়ে গেল,
স্বপ্নগুলো বেঁচে রইল স্বপ্ন হয়েই;
শুধু হাইওয়েতে আর লরির চাকায় লেগে রইল
পঁচিশ বছরের কিছু পুরোনো রক্ত, একমুঠো আশা
আর একবুক বিশ্বাস।

অপেক্ষা

মৃন্ময় ঘোষ

গোধূলি বেলায়,
পাখিরা কুলায়
ফেরে।
শ্রান্ত পথিক
দিন শেষে ঠিক
ঘরে
ফিরে যায়, তার
কাছে টানবার
জন
আছে পথ চেয়ে
অপেক্ষা নিয়ে
মন।
আমি খুঁজি পথ
ফেরার শপথ
নেই।
ধুলো ধুলো আর
হাওয়ারা আমার
সই।
কানে কানে ওরা
দিয়ে যায় সাড়া
শোন।
আসবে সে নাকি

তাই পেতে রাখি

মন।

একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়

পার্থ প্রতিম রায়

আমার কাজের সুবাদে ভারতবর্ষের ভিতরে এবং বাইরে অনেক কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'চার দিনের জন্যে ওয়ার্কশপ বা লেকচার দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে একটা দীর্ঘমেয়াদি বা নিয়মিত চুক্তিতে কিছুটা শিক্ষাদান করার চেষ্টা করেছি। যেমন কলকাতা ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্সে পরপর দু'বছর সেকশন বি-এর শীতকালীন ক্লাস; ফুন্টসলিং-এ রয়্যাল ভুটান পলিটেকনিকে (যা এখন রয়্যাল ইউনিভার্সিটি অফ ভুটান) ওখানকার পূর্ত এবং টাউন প্ল্যানিং বিভাগের সঙ্গে পরপর তিনবছর দু'সপ্তাহের ওয়ার্কশপ; রাঁচিতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কোল ম্যানেজমেন্টের ক্যাম্পাসে বার চারেক সপ্তাহব্যাপী ওয়ার্কশপ। এছাড়াও অন্যকিছু জায়গার সাথে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম বেসু-তে একটা টেকউইপ (TEQIP) স্কীমের স্বল্পমেয়াদি ওয়ার্কশপ পরিচালনা করার, যেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন সিভিল ডিপার্টমেন্টের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ।

(২)

বেসুর এক প্রাক্তন অধ্যাপক কিছুদিন আগে আমাকে যোগাযোগ করেন। উনি তখন এক প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আংশিক সময়ের জন্যে চুক্তিবদ্ধ। উনি আমাকে যোগাযোগ করেন সিভিল তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের নিউমারিকাল মেথডস ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন সংক্রান্ত একটি বিষয় পড়ানোর জন্যে। পড়াতে আমার ভালই লাগে, তাও আবার সেটা যদি আমার মনোমত বিষয় হয়। তবে এই ভাবে একটা গোটা সেমিস্টার কোনো কলেজে গিয়ে পড়ানোর সুযোগ বা পরিস্থিতি হয়নি। প্রথমে প্রস্তাব ছিল দুটো বিষয় পড়ানোর। আমি আমার তৎকালীন কর্মস্থলে এসে কথা বললাম। সবদিক বিবেচনা করে জানালাম কর্মস্থলে কোনোরকম অসুবিধে না করে শনিবার করে একটা বিষয় পড়াতে যাব।

অফিসের কাজে বাইরে গেলে, সপ্তাহের কাজের দিনগুলোর সুযোগ পুরোমাত্রায় নেবার জন্যে সাধারনতঃ আমার সফরগুলো রবিবারে শুরু হয় আর পরের শনিবারে শেষ হয়। তাই এটাও জানিয়ে রাখলাম যে অফিসের কাজের জন্যে বাইরে যেতে হলে সেই সপ্তাহে ক্লাস নিতে পারব না। ভেবেছিলাম এইসব শর্ত শুনে কর্তৃপক্ষ পিছিয়ে যাবে। কিন্তু দেখলাম আমার সব শর্তই ওনারা মেনে নিলেন। পরে দেখেছিলাম এইসব জায়গায় কোনো রকমে একজন অধ্যাপক বা শিক্ষক বা নিদেনপক্ষে একজন সহকারী দিয়ে কাজ চালাতে পারলেও কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হয়।

তাই একদিন গুটি গুটি পায়ে গিয়ে হাজির হলাম। জায়গাটি কলকাতার বেশ কিছুটা উত্তরে। হযবরল-র মতো তিব্বত যেতে না হলেও আমার যাত্রাটিও ছিলো বেশ অভিনব। আমার বাসা থেকে প্যাডেল করা তিনচাকার রিকশা করে যেতাম একটি মোড়ে। সেখান থেকে দুবার অটো বদল করে পৌঁছাতাম মেট্রো রেলের এক ভূগর্ভস্থ স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে গিয়ে উঠতাম এক প্রান্তিক স্টেশনে। তারপর লোকাল ট্রেনে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে আধঘন্টার যাত্রা, সবশেষে ভ্যানরিকশা চেপে সোজা সেই কলেজ। উজান ও ফিরতি পথে, দুবারই পাক্কা দু থেকে আড়াই ঘন্টার যাত্রা।

(৩)

বিভাগীয় প্রধান ছিলেন বেশ অমায়িক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বর্তমান বেসু-র প্রাক্তনী। প্রাথমিক কথাবার্তা বলে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন পরিচালন অধিকর্তার (ম্যানেজিং ডিরেক্টর) কাছে। দেখলাম আমার আর্থিক চাহিদা এবং ক'দিন ও কখন আসতে পারব সেই নিয়ে অধিকর্তা চিন্তিত। আমি একই কথা সোজাসাপটা ভাবে বললাম, "পড়ানো আমার প্যাশন, আর তাছাড়া আমার প্রাক্তন অধ্যাপকের কথায় এখানে আসা। আমি যেহেতু চাকরি করি তাই মাসমাহিনা নেওয়াও বেআইনি। তবে বিনে পয়সায় বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রদানও অনুচিত, তাই যাওয়া আসার খরচ হিসেবে সান্মানিক একটাকা দক্ষিণা হিসেবে দিলেও আমার আপত্তি নেই।" তিনি আমার সাধুপ্রস্তাবে খুশি হয়ে বললেন যে ওনাদের নিয়ম মেনেই একটা দক্ষিণা দেওয়া হবে। আমি যেন পরের শনিবার থেকেই কাজে লেগে যাই।

দর কষাকষির কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তাই নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আমার কিছু আপত্তি না থাকলেও মনের মধ্যে অনেক আশা ছিল। একটা বেশ গুরুগম্ভীর ইন্টারভিউ হবে, কিছু কাগজ পত্র জমা দিতে হবে। কয়েকদিন পরে সব দেখে শুনে একটা ফোন আসবে বা বাড়িতে একটা চিঠি আসবে। সেসব কিছুই নেই। আমতা আমতা করে জানতে চাইলাম কাছের রেলস্টেশন থেকে কলেজে আসার কোনো গাড়ি থাকবে কিনা। কোনো নিশ্চয়তা পেলাম না। শুধু মৌখিক ভাবে কাজে বহাল হয়ে গেলাম। মানে বাড়িতে ঠিকে কাজের লোকের মতো ঠিকে প্রফেসর। যাই হোক যা হবে দেখা যাবে বলে চলে এলাম। আর টাকা রোজগার করতে তো যাইনি, তাই ঠিক করলাম মাঝপথে কেটে পড়ব না।

(৪)

দুয়েকদিন পর একটা ফোন এলো, এক ভদ্রমহিলা আমায় মনে করিয়ে দিলেন পরবর্তী শনিবার থেকে আমার ক্লাস। ফোনেই জানালেন সম্ভাব্যসূচি এবং প্রস্তাবিত দক্ষিণা। গাড়ি চালাচ্ছিলাম, অঙ্কটা শুনে আরেকটু হলে সামনের গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারতাম। যদি আমার বাসা থেকে কলেজ ট্যাক্সি করে যাই তাহলে যা খরচ হবে প্রস্তাবিত দক্ষিণাটি তার থেকেও একটু কম। তবু আমি সেই ভাঙা রেকর্ডের মতো বললাম, একটাকা সাম্মানিক হলেও যাব, কিন্তু একটা প্রশংসাপত্র যেন থাকে। উনি ফোনে ভরসা দিলেও তারপর পুরো একটা সেমেস্টারেও ওনার কখনো দেখা পাইনি। অশরীরী নন, কারণ শুনেছিলাম এরকম একজন আছে আর কলেজের মধ্যে একটা নোটিসবোর্ডে ওনার নাম ও চলফোন নাম্বারটাও দেখতে পেয়েছিলাম।

আমার বাড়ির লোকজন, সহকর্মী বা বন্ধুবান্ধব নিরুৎসাহ করলেও কথার খেলাপ করব না বলে শনিবারের সাপ্তাহিক অভিযান শুরু করে দিলাম। কলেজটা বেশ সাজানো গোছানো হলেও কিছুটা যেতে হত একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে। ব্যাগ তৈরির কারখানা আর মুলিবাঁশের আড়তের পাশ দিয়ে। কুকুর, বিড়াল, ছাগল, মানুষ আর মুরগির ছানাদের পাশ কাটিয়ে। কিছুদিন পরে দেখলাম স্থানীয় রেলস্টেশন থেকে ভ্যানরিকশা ছাড়াও প্যাডেল করা রিকশা পাওয়া যায়, যদিও ভাড়ার বিস্তর ফারাক। কারণ জানতে চাওয়ায় এক প্যাডেল রিকশাওয়ালা বললো, "ভ্যানের ভাড়া কম হবে না

কেন, ওরা তো জ্যান্তও বয় আবার মড়াও বয়। আমরা তো শুধু জ্যান্তই বই”। বুঝিয়ে বলল সামনের হাসপাতালে কোনো রুগি বা রাস্তায় কোনো কুকুর বেড়াল মারা পড়লে ভ্যানওয়ালারা সেগুলো শ্মশান বা ভাগাড়ে ফেলে ভ্যানটা ধুয়ে নিয়ে স্টেশনে চলে আসে, জ্যান্ত সওয়ারি নিয়ে যাওয়ার জন্যে। জানিনা কতটা সত্যি বা মিথ্যা তবে তারপর থেকে ভ্যানে চাপলে একটা অন্যরকম অনুভুতি হত।

(৫)

প্রথম দিকে সিভিলের এক সহ-অধ্যাপক ছিলেন, যিনি নিজের পরিচয়ে বলেছিলেন যে, উনিই নাকি প্রায় সব বিষয় পড়ান এবং একাই বিভাগটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অল্পদিনের মধ্যেই জনান্তিকে আমাকে বলেছিলেন, ‘সব ছাত্রছাত্রীরাই একদম ভুষিমাল, কিছুই জানেনা’। অনান্য অধ্যাপক বা অধ্যাপিকারা ‘সব হয় ফাঁকিবাজ অথবা পড়াতে পারে না’। গোপন কথা না বলাই উচিত, কিন্তু পরে দেখেছিলাম সেই তালিকায় আমার দুয়েকজন প্রিয় অধ্যাপক আছেন আর কিছু ছেলেমেয়ে পড়ুয়া হিসেবে বেশ ভালো। উনি ছিলেন সর্বজ্ঞ, কিছু না বুঝলেও সবই জানেন। আমার বিষয়ের পাঠক্রমের মধ্যে একটি সফটওয়্যার ছিলো। আমি বারংবার বলেছিলাম সেটি যেন আমার উপস্থিতিতেই সরবরাহ করা হয়। পরের সপ্তাহে গিয়ে দেখলাম উনি নিজেই সব বুঝে নিয়েছেন, কারণ সেটা নাকি 'সামান্য ব্যাপার'! ফলত 'সামান্য ব্যাপার' বলেই আর মনে রাখতে পারেননি, ভুলে গেছেন কিভাবে লাইসেন্সগুলো চালু করতে হয়। এটা নিয়ে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষেরও সেরকম 'গয়ংগচ্ছ' মনোভাব, শেষে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে কিছু ব্যক্তিগত সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কোনওরকমে সেই সফটওয়্যার চালু করেছিলাম।

সেই অধ্যাপক বলেছিলেন উনি সফটওয়্যারটা পুরোটাই জানেন আর যারা সরবরাহ করতে এসেছিল তারা কিছুই জানে না। অনেক সফটওয়্যার কোম্পানির একদম অনভিজ্ঞ লোকেদের পাঠিয়ে দেওয়ার স্বভাব জানা ছিল বলে সেটাই মেনে নিয়েছিলাম। দুদিন পরে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরুলো, উনি আমাকে বললেন একদম একটা ছোট কাঠামো নিয়ে ওনাকে ধাপে ধাপে একটু দেখিয়ে দিতে। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, “আপনি যে বলেছিলেন আপনি এ ব্যাপারে

সব জানেন!” উনি বললেন, “আসলে সব জানতাম, কিন্তূ এই সব গরু ছাগলদের পড়াতে এসে চর্চা করা হয়নি তো, তাই ভুলে গেছি।” আমি মনে মনে মুচকি হাসলাম। কলেজ জীবনে হাসি পিছনে মোছার শিক্ষাটা কর্মজীবনে মাঝে মাঝেই কাজে লাগে। আর একবার লাগল!

মনে মনে বিরক্ত হলেও উনি বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক, তাই নিমরাজি হয়ে গেলাম। বললাম, “ঠিক আছে আজ একটু তাড়া আছে, পরের দিন দেখিয়ে দেব।” পরের দিন একটু আগে এসে বললাম, “চলুন আপনাকে আধঘন্টা দেখিয়ে দিই”। উনি নিরাসক্ত মুখে বললেন, “আসলে পরেরদিন আমার একটা ক্লাস আছে। সব ভুষিমাল, তবু নিজের একটু প্রস্তুতি তো করে নিতে হবে। আপনি বরং ক্লাস শেষ করে নিয়ে আমায় দেখিয়ে দেবেন। ওই অল্প একটু।” শেষ বিরক্তি তখনো বাকি ছিল। ক্লাস শেষ করে এসে আবার ওনাকে বললাম দেখে নিতে। এবার উনি বললেন, "আমার আর দশ মিনিট লাগবে এই অধ্যায়টা পড়ে নিতে, তারপর আমি টিফিন করে নেব। আপনিও বরং টিফিন করে আসুন।” উনিই প্রথম দিন আমাকে ভয় দেখিয়েছিলেন এই বলে যে কলেজে কোন খাবার দাবার পাওয়া যায় না। যদিও পরে দেখেছিলাম বেশ চালু একটা ক্যান্টিন আছে, তাছাড়াও চা-টা-য়ের দোকান আছে ভিতরে ও বাইরে। সেদিন টিফিন নিয়ে যাইনি, ক্যান্টিনে একটু নাকে মুখে গুঁজে চলে এলাম। ভাবলাম ওনারও শেখার আগ্রহে টিফিন হয়ে গেছে। দেখলাম উনি সেই বইটা বন্ধ করে দুহাত উপড়ে তুলে একটা হাই তুলে বললেন, "আপনার হয়ে গেল? আমার আর আধঘন্টা লাগবে টিফিন করতে। আর আমার তো বয়স হয়েছে, তাই খেয়েই একটু বিশ্রাম নিতে হয়। নাহলে মাথা কাজ করে না। ওই আধঘন্টা - পঁয়তাল্লিশ মিনিট একটু ঘুমিয়ে নিই। তারপর আপনার সাথে গিয়ে বসব খন।” শিখবেন উনি, আর দায়টা আমার!

জানিনা সেদিন নিজেকে কিভাবে সামলেছিলাম। কোনোরকমে কাজের অজুহাতে কেটে পড়ার সময় মনে মনে ভাবলাম এনার অত্যাচারেই আমাকে জবাব দিতে হবে। যাইহোক পড়ুয়াদের সুবাদে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। পরের শুক্রবার বেশ রাতে সেই অধ্যাপকের ফোন, “কাল কলেজে আসবেন না। ছেলেরা ক্লাস বয়কট করবে ঠিক করেছ।” আমি বিভাগীয় প্রধান এবং কলেজের কিছু কর্মচারীকে ফোন করলাম। কেউ কিছু বলতে পারল না, তাই ঠিক করলাম গিয়েই দেখি।

দেখলাম সত্যিই ক্লাস বয়কট হয়েছে, কয়েকজন ছাত্র এসে জানিয়ে গেল, “স্যার আপনাকে কষ্ট করে আসতে হয়েছে, তাই আমরা দুঃখিত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের থেকে প্রচুর পয়সা নিচ্ছে, অথচ অর্ধেক বিষয়ের অধ্যাপক নেই। কেউ কেউ পড়াতে পারেন না, অথচ একাধিক বিষয়ের দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। কিছুই শিখতে পারছি না। কিছু বললেই কর্তৃপক্ষ ললিপপ দেখিয়ে বলছে, পড়া শেষে চাকরির ব্যবস্থা পাকা। শুধু যারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।” সেদিন জানলাম টিউশন ফি আর অনান্য খরচ মিলিয়ে কলেজ নেয় বছরে প্রায় একলক্ষ টাকার কাছাকাছি। তার উপর হোস্টেলের খরচ প্রায় মাসে চার থেকে পাঁচ হাজার। মনে পরে গেল আমাদের সময় টিউশন ফি ছিল বছরে আড়াইশো টাকা আর হোস্টেলে মাসে চার-পাঁচশ। তবে দেখতে দেখতে প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল আর তাছাড়া আমাদের ছিল সরকারি কলেজ, তাই ফারাক তো থাকবেই। তাই বলে এতটা! কিছুক্ষণ বসে রইলাম, এটা সেটা উল্টে দেখলাম, মোবাইলে গেমস খেললাম। তারপর কয়েকজন এসে বলল, “স্যার, ক্লাস হবেই না। কর্তৃপক্ষ ধমক চমক দিচ্ছে। আমরা গেট আটকাব। আপনি বরং বেড়িয়ে পড়ুন।” আমিও মানে মানে কেটে পড়লাম। আসার পথেই শুনে এলাম এবং পরের সপ্তাহে নিশ্চিত হলাম - ছাত্রদের আপত্তিতে সেই সর্বজ্ঞ অধ্যাপককে কর্তৃপক্ষ ছুটি দিয়ে দিয়েছে।

(৬)

কলেজ যাওয়া আসার পথে টুকরো টাকরা জীবন চোখে পড়ত। অনেকদিন ট্রেন বাস ছেড়েছি। আবার সেই নতুন করে লোকাল ট্রেনের গাদাগাদি ভিড়। একটা অন্যরকম পরিবর্তন। আমি পাশের লোকের জামায় ঘামছি, পাশের লোকের মাথার ঘাম অন্য একজনের গায়ে বা পায়ে পড়ছে। টিকিট চেকার এলে বা হকারের কাছে কিছু কিনতে ইচ্ছে হলে একটু ফাঁকা দিকে সরে গিয়ে মানিব্যাগটা বার করছি। নাহলে কে জানে নিজের পকেট ভেবে কার পকেটে হাত ঢুকিয়ে গণধোলাই খাব।

কেউ বেচছে চা, কেউ ডালমুট, কেউ গরম দিলখুশ তো কেউ আবার ঠান্ডা কুলফি-আইসক্রিম। যাতায়াতের পথে বিকিকিনি হচ্ছে আঙুর, লিচু, কাঁচা আম, পাকা মুসুম্বি বা কচি শসা। কাশির জন্যে আছে শুকনো আদা বা কবিরাজি লজেন্স, বদহজমের টোটকা হজমিগুলি বা আমলকি। এর

মাঝে কেউ বক্স বাজিয়ে ঠোঁট মিলিয়ে শুনিয়ে যাচ্ছে কয়েকটা বাংলা বা হিন্দি গান। কোনও কিছুরই অভাব নেই, সব কিছুর এক চলন্ত সহাবস্থান। একদিকে কিছু নিত্যযাত্রী তাস পেটাতে ব্যস্ত, কেউ কেউ মারছে রাজা উজির। বিষয়েরও শেষ নেই, মোহনবাগান - ইস্টবেঙ্গল, রাজনীতি, নারীনিগ্রহ, দ্রবমূল্য বৃদ্ধি থেকে শুরু করে আজকের আবহাওয়া। মন দিয়ে শুনলে যে কেউ সর্বজ্ঞ হতে বাধ্য। এর মধ্যেই এগিয়ে আসত দুয়েকটা হাত, কোনো অথর্ব বুড়িমা বা অন্ধ গায়ক বা কোনও স্বভাব ভিখারি।

একদিন ফেরার পথে দেখলাম এক অন্ধ, বোবা লোক নাকের সাহায্যে একটা বাঁশি বাজাচ্ছে। এর থেকে অনেক কম বাহাদুরি দেখিয়ে কত লোকে কত পয়সা উপার্জন করে, শীততাপনিয়ন্ত্রিত মঞ্চে প্রদর্শনী করে। কিন্তূ ঐ যে বলে এখন মার্কেটিংয়ের যুগ। সেটা না থাকলে অনেক প্রতিভা মাঠে গড়াগড়ি খায়। কত রকম হারিয়ে যাওয়া জিনিস পাওয়া যেত। বেনীমাধব শীলের পঞ্জিকা, ছবি নকল করার ম্যাজিক সল্যুশন, জমাট বাঁধা দই, হরিদাসের বুলবুলভাজা।

একদিন ফেরার পথে এক জংশন স্টেশনে দেখলাম বিশাল ভিড়। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম একটা লোক কোনও মেল ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে প্লাটফর্মে হোঁচট খেয়ে লাইনে গিয়ে পড়েছে। মুণ্ডুটা দুটো লাইনের মাঝে আর দেহটা প্লাটফর্ম ঘেঁষে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। চলন্ত ট্রেন থেকে নামাটা লোকটার দোষ হলেও, দায়ী আসলে রেল কর্তৃপক্ষের বেখেয়ালে প্লাটফর্মের ধারগুলো এবড়ো খেবড়ো ভাবে কেটে রাখা। কিছু লোকের গাফিলতিতে একটা জীবন চলে গেল। সাথে কেউ ছিল না, তাই জানিনা বাড়ির লোক আদৌ খবর পেয়েছিল নাকি। না একটা বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে দেহটা চালান হয়ে গিয়েছিল। তবে অনেক উৎসাহী জনতা মোবাইলে দৃশ্যটা তুলে রাখতে খুব ব্যস্ত ছিল।

(৭)

একদিন কলেজ থেকে ফিরছি, এক কুখ্যাত রাস্তা দিয়ে। যেখানে দুপাশে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের কুঠি, কোর্ট ও কাছারি; কিন্তু মাঝে মাঝেই সেই এলাকা সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে কোনো জঘন্য নারী নিগ্রহ বা খুনের জন্যে। একটা বাজার বসে, কিন্তু শনিবারের দুপুরেই প্রায়

জনশূন্য। গা ছমছম করে। হঠাৎ নজর পড়লো একটা ল্যাম্পপোষ্টের লেখার দিকে, "এখান থেকে মা বোন চলাচল করে, কেহ প্রস্রাব করিবে না। - By Order D. M."। ইচ্ছে থাকলেও জানা হয় নি D.M. মানে জেলাশাসক সত্যিই এরকম কোনো নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা। তবে পড়ে বেশ মজা লেগেছিল, ভাষার গুণে নাকি লেখার ধরনে - তা জানিনা।

আর একবার এর কাছেই এক ভাতের হোটেলে হাজির হয়েছিলাম, ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্যে। বাংলায় লেখা মূল্য তালিকায় বেশ কিছু অদ্ভুত পদ ছিল, যেমন 'হাপ' ভাত বা 'বনলেস' চিকেন বা 'পরটা'। নিচে আবার ইতি গজর মতো লেখা "বিঃ দ্রঃ - পরটার সাথে ঘুগ্নী অথবা আলুর টরকারী দেওয়া হয়"। আমি মাছ ভাতের অর্ডার দেওয়ায় ছেলেটি সবিনয়ে নিবেদন করে গেল যে শনিবার কোর্ট বন্ধ, তাই মাছটা আগের দিনের, তবে 'ভাল' মাছ। আসার পর দেখলাম সেটা এতবার 'ভাল' করে ভাজা মাছ, যে সেটাকে মাছ না বলে মাছের আমসত্ব বলা যেতে পারে।

স্টেশনের পাশে কয়েকটা গজিয়ে ওঠা গুমটি ছিল। কেউ বেচত ফল, কেউ চপ, কেউ সিগারেট। এরমধ্যে একটা দোকানে ঠান্ডা বিয়ারও পাওয়া যেত। প্রথম দিন ছোট বড় রঙিন বোতল আর গায়ের লেখা দেখেও বিশ্বাস হয়নি। এ তো দিনদুপুরে সর্বসমক্ষে বেআইনি কারবার! এক গরমের দুপুরে ফেরার পথে জানতে চাওয়ায় দোকানি আশ্বস্ত করল যে সত্যিই ঠান্ডা বিয়ার পাওয়া যায়। জানতে চাইলাম কিন্তু লোকে খাবে কোথায়? দোকানি সুর করে ব্যঙ্গ করে উঠলো, "ঠান্ডা বিয়ার দেব, তারপর খাওয়ার জায়গা দেব? এরপর তো মশাই শোবার জায়গা খুঁজবেন।" কথাটার মানে বুঝে বা 'না বুঝে' আমি নিরস্ত হলাম।

(৮)

এবার আসি কলেজ কর্তৃপক্ষের কথায়। প্রথম দিকে ফোনে কথা বলা সেই ভদ্রমহিলার দেখা পাইনি। এদিকে দুই সপ্তাহের ক্লাস নেওয়া হয়ে গেছে। একটা কাগজ হাতে থাকা দরকার, তাই অফিসের দিকে গিয়ে নিজের তাগিদে বিস্তর ভুলে ভরা নিয়োগপত্রটা নিয়ে এলাম। আমাদের ফ্যাকাল্টি রুমে পিওন ছাড়াও একজন সহকারি ছিল। সে ক্লাসের জন্যে মার্কার পেন, ডাস্টার আর রোলকলের খাতার ব্যবস্থা করে দিত। এছাড়াও একজন আমি গেলেই এসে হাজির হতেন। মাঝে

মাঝে কাকে বললে একটু চা বা জল পাওয়া যাবে সেসব বলে দিতেন। কিছু সময় এসে বলতেন আজকে আপনার পড়ানোটা একটু দ্রুত হয়েছে, ছেলেদের মাথায় ঢোকেনি। যদি একটু আস্তে পড়ান, তাহলে ভালো হয়। যদিও জানতে চাইলে ছেলেরা উল্টোটাই বলত!

আমার বেশ ভালই লাগত, ভাবতাম আমার মতো এক নগণ্য ঠিকে অধ্যাপকের জন্যেও কর্তৃপক্ষের কত নজর। পরে বুঝলাম নজরটা আমার 'জন্যে' নয়, আমার 'উপরে'। ক'টায় ক্লাসে আসছি, ক'টায় যাচ্ছি সেটা গোপনে নজর রাখার জন্যে। আর আমাকে একটা চাপে রাখা যাতে ভুল করেও না ভেবে বসি আমি ভাল পড়াচ্ছি। সেই ভেবে যদি কিছু অতিরিক্ত পয়সাকড়ি চেয়ে বসি – তাই! এরমধ্যে নিজের পড়াশোনার কাজে আমাকে এক সপ্তাহে বাইরে যেতে হয়েছিল। আমি আগে থেকেই বিভাগীয় প্রধান এবং ছাত্রছাত্রীদের সেটা জানিয়ে রেখেছিলাম। আমি অন্য শহরে একটা সেমিনারে ব্যস্ত, হঠাৎ সেই ব্যক্তির ফোন। আমি আসিনি কেন সেই কারণ জানার জন্যে। আমি যখন বললাম যে সবাইকে বলা আছে, উনি দাবি করলেন সবাই জানলেও উনি জানেন না, তার মানে কর্তৃপক্ষও জানে না। পরবর্তী কালে আমি যেন এরকম কিছু হলে ওনাকে অবশ্যই জানিয়ে রাখি। অদ্ভুত লাগলেও আপত্তি করিনি। সব জায়গায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কিছু কাছের লোক বা চামচা থাকে। তাদের দাবিদাওয়াগুলো এরকমই হয়, কর্তৃপক্ষের প্রচ্ছন্ন মদতে।

কিছুদিন পরে আমাকে একবার বিদেশ যেতে হয়। সেই শনিবার একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ছিল। কিন্তু অনেক সময় যা হয়, দরকারে বা অদরকারে আটকে যেতে হয়। শেষমুহূর্তে কিছু আকস্মিক পরিবর্তন হয়ে ঠিক হয় আমি প্রায় সারারাত বিমানযাত্রা করে শনিবার ভোরে কলকাতায় নামব। যাইহোক এর জন্যে অফিসের কাজের সঙ্গে আপস করিনি বা ক্লাস নেওয়ার কথাটা মনে করিয়ে অন্যায্য সুবিধে নেওয়ার ইচ্ছেও মনে জাগেনি। প্রথমে ভেবেছিলাম সেই শনিবার ক্লাস নেব না। এদিকে পরীক্ষা প্রায় চলে এসেছে, তাই শেষমেশ বিভাগীয় প্রধানকে জানিয়ে দিলাম আমি একটু দেরি হলেও আসব, হয়তো দমদম থেকে সোজাসুজি। সেই ব্যক্তিকেও জানিয়ে রাখলাম সব কিছু, কর্তৃপক্ষ বলে কথা!

অবশেষে সময়মতো ফিরে এলেও সারারাত না ঘুমিয়ে শরীর খুব কাহিল, সোজা বাসায় চলে গেলাম। কিন্তু কিন্তু করেও স্বভাববিরুদ্ধভাবে কথা দিয়ে হঠাৎ শরীর খারাপ অজুহাতে শেষ মুহূর্তে ডুব মারতেও ঠিক মন চাইল না। দুটো সেকশন কে পরপর ক্লাস না নিয়ে, সময় সংক্ষেপ করার জন্যে বলে দিলাম একটু দেরি করে সবাই যেন ক্লাসে আসে। দুটো সেকশনের এক সাথে ক্লাস হবে। সেইমতো একটু দেরি করে গিয়ে, একটু তাড়াতাড়ি চলে এলাম। যাবার পথে প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে সেই কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি বা কর্তাব্যক্তির ফোন এসেছিল, কোথায় আছেন, কতো দেরি হবে। চার-পাঁচ বার হবার পর শেষ দিকে এই অমানবিক ব্যবহারে খুব বিরক্ত হয়ে বললাম, "আর ফোন করবেন না। আমি ক্লাস শুরু করার আগে আপনাকে জানিয়ে দেব।"

সেদিনও ক্লাসে গিয়ে দেখি সেই কর্তাব্যক্তি ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ফিরতি পথে ওনার আর একটা ফোন পাই। জানতে চান "তাহলে কি আপনার দুটো ক্লাস হল?" আমার সাধারণতঃ চারটি করে ক্লাস নেওয়ার চুক্তি ছিল। আমি বললাম – "দুটো সেকশনের আড়াই ঘন্টা, মানে মোট পাঁচটা ক্লাস হল।" উনি ফোন রেখে দিলেন, আমি তখন এর মানে বুঝিনি। বিভাগীয় প্রধানের সাথে আলোচনা করে বিষয়টিকে পাত্তা দিলাম না। কিন্তু বুঝতে পারলাম পরের মাসের মাঝামাঝি গিয়ে।

ওখানে আবার একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল, মাসের মাঝামাঝি গিয়ে হিসাবরক্ষকের কাছে গিয়ে একটা কাচের ছোট জানালার কাছে মুখ ও 'মাথা' নামিয়ে 'মজুরি' ভিক্ষা করে আনা। কয়েকটা টাকা বা একটা চেক হাতে ধরিয়ে দিত, একটা খামে পুরেও দিত না। এর নাম নাকি 'সাম্মানিক দক্ষিণা' (honorarium)!

পরের মাসে দেখলাম হিসেব অনুযায়ী যা পাওয়ার কথা তার থেকেও কিছুটা কম। হিসেবরক্ষক চিনির বলদ, তাই তাকে কিছু না বলে এসে বললাম বিভাগীয় প্রধানকে। বললাম, "হয় হিসেব ভুল করেছে, তাহলে ভাল। কিন্তু রাত জেগে আসার পর দুটো ক্লাস এক সাথে নেওয়া সত্ত্বেও যদি পুরো পয়সা হিসেব করে কেটে রাখে তাহলে আমি আর আসছি না। আশা করি ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়ার আর অশিক্ষিত মজুরের মধ্যে কিছুটা হলেও পার্থক্য আছে। তাছাড়া অনেকদিন আমি

অতিরিক্ত সময় ক্লাস নিলেও তার জন্যে কিছু দাবিও করিনি বা পাইওনি"। সঙ্গে আমি সেই কর্তাব্যক্তির নজরদারির কথাও বললাম। উনি বিষয়টি নিন্দা করে বললেন, "এইসব দালালদের সাথে কথা বলে লাভ নেই, তুমি বরং পরিচালন অধিকর্তাকে জানিয়ে রাখ, তারপর আমি কথা বলছি।"

যদিও বিভিন্ন কারণে সেই কথা আর হয়ে ওঠেনি। অধিকর্তা ব্যস্ত অথবা হাসপাতালে ভর্তি এইভাবে দু-তিন সপ্তাহ কাটল। এদিকে সেই কর্তাব্যক্তি যথারীতি নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন আড়ালে আবডালে। আমি ধৈর্য্য হারিয়ে একটা পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলাম ব্যক্তিগত অসুবিধের কথা জানিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সবার টনক নড়ে উঠল। সেই কর্তাব্যক্তির ফোন। আমি প্রথমে না বললেও পরে যখন জানতে চাইলাম আগের মাসের হিসেবটা, উনি কবুল করলেন হিসেব করে টাকা কাটার কথা। আমি বললাম যে "আপনারা আমাদের মনে করেন ডেলি কন্ত্র্যাক্ট লেবারারের মত।" উনি লজ্জিত হয়ে একটু ধানাই পানাই শুরু করলেন, পদ্ধতির দোষারোপ দিতে লাগলেন। আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল। বললাম, "আপনি যে নজরদারি করছিলেন আমাকে না জানিয়ে সেটা একটা অপরাধ এটা মানেন তো? তারপর আপনারা যে হিসেব করে আমার দক্ষিণা বা মজুরি কেটেছেন সেটা জানাবারও কি প্রয়োজন মনে করেন না?" উনি এর একটা সাফাই দেবার চেষ্টা করায় বলেছিলাম, "যদি মেরুদন্ড থাকে তাহলে আপনার বাড়ির কাজের মাসি একদিন কামাই করলে তার মাইনে থেকে না বলে পাঁচ টাকা কেটে দেখুন তো! আমি যেটা ভদ্রভাবে করতে পারছি না, সেটা সে করে দেবে।" উনি উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন "সেটা কি?" আমি বললাম, "আপনাকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেবে।"

(৯)

অনেকক্ষণ আমার কাছে ঝাড় খেয়ে বললেন উনি দেখবেন ব্যাপারটা, আমি যেন সামনের শনিবার ক্লাস নিতে যাই। আমি জানালাম, "আপনাদের দেখার উপর আমার ভরসা নেই। আপনারা সব দিকেই কামাচ্ছেন। আমাদের যে অনুপাতে আর যে আগ্রহ নিয়ে টাকা কাটেন, ক্লাস না হলে বা শিক্ষক জোগাড় না করতে পারলে সেই অনুপাতে কি ছাত্রদের টাকা ফেরৎ দেন? আপনি হয়

আপনার নজরদারির কথা আর সজ্ঞানে টাকা কাটার কথা স্বীকার করে আমাকে একটা লিখিত মুচলেকা দিন। নাহলে আমি আর যাচ্ছি না।” উনি জানতে চাইলেন তাহলে পরীক্ষার কি হবে? আমি বললাম, “কেন আপনারা যখন টাকার মূল্যে সব দেখেন, তখন লোক যোগাড় করুন বা আমার মজুরিটা সামনের চায়ের দোকানের ছেলেটাকে দিয়ে দেবেন আর বলবেন পরীক্ষা নিয়ে নিতে। আর না পারলে আপনি নিজে নেবেন। আর সেটাও না পারলে বা আপনাদের মুরোদে না কুলালে আমাকে লিখিত মুচলেকা দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবেন। এবার যা ইচ্ছে আপনি ঠিক করুন।”

এরপর ফোন রেখে দিয়েছিলাম। মাত্র কুড়ি মিনিট পরেই ক্ষমা চেয়ে একটা মেসেজ এল। তারপরেই আবার ফোন যে কোন কিছু না কেটেই আমাকে পুরো দক্ষিণা দেওয়া হবে এবং আমার শেষ ক্লাসের দিনই আমার ওইদিন পর্যন্ত সব হিসেব করে মিটিয়ে দেওয়া হবে, প্রশংসাপত্রসহ। স্টেশনে গাড়ি না পাঠালেও আর পরিচালক আসেননি অজুহাতে প্রশংসাপত্রটি না দিলেও বাকিটা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুনেছিলাম বিভাগীয় প্রধানের কাছেও ভালই দাবড়ানি খেয়েছিলেন। তবে শেষদিন সেই কর্তাব্যক্তি ফোনে কথা বললেও একবারও দেখা করতে আসেননি। আমারও তেমন কোনও ইচ্ছে ছিল না। কর্মক্ষেত্রে কখনও পয়সা বা মাইনের জন্যে সাধাসাধি না করলেও আমার মনে হয়েছিল এদের একটা ঝটকা দেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে অন্যদের এইসব দুর্ভোগ পোহাতে না হয়। আর তাছাড়া পুরো পদ্ধতিটাই শুরু থেকেই কেমন যেন দরকোঁচা মেরে গেছে মনে হয়েছিল।

(১০)

উপরের এই কর্তাব্যক্তির সাথে আর একটা ছোট্ট ঝামেলা হয়েছিল, যখন আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে উনি আমার উপর নজরদারি করতে আসেন। একদিন ক্লাসে বেশি ছেলে আসেনি, তাই বেশ কিছু এলে আমাকে খবর দিতে বলে আমি ফ্যাকাল্টি রুমে চলে গেলাম। যথারীতি ৫ মিনিটেই এসে হাজির হলেন সেই কর্তাব্যক্তি। প্রথমে মিষ্টি করে জানতে চাইলেন, “কি ক্লাস হচ্ছে না?” আমি কারণ বলতে চলে গেলেন। দু’মিনিট পরেই এসে বললেন ছেলেরা সব ক্লাসের বাইরে তাস

খেলছে আমি যেন শীঘ্রই ক্লাসে যাই। আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, "বি ই কলেজে তো কিছু ছেলে ক্লাসের বাইরে গাঁজা খেত। আমি এখানের দারোয়ান নয়, তাই ক্লাসের বাইরে কি করছে দেখার দায়িত্ব আমার নয়।" সহশিক্ষকদের হাসতে দেখে লজ্জা পেয়ে চলে গেলেন। আমি একটু পরেই ক্লাসের দিকে পা বাড়াতেই দেখি উনি করিডরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি সোজা বলে দিয়েছিলাম "আপনি এখানে গোয়েন্দাগিরি করলে আমি ক্লাস না নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাব।" তারপর থেকে সামনা সামনি না এলেও পিছনে বা কিছু ছাত্রের মাধ্যমে নজর রাখতেন।

আমাকে টানা চার ঘন্টা ক্লাস নিতে হত বলে মাঝে মাঝে করিডরে গিয়ে একটু পায়চারি করে আসতাম। একদিন দেখি এক রামগরুড়ের ছানা দু'হাত মুঠো করে বেশ গম্ভীর চালে আসছে। আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি ভাবলাম মনে হয় সি আই ডির লোক। পরিচয় পেয়ে বললেন, "এদিকে স্টুডেন্টদের টয়লেট, আপনি উল্টোদিকে ফ্যাকাল্টি টয়লেটটা ইউজ করবেন।" আমি ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাইলাম, "আপনার কি আমাকে দেখে ডায়াবেটিস রুগি মনে হচ্ছে?" উনি কথাটার মানে ধরতে না পেরে সেই ভঙ্গিতেই চলে গেলেন। পরে জেনেছিলাম উনি ছিলেন কলেজের সাফাইকর্মীদের মোড়ল। আরেক কর্তাব্যক্তি!

(১১)

আমরা বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার মালিকদের বিচার করি ভাঁওতা দিয়ে টাকা নিয়ে, প্রতিশ্রুতিমত টাকা ফেরৎ দেয় না বলে। কিন্তু এরা তো দু'হাতে লুটছে। এখন নাকি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা না দিলেও হয়। একটা নম্বর থাকলে আর যোগাযোগ রাখলে এমনিতেই এসব জায়গায় ভর্তি হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাওয়া যায়। সরকারিভাবে এ বাবদে নাকি কোনও গোপন সেলামি দিতে হয় না। কিন্তু এরা টাকা নিয়ে প্রতিশ্রুতিমত শিক্ষা দেয় না এবং শেষে অনেক জায়গায় দেখি আন্দোলন হচ্ছে প্রতিশ্রুত চাকরি না দিতে পারার জন্যে। কিন্তু তার বেলা বেশি হৈচৈ নেই। আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত সেরা দু'হাজার ছেলেমেয়ে, এখন অনেকের ক্রমতালিকায় আশিহাজার, নব্বই হাজারে আবার অনেকে কোনো তালিকায় না থেকেও সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। তাই ইদানিং একটা রসিকতা চালু হয়েছে বছর কুড়ি আগে একজন আগুন্তুক একটি পাড়ায় এসে মোড়ের দোকানে

এসে যদি জানতে চাইত ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাড়ি কোথায়? উত্তর পেতো ওই যে লাল রঙের বাড়িটা বা ওই রাস্তার ডানদিকে গিয়ে শেষ বাড়িটা। এখন সেই প্রশ্ন করলে উত্তর আসে, যেকোন বাড়িতেই কড়া নাড়ুন, দু'একটা পেয়ে যাবেন।

রবীন্দ্রনাথের কথায়, "ভাল জিনিস যত কম হবে ততোই ভাল। নাহলে নিজের চাপেই সে মাঝারি হয়ে যাবে।" হয়তো এটাই যুগের পরিবর্তন, সময়ের দাবি। আগে দেখতাম বাবা মা গর্ব করে বলতো যে ছেলে বা মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারি পড়ছে। সেটা শুনে লোকে চমকিত হত। এখন এতো সহজলভ্য কারিগরি শিক্ষা যে বাবা মা গর্ব করলেও কেউ খুব বেশি চমকিত হয় না। একদিন ট্রেনে আসতে আসতে শুনলাম এক ভদ্রলোক তার সহযাত্রীকে বলছেন, "বুঝলেন মশাই এই বাজারে আমার ছেলে সুযোগ পেয়েও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায় নি। অঙ্কে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছে। মাস্টার ডিগ্রি করে স্কুল মাস্টারি করবে। কাদার তালের মতো বাচ্চাগুলোকে গড়ে তুলবে নতুন মানুষ হিসেবে"। শুনে খুব ভাল লেগেছিল, এটাই হয়ত ভবিষ্যৎ। শুধু বুকের একদিকে হয়তো একটু চিনচিন করে উঠেছিলো আমার অপূর্ণ থেকে যাওয়া ফিজিক্স অনার্স পড়ে শিক্ষকতা করার বাসনাটা।

(১২)

শেষে আসি কিছু ছোটখাটো চরিত্রের কথায়। এক সহকর্মিনী ছিলেন, যাদবপুরের ছাত্রী। একমাত্র সম্পূর্ণ সময়ের অধ্যাপিকা, মানে ঠিকে নয়, স্থায়ী। ফাঁকা সময়ে মাঝে মাঝে আড্ডা জোড়া হতো। এছাড়াও ছিল এক সহকারি, শেষ দিনে পরীক্ষা নেওয়ার সময় ওর সাহায্য না পেলে মনে হয় বেশ ভালই বেগ পেতাম। এছাড়াও দুয়েকজন ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট আর পিওন। বাকি সব অধ্যাপকরাই আমার মতো ঠিকে। সব মিলিয়ে মাত্র চারজন শিক্ষক দিয়ে পুরো বিভাগটা চলত। আর একটা মিল ছিল, সবারই শুনতাম মাঝে মাঝেই এই সব দালালরা পয়সাকড়ি না বলেই কেটে নিত। আর মোটামুটি প্রায় সবাই সেমেস্টারের শেষের দিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন বা ছাড়তে পারলে বাঁচি অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। এমনকি কিছু সহকারিরাও। আমরা সবাই ছিলাম শ্রমিকপক্ষ আর ওইসব দালালরা মালিকপক্ষ। আর ছাত্রছাত্রীরা হলো সোনার ডিম পাড়া হাঁস। সোনার ডিমগুলো

আমরা সবাই ভাগ করে নিতাম। ডিমের স্বর্ণালী কুসুমটা পেত কর্তৃপক্ষ, সাদা রুপালী অংশটার ভাগ পেতো ওইসব কর্তাব্যক্তি বা চামচারা, আর আমরা পেতাম ডিমের বর্জ্য খোলাটা।

(১৩)

ছাত্রছাত্রীদের কথা না বললে অন্যায় হবে। কয়েকজন তো বেশ ভাল ছিল। আশা করি ভবিষ্যৎ জীবনে সফল ইঞ্জিনিয়ার হবে। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, অনেককেই আমি প্রথমবার দেখি শেষদিনে। সেদিন পরীক্ষা ছিল যে! আমি সাধারণতঃ হাজিরা নিতাম না। প্রথমতঃ সময় নষ্ট আর তার সাথে সিস্টেম আর হাজিরা খাতার বিস্তর গরমিল। মাঝে মাঝে দুয়েকদিন নিতাম। একদিন হঠাৎ হাজিরা নিয়েছি। ক্লাস শেষে ক্যান্টিন থেকে খাবার খেয়ে ফিরে আসছি। হঠাৎ একটি অচেনা ছেলে এসে বলল, "স্যার আজকের একটু অ্যাটেনডেন্সটা নিয়ে নেবেন? আপনি অ্যাটেনডেন্স নেবার সময় আমি একটু টয়লেট গিয়েছিলাম।" আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, "তোমাকে তো কখনও দেখিনি? ক্লাসে এসেছিলে?" চোখ নিচের দিকে নামিয়েই বলল, "হ্যাঁ স্যার। আপনি যখন ডিজাইন, ডিজাইন বলছিলেন আমি তো তখন আপনার সামনেই বসেছিলাম"

অবর্থ্য যুক্তি, ডিজাইনের ক্লাসে তো ডিজাইন ডিজাইন বলবই। ঢপ মারার ক্ষমতা দেখে ভাবলাম এ বড় হয়ে নিশ্চয় কিছু করবে। কিছু না হোক রাজনীতিতে নাম করতে পারবে। তাই রোল নাম্বারটা টুকে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আব্দার হলো, "স্যার আর একজন আমার সাথেই ছিল। ওর রোল নাম্বারটাও একটু টুকে নেবেন?" দেখলাম নেতা না হয়ে যায় না। তখন হয়ত কোনও কাজে আসবে। তাই দুটো নাম্বারই হাজিরা খাতায় তুলে নিলাম!

আরও দুজন তো পরীক্ষার দিনেও আসেনি। একজনের হয়ে তার কাগজপত্র নিয়ে কয়েকটি ছেলে এসে বলল, তার নাকি খুব জ্বর। যারা এসেছিলো তারা যেহেতু আমার পছন্দের তালিকায় ছিল, তাই কথাটা বিশ্বাস করে তার খাতাটা জমা করে নিলাম। আর একজন হাজিরও হয়নি, খবর পাঠাবার প্রয়োজনও মনে করেনি। পরে বিভাগীয় প্রধান বললেন, "কি করব? কলেজ বলবে পয়সা দিচ্ছে। পাস তো করাতেই হবে। তুমি সবার নম্বর দিয়ে তোমার মতামত সহ পাঠিয়ে দাও। দেখি

কি করা যায়।” সেইমতো ডাকযোগে কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়ে সব যোগ ছিন্ন করলাম। আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটি মুরোল।

(১৪)

পুনশ্চঃ এছাড়াও আরও দুটি ছোট ঘটনার কথা বলেছিল আমার দুই সহপাঠী। প্রথমজন বম্বের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে কর্মরত। বলেছিল ওর এলাকার এক বন্ধু, মাষ্টার ডিগ্রি পাশ করে পি এইচ ডির কাজ শুরু করার আগে মাঝে কিছুদিন একটা প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ায়। তার থেকে শোনা, প্রথম মাসে মাইনে পাবার পর ছাত্ররা তাকে ঘেরাও করে। দাবি সবাইকে ‘মাল’ খাওয়াতে হবে। সেই বন্ধু এরকম পরিস্থিতিতে আগে কখনও পরেনি। তবু সে জানতে চেয়েছিল, কেন মাল খাওয়াতে হবে। তার উত্তরে ছাত্রদের জবাব ছিল, আমাদের পয়সা লুটে কলেজ মালিক আপনাকে মাইনে দিচ্ছে, তাই আপনি যে মাল খাওয়াচ্ছেন সেটা আসলে আমরা আমাদের পয়সাতেই খাচ্ছি। তাই বেশি ‘কিচাইন’ না করে তাড়াতাড়ি মানিব্যাগ বের করুন। আর চাইলে আপনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। প্রায় তিন ঘন্টা ঘেরাও হয়ে থাকার পর, সেই বন্ধু মাল খাবার টাকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছিল। পরের দিন কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর তারা বিষয়টা চেপে যেতে পরামর্শ দেয়। কারণ ছাত্রদের নেতা ছিল এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার ছেলে। বলা বাহুল্য পিএইচডি এর চিঠি পাবার সাথে সাথে সেই বন্ধু কাউকে কোনো কিছু না জানিয়ে পড়ানো ছেড়ে পালায়। বর্তমানে সে এক নামকরা আই আই টির শিক্ষক। এখনো তাকে ঘটনাটা মনে করালে সে সেই ভয়াবহ তিন ঘন্টার কথা মনে করে ঘামতে থাকে।

পরের ঘটনাটি আমার প্রিয় একজনের কাছে শোনা। উনি ইঞ্জিনিয়ার, লেখক, কার্টুনিস্ট এবং আরও কিছু। খুব সুন্দর আর খুব ছোট হরফেও লিখে ফেলতে পারেন যে কোন কিছু। তিনি মাস ছয়েক এক কলেজে পড়িয়েছিলেন – বিবিএ বা ব্যাচেলর অফ বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশনের ছাত্রদের। বিষয়বস্তু ছিল 'ইন্ট্রডাকশন টু (বা ওভারভিউ অফ) মাল্টিমিডিয়া'। ছাত্রছাত্রীরা চিন্তিত ছিল বাজারে ওদের সিলেবাসের ওপর কোনো টেক্সট বই নেই বলে। আর ওদের মাস্টারমশাই (মানে উল্লিখিত ব্যক্তি) তো কোনও বই পড়ে শেখে নি, এমনকি বইয়ের নামও জানে না। পরীক্ষার

আগে ওদের দুশ্চিন্তা দেখে বলেছিলেন “ভয় নেই, আমি সব মেটিরিয়াল দিয়ে দেব।” সঙ্গে সঙ্গে এক ছাত্র বলেছিল “হ্যাঁ স্যার, খুব ভাল কথা হয়। একটু স্যার ছোট সাইজের কাগজে ছোট ছোট হাতের লেখায় লিখবেন স্যার।” মানে সরাসরি নোটটাই পরীক্ষাহলে টোকার জন্যে নিয়ে যাওয়া যাবে – মাইক্রো ফোটোকপি করার খরচ হবে না।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ #### “এই কাহিনী একটি ‘কাল্পনিক’ ঘটনার অনুলিখন। এই ঘটনার সাথে বাস্তবে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তির কোনভাবে মিল থাকিলে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং অনিচ্ছাকৃত। গল্পের সূত্রধরের সঙ্গে বাস্তবে লেখকের কোনো মিল নাই। গল্পের প্রয়োজনে কিছু সমসাময়িক বাস্তবানুগ ঘটনা, স্থান ও চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে মাত্র”। ####

চন্দ্রাহত

সঙ্গীতা দাশগুপ্ত রায়

এই ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি আর পোষায় না মাইরি। পুজোর মুখে ক'টা দিন একটু বেশি বিজনেস হবে ভাবলাম কিন্তু শালার বৃষ্টি প্রত্যেকবার হারামিপনা করে ধান্দার বারোটা বাজাবে... গজগজ করতে করতে নিজের দোকানের ওপর প্লাস্টিক বাঁধছিল মাধব। ফুটপাথ জুড়ে শুধু প্লাস্টিকের ছাউনি সার সার। ঘন্টাখানেক পর থেকে নিচে থিকথিকে খদ্দের দরদামে ব্যস্ত হবে। এদিকে রাস্তার ধার ঘেঁষে নিজের মাদুরটা বিছিয়ে পরিষ্কার একটা চাদর পেতে নিল বাসু। গোটা ছয়েক ডিজাইনের ছাঁচ, গোলা মেহেন্দির কোণ থালায় সাজিয়ে রেখে চারখানা টুল নামিয়ে নিল মাধবদার শায়া ব্লাউজের গাঁঠরির ওপর থেকে। নিজের একটা আর বাকি তিনটে খদ্দেরের। আর একটা ছোট থালায় একটা বজরংবলীর ছবি, পকেট সাইজের হনুমান চালিশা আর দু'প্যাকেট ভারত দর্শন ধূপ। ব্যাগ থেকে ডিজাইনের খাতাটুকু বার করেই একেবারে গুছিয়ে বসা। পাশাপাশি আরো অনেক গুলো মেহেন্দির দোকান। তিতু, মহেশ, বেচা, ভজু এরা সবাই মেহেন্দিওয়ালা। "তবে যাই বল বাপ, তোদের মধ্যে বাসুই হল জাত শিল্পী। আজ অব্দি ওর মুখ থেকে একটা মা বোন বেরিয়েচে কেউ শুনেছিস? শালা বাঘের বাচ্চা শিল্পী হল আমাদের বাসু..." এ কথা বুক ফুলিয়ে 'অ্যালাউন্স' করে থাকে মাধব মাঝে সাঝেই। বাঘের শিল্পী বাচ্চাকাচ্চার গল্প কোনদিন না শুনলেও এসব কথায় বাসু লাজুক লাজুক হাসে। ছিপছিপে চেহারায় হালকা না কামানো দাড়িতে আর চেক শার্টে লাজুক হাসি বেশ মানিয়েও যায়। কথায় দেহাতি টান এখন আর নেইই প্রায়। তবু বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গেলে বোঝা যায় বাংলা ওর মাতৃভাষা নয়। শুরুর দিকে মহেশ, বেচা, তিতুরা ওকে বিহারি বলে খ্যাপাতো খুব তবে মুখচোরা চুপচাপ হাসি দেখে দেখে ওরাও এখন ক্ষান্ত দিয়েছে।

এখনও কলেজগুলোর ছুটি পড়েনি। চার পাঁচটা সালোয়ার কামিজ আর জিন্স পরা মেয়ে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে যেভাবে হেঁটে আসছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে এরা ঠিক পুজোর বাজারে বেরোয়নি। বরং সামনের কলেজের মেয়েই হবে। এসব মেয়েরা ফুটপাথ ঘুরে রোজই জিনিসপত্তর দ্যাখে বেশি, কেনে কম। বসন্তর বুকে একটা ক্ষীণ আশা জাগে। একজনও কি মেহেন্দি পরবে না এদের মধ্যে? এ মাসে রোজগার যতটুকু বাড়বে সবই দেশে পাঠাবে ঠিক করে রেখেছে।

দেশ থেকে ছোটিমাঈর চিঠি এসেছে। লিখেছে দিওয়ালিতে এবার ঘরে কলি করাতে পারলে ভাল হয়। কিছু টাকা দরকার। তাছাড়া বড়িমাঈ বুখার নিয়ে বিস্তরা পাকড়েছে ক'দিন। চিঠিটা বার বার খুলে পড়ে বাসু। ছোটিমাঈ নিজে লিখতে পারে না। ডাবকু বা কিষনকে দিয়ে লিখিয়েছে হয়ত। কাল থেকেই মাঝে মাঝে নাকের কাছে নিচ্ছে চিঠিটা। মাঈয়ের হাথের আলুচোখার বাস আসছে না কি একটু কিংবা বিচালির বাস? ঘরে চাচা ওর রকম দেখে হেসে বাঁচে না। বলে এক খত্ জুড়ে গোটা গাঁওয়ের বাস লিবি নাকি তুই? সত্যই তো। তাছাড়া কত হাত কত বাক্স ঘুরে চিঠি আসে। গন্ধ থোড়াই থাকে? যত্ত বচ্পনা।

“এই যে ভাই, দেখি ডিজাইনগুলো আপনার...”

চোখ তুলে তাকায় বাসু। তিনটে মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

“বসুন, দেখাচ্ছি, সব রকম পাবেন” বলতে বলতে টুল এগিয়ে দেয়।

“না না, আগে দেখান। পছন্দ হয় কিনা দেখি... তারপর বসব।”

“বসুনই না দিদি। বসে না দেখলে ডিজাইন ভাল করে দেখবেন কি করে !” বাসু খদ্দের আটকাতে চায়

“সবার ডিজাইনই কম বেশি একই রকম... পরতে হলে এখানেই বোস, পরিষ্কার বেশ” – মিহি করে কথাক'টা বলে ওদের মধ্যে হরিণ হরিণ চোখের একটা মেয়ে এগিয়ে এসে টুল টেনে নেয়। পা দেখেই বোঝা যায় বড় বাড়ির যত্নে থাকা মেয়ে। চুরিদারের চুড়ির শেষে পরিষ্কার মোলায়েম পায়ের পাতা, নখে কালো নেলপলিশ আর রূপোর চুটকী আঙুলে। পাশে বেচা গান চালিয়ে

রেখেছে দিল ইয়ে দুনিয়াআআআ ইয়ে দুনিয়া পিত্তল দি... বাসুর অস্বস্তি লাগে । বড্ড জোরে কথা বলতে হচ্ছে গানটার জন্য –

“বলুন কোনটা পরবেন? এক হাতে না দু'হাতেই?”

বন্ধুদের মধ্যে একজন একটা ডিজাইন তুলে নিল “ময়ূরী, এইটা পরবি? দেখ তোর জন্য পেখম ডিজাইন”

“নাহ, আমি হাতের পাতায় পরব না...”

আইব্বাস ! ময়ূরী? হরিণের মত চোখের মেয়ের নাম? এত সুন্দর মেয়ে আর এত সুন্দর নাম... ক্যা মালুম, হয়ত কোন রাজকন্যাই হবে... বাসুর কেমন আচ্ছন্ন লাগে। চাচা এইজন্যে বলে সকালে পুরিভাজি না খেয়ে ছাতুর সরবত খেতে। পেট ঠান্ডা থাকে। দিমাগও ...

“হাতের পাতায় চাই না... আপনি শুধু আমার রিস্টের ওপর একটা ডিজাইন করে দেবেন?”

“অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু হাত খালি রেখে রিস্টের ওপর পরবেন? তার থেকে ...”

“যেমন বলছি ওমনিই চাই। পারবেন না?” স্পষ্ট জিজ্ঞাসায় কপালে ভাঁজ পরে।

হ্যাঁ পারব না কেন... বলতে গিয়ে কথা আটকে যায়। কেন যে সকালে পুরি খেল অতগুলো ! নির্ঘাত বদহজমী হয়েছে নইলে এমন অস্বস্তি হয়!

“এই নিন, এই ডিজাইনটা...” হাত এগিয়ে দেয় হিরণি, থুড়ি ময়ূরী

খুব যত্ন নিয়ে হাতটা ধরে বাসু। এ তো ব্যাগ চুর্ণি শায়া ব্লাউজের স্টল নয় ! এ হল আর্টিস্টের কাজ। কিন্তু আজ হাত ধরতে গিয়ে বোধহয় হাতটা কাঁপল একটু।

“আপনি পারবেন তো?” খুব নিচু গলায় প্রশ্ন করল মেয়েটা

“আরে পারব না মানে? এ সব ডিজাইন আমারই তৈরি ম্যাডাম ...” তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে কাজে মন দেয় বাসু।

"গুরু! সক্কাল সক্কাল বউনি করলি... চা খাওয়া ..." তিতু গলা তোলে

"বউনি তুই করিস নি নাকি রে শালা?" মাধবদা ওদিক থেকে হাঁক দেয়...

"তুমি মাইরি ডিম্যান্ডে চোনা ফেলো না তো ! বউনি না এই ... দরদস্তুর করে আসছি বলে কেটে পড়ল"... তিতু হাতের ভঙ্গী করে

গা ঘিনঘিন করে বাসুর। এত মুখখারাপ তার পোষায় না। ও কথাও কম বলে তাই। এদের সঙ্গে ওর একটা বড় ফারাক আছে কোথাও যেটা সব সময় টের পায় ও

পকেট থেকে ফোনটা বার করে দ্যাখে। চাচাকে একটা ফোন করে দেখবে? বাড়ি থেকে বেরনোর সময় জ্বর ছিল দেখেছে। বৃষ্টিতে স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে কাঁথাটুকু গায়ে টেনে শুয়েছিল মানুষটা। বেরনোর সময় পাশের ঘরে গনুর বউকে বলে এসেছে মাঝে মাঝে একটু দেখে নিতে উঁকি দিয়ে। সে দেখল কিনা কে জানে। চাচার নাম্বারটা টিপতে গিয়েও ছেড়ে দিল বাসু। বুড়ো মানুষ, হয়ত একটু ঘুমোচ্ছে। থাক। বরং আজ একটু তাড়াতাড়ি দোকান গোটাবে।

হিরণি নাকি ময়ূরী যাই হোক, মেয়েটা লছমী ছিল একদম। সারাদিনে আরও বেশ কিছু খদ্দের হল ও চলে যাওয়ার পরে। দুপুরের খাবার খেতে খেতে তিনটে। সামনের ফুটপাথে মনসা স্টলে বসে সাপটে ঝাল ঝাল ডিমের ঝোল আর ভাত খেল বাসু। চাচাকে ফোন করে খোঁজ নিল খেয়েছে কিনা কিছু। কিন্তু এই সবের সঙ্গে সঙ্গেই সারাদিন ধরে মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল দুটো চুটকী পরা ফরসা টুকটুকে পায়ের পাতা।

দু'দিন ধরে তিতু দোকানে আসছে না। পুজোর পর অনেক সময় অনেকে এক দু'দিন কামাই দেয়, ঝাঁপ তোলে না কিন্তু আসবে না যে, পাশের বন্ধুদের সেটা বলে যায়। তিতু কাউকেই কিছু বলে যায় নি। ফোনটাও বন্ধ। মনোজ আর বেচু সময় করে একবার ওর বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেবে কানে এল। বাজার আবার বেশ মন্দা। তাও খদ্দের আসে না আসে দোকান পেতে বসতেই হয় ...

"এই তো, এইটাই না তোর সেই দোকান?"

গলার আওয়াজে চোখ তুলল বাসু .. হিরণি... না না, ময়ুরী। পায়ের পাতায় চোখ নামায় একবার। সেই পা, নেল পালিশ পাল্টালে তো পা পালটে যাবে না? চুটকীদুটোও আছে...

"হ্যাঁ, এইটাই... তুই পরবি?"

"না রে, কনফার্ম করে নিলাম একবার। আজ সময় নেই বেশি হাতে"

"তাহলে বাদ দে... ইনি অনেকটা সময় নিয়ে যত্ন করে পরান। পরে আসিস..." এগিয়ে যায় গলার আওয়াজ, পায়ের ছাপ

মনে রেখেছে দোকানটা? ওকেও মনে রেখেছে? যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে পরায় বলল! হঠাৎ খুশি না ভাললাগা না ভগবান জানে কি সব হইচই মনের মধ্যে ঢুকে পরে তোলপাড় করে দেয় বাসুকে।

"কি রে? কি ভাবছিস? মশলা খাবি?" মাধবদা এগিয়ে আসে। চা পান সিগারেট কোন কিছুর নেশা নেই, শুধু একটু ধনে মৌরি ভাজা আনে কৌটো করে। মাঝে মাঝে মুখে ফ্যালে। সামনে কেউ থাকলে তাকেও দেয়

"দাও... হাত বাড়ায় বাসু..."

"তোর সঙ্গে একটা কথা আছে, একটু হেল্প লাগবে বুঝলি?"

"কি হেল্প? বল... পারলে করব..." এই মানুষটাকে কোন ব্যাপারেই না বলতে পারবে না ও।

"পারবি পারবি...আসলে হয়েছে কি, আমার ছোট বোনটার বিয়ে ঠিক হয়েছে"

"বাহ, দারুন খবর... খেটে দিতে হবে? বল সব করে দেব..."

"না না, তেমন বড় করে কিছু তো করতে পারব না। খাটাখাটনি সব বাড়ির লোকেরাই করছে। পরশু বিয়ে। তা বোনটার খুব শখ বিয়েতে মেহেন্দি পরবে দু'হাতে। তুই যদি..."

"আরে! এ তো আমার ডিউটি দাদা। খুব করে দেব... আমার তরফ থেকে বোনের বিয়ের গিফট রইল। তুমি ভেবো না..." বলতে বলতে বাসুর চোখে ভেসে ওঠে দূর দেহাতে ওর গাঁয়ের আঙিনা। দু'বছর গাঁয়ে যায় নি। ট্রেনভাড়া খরচ না করে সেটাও দেশে মানিঅর্ডার করে দিলে সংসারে কাজে দেয়। আসার সময় ছোট বোন গুলাবিটা ফ্রক পড়ত। ছোটিমাঈ চাচাকে নাকি লিখেছে গুলাবির শাদির রিস্তা আসছে। কিন্তু বাসু শাদি না করলে গুলাবিকে পার করবে কি দিয়ে ? সে চিঠির উত্তর মনে মনে ঠিকও করে রেখেছে বাসু। দহেজ নিয়ে বিয়ে করতে মন চায় না ওর। বিন দহেজে মেয়ে আনতে হবে মাঈকে। তাই আর একটু গুছিয়ে জমিয়ে আগে গুলাবিকে পার করেই নিজে শাদি করবে।

খুব সুন্দর করে সাজাল বাসু মাধবদার বোনকে। একদম গুলাবির মতই ছটফটে মেয়েটা। বার বার "বলে বাসুদা, আর কতক্ষণ?"

মেয়েরা বেশিরভাগই খুব ছটফটে হয় ... শুধু একটা মেয়ে, ফর্সা পায়ে রূপোর চুটকি, শান্ত চোখে ধৈর্য নিয়ে বসে বসে হাতে নক্সা আঁকায়... ভাবতে ভাবতে গাঢ় রঙের মধ্যে হারিয়ে যায় বাসু।

মাধবদার বাড়িতে পেটপুরে খাওয়া হয়েছে। চাচাকে বলেই এসেছিল ওর রান্না না করতে। কিন্তু ঘরে ঢুকে মনে হল চাচা নিজের রান্নাও করে নি। এঁটো বাসন রাখা নেই কোণে। খায়নি নাকি কিছু? চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়েই গেল বুঝি বুড়ো ... কাছে গিয়ে টের পেল বাসু, আবার জ্বর এসেছে।

"কিছু খেয়েছ না কি শুয়েই আছ এমনি করে? দাওয়াই নিয়েছ কি কিছু?"

"খেয়েছি মুড়ি একটু। দাওয়াই আনতে পারিনি। তুই কেমন শাদি দেখলি? এই নে, তোর চিঠি এসেছে ..."

"শাদি তো ভালই হল। একদম গুলাবির মত মেয়েটা। খালি ছটফট আর বিনা কারনে হাসি.. এত রাতে তো দোকান খোলাও পাব না। তুমি আমাকে একটা ফোন করলে না কেন? কার্ড ফুরিয়ে গেছে নাকি?"

"ধ্যুৎ, কথায় কথায় ফোন, ঘুমাব, দাওয়াই খাব এত বাবুয়ানি আমার আসে না রে... তুই পড় দেখি ভাবী কি লিখেছে। সব খবর ভাল তো?"

খবর ভাল মন্দ মেশানো। বড়িমাঈয়ের পা ফুলে গেছে। ডাগদার বলছে জল জমছে পায়ে। ছোটিমাঈয়ের শরীরও জুতের নেই। ডবকু গাঁয়ের ইস্কুলে পাশ দিয়ে আর পড়বে না বলছে। মাঈয়েরও তাই ইচ্ছে। ছেলে হিসেব করতে শিখে গেছে ঠিকঠাক। এখন কিছু টাকা জোগাড় করে হয় গাঁয়ে একটা গেঁহু বাজরার দোকান বসাতে পারলেই ভাল হয়। তার জন্য যা টাকা লাগবে তা বাসু ইচ্ছে করলেই জোগাড় করতে পারে। শহুরে কামাউ বেটা আছে মাঈয়ের। তার শাদিতে দহেজ যা পাবে তাতে কিছু না হলেও একটা দোকান দেওয়ার মত তো পেয়েই যাবে। আর যদি একটু বেশি খানদানি বহু আনতে পারে তো গুলাবির দহেজেরও চিন্তা নেই অত...... – পড়তে পড়তে থেমে যায় বাসু। দু'টো ফরসা চুটকি পরা পায়ের পাতা এসে চিঠিটা আড়াল করে ফ্যালে।

তিতুর খোঁজ করতে গিয়ে বাজে খবর নিয়ে এসেছে মনোজরা। বাড়িতে টাকাপয়সা নিয়ে ঝগড়া করতে করতে রাগের মাথায় নাকি বেরিয়ে গিয়েছিল তিতু। পরের দিন লাশ পাওয়া গেছে রেললাইনের ধারে। শোনা গেছে টাকার জন্য ভুলভাল পার্টির সঙ্গে বাজে কাজেও হাত মিলিয়েছিল। সেই পার্টির কেউ মেরে ফেলে রেখে গেছে নাকি নিজেই লাইনে মাথা দিয়েছে সে নিয়ে সন্দেহ করছে পুলিশ। হয়ত একদিন জিজ্ঞাসাবাদ করতে এখানেও আসতে পারে... বেচু আর মনোজ নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় এসবই বলাবলি করছিল। বাসুকে দেখে চুপ করে গেল।

অনেক দিন সেই পা দুটো দেখেনি বাসু। মুখটা যতবার দেখেছে তার থেকে বেশি দেখেছে পায়ের বাহার তাই হাত খালি থাকলেই মন জুড়ে পা দুটো ঘোরে ফেরে। নতুন একটা খেলাও শুরু করেছে বাসু মনে মনে। মাঝে মাঝেই সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া পা গুলো লক্ষ্য করে। সাদা পা,

কালো পা, ফাটা পা, আলতা দেওয়া পা, ছেঁড়া চটি পরা পা, হাই হিল পরা পা দেখতে দেখতে ভাবতে থাকে যদি এদের মধ্যে দিয়ে কখনও পেরিয়েও যায়, থামবে কি একবার সামনে এসে?

"যাক! আপনি আছেন আজ। আমি আগে একদিন এলাম, ছিলেন না তো!" গলা শুনে চমকাল বাসু। শাড়ি পরে এসেছে আজ সে। কালো বোধহয় সবচেয়ে পছন্দের রং। কালো শাড়িতে হাতির দাঁতের রঙের পাড়, কানে বড় ঝুমকো। হাসি মুখে সামনে দাঁড়িয়েছে এসে ... শুধু পা ঢেকে গেছে শাড়ির পাড়ে। তাই চিনতে পারেনি বাসু

"বসুন... টুল এগিয়ে দেয়... কবে এসেছিলেন? দোকান তো রোজই খোলা থাকে..." ভেঙে ভেঙে সাবধানে উচ্চারণ করে কথাগুলো

"না ছিলেন না। আমি ঘুরে গেছিলাম একদিন"

বাসুর হাত ঘামতে থাকে ... তর্ক করতে মন হয় না... হয়ত ভুল দোকানে গিয়েছিল। ডিজাইনের বইটা এগিয়ে দেয় বাসু।

"ডিজাইন দেখব না। আপনি মন থেকে এঁকে দিন। একদম এক্সক্লুসিভ। একটা টানা ছিমছাম ডিজাইন করে দিন যাতে সবাই দেখে জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে পরেছি"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাল করে আঁকিয়ে নে। এর পর দিল্লী থেকে স্পেশাল লোক এসে হাত ধরে জিজ্ঞেস করবে কোত্থেকে মেহেন্দি পরেছিস..." বলতে বলতে বাকি দুই বান্ধবী হেসে গড়িয়ে পরে – "চুপ কর তো! স্পেশাল লোক না হাতি..."

"ছি ছি... শেষে তুই একটা হাতিকে আমাদের জামাইবাবু বানালি!" মেয়েগুলোর খিল্লি শুনতে শুনতে বাসু কাঠ হয়ে যায়। জামাইবাবু? তার স্বপ্নের হিরণির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তবে? তাও অত দূরে!

"আবার! বাজে ইয়ার্কি বন্ধ কর তো!" চাপা ধমক দিয়ে ঝুঁকে পরে ময়ূরী... "খুব ভাল কলকা করে দেবেন ডার্ক করে। বুঝলেন?"

বাসুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে... এই নরম হাতদুটো কি আর কখনও ছুঁতে পারবে? হয়ত না... কিন্তু মেহেন্দিওয়ালার এত লোভ হবেই বা কেন? মনকে চাবুক মারতে মারতে নিজেকে উজাড় করে ছবি ফোটাতে থাকে বাসু।

"কি ঠিক করলি রে বাবুয়া? ভাবীকে উত্তর দিতে হবে তো কিছু? বেটা বড় হলে মায়ের তো বহু আনার সাধ হবেই। তাছাড়া টাকাও যা আসবে তাতে গুলাবির শাদি কিংবা ডবকুর গেঁহুর দোকান, কোন একটা তো হয়েই যাবে। শাদির উমর তো হয়ে গেছে কবেই। লিখে দিই তোর মত আছে?" ... চাচার কথা শুনতে শুনতে লুকিয়ে চোখ মোছে বাসু। দোকান বিকেলেই বন্ধ করে এসেছে আজ। ময়ুরীর দেওয়া টাকাক'টা বুকের পকেটে নিয়ে শুয়ে আছে সেই থেকে। এই ছোঁয়াটুকু ছাড়া আর কিছুই তো রইল না।

"ওঠ, খা কিছু... তবিয়ত বিগড়োলো নাকি তোর?"

"তুমি খেয়ে নাও। আমার ভুখ নেই আজ। আর মা কে লিখে দিও আমি নিজেকে বেচব না।"

"বেচবি না মানে? শাদিই করবি না? নাকি দহেজ নিতে আপত্তি তোর? দহেজ না নিলে শাদি কে দেবে? বলবে ছেলে খুঁতো আছে"

"হ্যাঁ, খুঁতোই আছে ছেলে। শাদি করতে চাই না..."

"কি বাজে বকছিস বাবুয়া? কি খুঁত আছে তোর?"

"খুঁত আছে তো... ছেলের দিল চুরমার হয়ে ভেঙে গেছে একটা মেয়ের পায়ের নিচে...দিল দুলহা খুঁতো না!" ফিসফিস করে বলে বাসু তারপর বালিশে মুখ গুঁজে মনে মনে ময়ুরীর মেহেন্দির খুশবুওয়ালা নরম হাত দুটো টেনে নিজের ভিজে গালের ওপর চেপে ধরে স্বপ্নের ঘোরে হারিয়ে থাকে সারারাত।

চিরদিনই তুমি যে......

সীমা ব্যানার্জ্জী-রায়

শ্রীচরণেষু মা,

বাবার কথা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তুমি সব সময় আমায় উৎসাহ দিয়ে এসেছ। বলেছ, তোকে আমার মতন হলে হবে না শ্রীতমা। তোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। সেই পথে যাবার একটা ক্ষীণ আলোর সন্ধান পেয়ে সেদিকে পা বাড়াচ্ছি। কুপথে যাচ্ছি না। তোমার শিক্ষা আর আশীর্বাদ আমার রক্ষাকবচ। যদি তা আমাকে রক্ষা করতে না পারে তাহলে, মা গঙ্গার কোল তো থাকবেই। ভয় নেই মা, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তোমার বুকে আবার ফিরে আসব। মাগো! এইজন্যে তোমায় অনেক কটু কথা শুনতে হবে বাবা, কাকুর কাছে। ভেঙে পড়ো না। দুজনে দুদিকে আমরা যে যুদ্ধে নেমেছি তাতে আমার সম্বল আমার মায়ের আশীর্বাদ- আর তোমার কাছে তোমার ঠাকুর। সকলকে বলো আমি মামার কাছে কাশিতে চলে গেছি। মামার সঙ্গে বাবার যা সম্পর্ক বাবা সেখানে আমার খোঁজে যাবে না জানি। তবু বলছি আমার খোঁজ করার চেষ্টা করো না, তার ফল আমার পক্ষে ভাল হবে না, মা। তোমায় এই কষ্টের মধ্যে ফেলতে হল বলে খুব খারাপ লাগছে, তুমি ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই মা। যেখানে থাকি প্রতিদিন রাত্রে আমার প্রণাম থাকবে তোমার ঐ দুটি পায়ে, আশীর্বাদ করো। যখন এ চিঠি তুমি পড়বে আমি তখন অনেক দূরে। প্রণাম নিও।

ইতি তোমার তমা

(২)

ভোরের আলো ভালভাবেই ফুটেছে। দিদি এখনও ডাকছে না কেন? বাবা ভাবতে ভাবতে উঠছেন মেয়েটা চা দিল না তো, এখনও? বাইরে এসে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে ডাক দিলেন... "তমা ও তমা।" ততক্ষণে তমার মা উনুন ধরিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বললেন

– তমা বাড়ী থেকে চলে গেছে।

চিৎকার করে উঠলেন দুলালবাবু -

- চমৎকার! এই না হলে মেয়ে? আদর দিয়ে মেয়েকে মাথায় করে রেখেছিলে, না? এখন মুখে চুনকালি দিয়ে ঘর ছাড়ল তো। কার সঙ্গে কুলত্যাগিনী হল শুনি? বাপ তো বাইরের লোক, মায়ের তো সব জানাই মনে হচ্ছে। জানিয়ে দিও ঐ পোড়ামুখ যেন আমায় দেখাতে না আসে। - ছি! ছি! শয়তানি এইভাবে সকলের কাছে আমাদের মুখ ডোবাল?

- আমায় যেন খুঁজতে যেতে বলো না। আজ থেকে সে আমার কাছে মরে গেছে।

এমন সময় স্ত্রী ঝর্ণা চায়ের গেলাস আর মুড়ির বাটি সামনে নামিয়ে ধরা গলায় বললেনঃ

- না, খুঁজতে তোমায় বলছি না। শুধু বলছি পাড়াজানানি গলাটা থামাও। দয়া করে সকলকে বলো... বিয়ে করবে না বলে মামার কাছে কাশিতে চলে গেছে। এই বলে যেই পিছন ফিরে পা বাড়াবেন...... স্বামী বললেন

- জানোই যদি কাশি গেছে, তবে বললে কেন বাড়ি থেকে চলে গেছে?

ঝর্ণা বললেন:

- কোথায় গেছে জানিনা, তবে ঐ কথা বললে সকলের কাছে তোমার মুখ রক্ষা হবে... তাই বলছি। আর কিছুর জন্য নয়... আমিও জানি না সত্যি ও কোথায় গেছে?

আগের দিন বাড়ির সব কাজ চুপচাপ সেরে ...অন্ধকার রাত্রে শ্রীতমা দুটো শাড়ি, জামা, সায়া, একটা খাতা পেন্সিল ও হাইয়ার সেকেন্ডারীর রোলনম্বরের কাগজটা একটা কাপড়ের ব্যাগে ভরে নিল। এইবার পা টিপে টিপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে গেল।

ভোরের প্রথম ট্রেনে বিরাটি পৌঁছে, বন্ধুর দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর বাড়ির কর্তা দরজা খুললেন। অত সকালে তমাকে দেখে অবাক।

- আজ মাসের পয়লা, আমার আসার কথা ছিল। আপনারা লোক খুঁজছিলেন তাই কাজ করব বলে এসেছি।

সেই মুহূর্ত থেকে 'তমা' হয়ে গেল 'শক্তি।' এই মিথ্যা পরিচয় কতদিন ওকে বইতে হবে কে জানে। পরীক্ষার ফল বের হতে অন্তত তিনমাস লাগবে, ততদিন কি এ মুখোশ টিঁকবে?

যাই হোক সেদিন থেকে শুরু হলো তার ঝিয়ের কাজ- -ঝাড়ামোছা, কাপড়কাচা, বাড়ির গিন্নিকে হাতে হাতে রান্নার জোগাড় দেওয়া। তমা বরাবরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। এ বাড়িতেও ওর হাতের ছোঁয়ায় পরিবর্তন শুরু হল। বইয়ের আলমারি-ইংরাজি আর বাংলা বই নিয়ে ভর্তি। এদিক ওদিক হেলে পড়ে আছে বইগুলো। কত দিন বোধহয় কেউ হাত দেয়নি। জানলার পর্দাগুলো নোংরা হয়ে আছে, কাচা হয়নি অনেকদিন।

বাবুকে জিজ্ঞাসা করল বইয়ের আলমারি ঝেড়ে মুছে দেবে কিনা। তিনি তো খুশি হয়ে মত দিলেন। রোজ একটা করে আলমারির তাক থেকে বই নামিয়ে ঝেড়ে মুছে রাখে। যেটা ছিঁড়ে গেছে তাতে মলাট দিয়ে তুলে রাখে। বাবুকে দিয়ে মলাট দেবার জন্যে কাগজ আনিয়েছে।

খুব ইচ্ছে করে পাশে বইয়ের নামটা বেশ লিখে রাখে... কিন্তু তাহলে তো ধরা পড়ে যাবে। চুপিচুপি দুপুরে আর সন্ধ্যায় যখন কাজ থাকে না, লুকিয়ে তখন বই পড়ে। ও পড়তে এত ভালবাসে। এত বই পেয়ে তো ভীষণ খুশি। লুকিয়ে পড়তে হয় এই যা অসুবিধা।

এক তলায় লন্ড্রি। পাশ দিয়ে দোতলা ওঠার সিঁড়ি। দোতলায় ছয়টা ঘর। রান্নাঘর, আর একটা খুব বড় ঘর তাতে ভাঁড়ার রাখার ক্যাবিনেট আছে একতলায়। আট জন বসার বড় টেবিল পাতা। চারদিকে আলমারিতে সব কাচের বাসনে ঠাসা।

রাস্তার দিকে একটা বড় জানলা দিয়ে রাস্তার জোর আলো ঘরে আসে। দোতলায় কোণের দিকে ঠিক লাইব্রেরির পাশের ঘরেই তমার শোবার জায়গা। সন্ধ্যায় সেই আলোতে বই পড়ে। পিছন থেকে দেখে লোকে ভাবে ও রাস্তা দেখছে। রাত্রে ওই ঘরেই ও শোয়, তাই রাতে সব কাজ সেরে ওর বই পড়তে বেশ সুবিধাই হয়।

শুধু ওর সব সময় ভয় মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে জানতে পারলে, ওকে যদি তাড়িয়ে দেন ওঁরা? তাহলে কি হবে, ভাবলেই ওর মুখ শুকিয়ে যায়। একমাস প্রায় হয়ে এল। বইয়ের আলমারির চেহারা পালটে গেছে, কাঁচের পাল্লা ঝকঝক করছে।

রোজ খুব ভোরে উঠে অন্য সব ঘর, সিঁড়ি ঝাঁট দেওয়া মোছা হয়ে যায়। বাবু দুধ আনতে যান, সেই সময় রান্নঘরে চায়ের ব্যবস্থা করে। দুধ জ্বাল দিয়ে চা করে গিন্নিমাকে ডাকে। ওনারা চা বিস্কুট খান আর ও তখন একটু মুড়ি খায় ওর ছোটবেলা থেকে অভ্যাসমত। তারপর জলখাবারের রুটি, পরোটা যা হয় ওকেও ওনারা তাই খেতে দেন। ওনাদের ব্যবহারে নিজেকে মনে হয় না বাড়ির কাজের লোক বলে। ওকে খুবই ভালবাসেন ওনারা।

আজ ওনাদের ছেলে আসবে । দুদিন আগে তিনতলার ঘর পরিষ্কার করতে হল। এতদিন বন্ধ থেকে ঝুল, ধূলোয় ভর্তি। পরিষ্কার করতে প্রাণান্ত। বিছানাপত্র রোদে দিল। খাটের তলা ঝাঁট দিয়ে একটা গলার ওম লেখা লকেট পেয়ে গিন্নিমাকে দিতে গিয়ে .. শুনল বছরখানেক আগে সেটা হারিয়েছিল। পয়সাকড়ি এদিক ওদিক পড়ে থাকলে ও গিন্নিমার হাতে দেয়। নিজে নিয়ে কিছু খায় না পর্যন্ত। ওর এই স্বভাবের জন্য ওনারা যে ওকে ভালবাসে সেটা ও ভালভাবে বুঝতে পারে।

দাদাবাবু এসেছে, তমা আড়ালেই থাকে। রান্নাঘর থেকে শুনল দাদাবাবু বলছেন, "তোমার মেডসার্ভেন্ট তো বেশ ভাল হয়েছে বাড়ির ভোল এক্কেবারে পালটিয়ে দিয়েছে দেখছি। সুন্দর করে

বিছানা পাতা, বাড়িতে পড়ার জামা কাপড় পর্যন্ত বের করে রাখা। চানের জন্য কলঘরে শ্যাম্পু, সাবান তোয়ালে রাখা। সব দেখে খুব ভাল লাগল।"

এতদিন পরে গলার লকেটটা পেয়েতো দাদাবাবু ভীষণ খুশি। আগে থেকে জেনে নিয়েছিল তাই ভোরবেলা যখন দাদাবাবু গল্প করছিল ও জলখাবারের জন্যে পরোটা, আলুচচ্চড়ি, চা করে ওদের খাবার ঘরে খেতে ডাকল। তখন মা ওকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ছেলের সাথে, "বুঝলি বুবাই? ওর নাম শক্তি, আমায় সব সময় সব কাজে সাহায্য করে। তোর বাপিরও সব ফুটফরমাস খাটে, বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে।"

দুদিন বাদে দাদাবাবু চলে যাবার সময় ওর হাতে ১০০ টাকা দিতে গেলে ও আপত্তি করায় উনি একটু অবাকই হলেন। যাই হোক জোর করেই টাকা দিলেন। গিন্নিমা আর বাবুকে বললেন:

- ওকে একটু পড়াশুনাও শিখিও তোমরা। খালি বাড়ির কাজ করিও না। ওর ভাল হবে তাহলে। ও মুখ নিচু করে টাকাটা গিন্নিমার কাছেই দিল। মাইনের টাকাও আছে।

গিন্নিমা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে! - বাড়িতে টাকা পাঠাবি না?"

হঠাৎ কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থেকে বলল, "মাসছয়েক হলে একসাথে পাঠাব।" তমা ভাবল ভগবান ঠিক বুদ্ধি জোগান ওর মুখে। একটা ফাঁড়া কাটল। তমা রোজ লিখে রাখে সব ঘটনা। সেসব কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে।

বুক ধুকপুক করে সময় কাটায়। লুকিয়ে শরৎ, বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার কত কি ওর পড়া হল। তমা ভাবে কি করে ওদের মন জয় করবে যাতে ওনারা ওকে ছাড়িয়ে না দে্ন।

এদিকে এনারা ভাবেন মেয়েটা চলে গেলে ওদের কি করে চলবে। কোন কিছু বলতে হয় না, সব কাজ নিজে থেকে করে। গিন্নি খুন্তিনাড়া ছাড়া কিছুই এখন করেন না। আগে শরীর মন কিছুই ভাল ছিল না, এখন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। স্ত্রীর পরিবর্তন কর্তার চোখে পড়ে, ভাবেন যে করে হোক মেয়েটাকে রাখতেই হবে। মাইনে বেশি চাইলেও সেটা মানতে হবে। আর ওনাদের মেয়ে নেই তো - কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে মেয়েটার ওপরে।

মেয়ের কোন ক্লান্তি নেই। সকালে কখন ওঠে আর কখন যে শুতে যায় জানতেও পারেন না। আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার তো তুলনা হয় না। এমনি করে দিন কাটছে। তমা খবরের কাগজে লুকিয়ে চোখ বোলায়। কবে যে রেজাল্ট বেরুবে? প্রায় তিনমাস হতে চলল। আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ “গেজেট গেজেট হাইয়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট জানতে চান কি?” বলে একটি ছেলের হাঁক শোনা গেল। তমা দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে ছেলেটিকে দাঁড়াতে বলল। গিন্নিমার কাছে গিয়ে বললঃ “মা একটা টাকা দাও, দাও ,দা-আও তাড়াতাড়ি দাও।”

- কি করবি টাকা নিয়ে? এই নে টাকা... কি যে করবে মেয়েটা টাকা নিয়ে, কে জানে?

টাকা হাতে পেলে কোন উত্তর না দিয়ে পাগলের মত নিচে গিয়ে একটা গেজেট কিনে নিয়ে এল। ওনারা দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন। প্রায় কাঁপতে কাঁতে এসে বাবুর কাছে রোল নম্বরের কাগজটা দিয়ে বললঃ

- বাবু দেখুন। দেখুন না? এই নম্বরটা পাশ করেছে কিনা।

ঐ শান্ত মেয়ে কি অস্থির হয়ে পাগলের মত করছে।

- এ কার রোল নম্বর রে, তুই কি করে পেলি, শ্রীতমা দাশ কার নাম?

- আগে বলুন পাশ করেছে কিনা?

- পাশ করেছে কি রে? এ তো দেখছি মেয়েদের মধ্যে ৮ নম্বরে আছে। এ কে রে ? তুই কি একে চিনিস?

মেয়ের দুচোখে জলের ধারা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর মাথায় হাত ঠেকিয়ে কাকে যেন প্রণাম জানাচ্ছে। ওনারা দুইজনে হতভম্ব হয়ে দেখছেন।

খানিকবাদে একটু শান্ত হয়ে ওদের দুজনকে প্রণাম করল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললঃ - গিন্নিমা, বাবু! প্রথমে আমি ক্ষমা চাইছি আমার মিথ্যা পরিচয় দেওয়ার জন্য। আমার এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

- আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না, তুই কোথায় পড়াশুনা করেছিস? কি তোর আসল নাম, পরিচয়? সব খুলে বল। আমরা তোকে আজ থেকে তাহলে মেয়ের মতন করে মানুষ করব। কি উপায় ছিল না? সব খুলে বল তো, তবে তো বুঝব...

আমি কসবা বস্তিতে থাকি - আগেই বলেছি আপনাদের। আমার বাবা বেঁচে আছেন। আমার বাবা রিক্সা চালান আর মা দুই বাড়ি ঠিকে ঝির কাজ করেন। আমার এক ভাইও আছে। সেও স্কুলে পড়ে। বাবা জোর করে আমায় দুই ছেলেমেয়ের বাবার সাথে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিলেন কিছু নগদ টাকার বিনিময়ে। এই বিয়ে করতে চাই না বলে বিয়ের আগের দিন মায়ের কথায় পালিয়ে এসেছি। আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই...বলে বাবুর দুই পা ধরে কেঁদে উঠল।

বাবা প্রায় দিনই রাত্রে এসে মাকে মারধোর করে, আমি তার প্রতিবাদ করতে চাই। আমি পড়াশুনা করে আমার মতন গরিব মেয়েদের শিক্ষা দিতে চাই। আমার মায়ের উৎসাহে আর আমার 'মুরলীধর' স্কুলের হেড দিদিমণির সাহায্যে আমি খুব কষ্ট করে পড়াশুনা করেছি। বাবু আমি আমার এক বন্ধুর কাছে জেনেছিলাম যে, আপনি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর। আমায় কি সুযোগ করে দিতে পারবেন না, বাবু? আমি যেমন আপনাদের কাজ করছি ...তেমনি করব আর সেই সঙ্গে আমার পড়াশুনা করব। বাবু দয়া করে আমায় এই সাহায্যটুকু করুন, একবার- হ্যাঁ- বলুন। ওদের দুজনের চোখও ভিজে উঠেছে। অবাক হয়ে ভাবছে...মেয়েটা কি বলছে? এতো ভালো মেয়ে ...

- বাড়ি থেকে পালিয়ে আপনাদের ঝি হয়ে থেকেছি শুধু এই দিনটার জন্য, বাবু। পাশ করলে বাবুকে হাতে পায়ে ধরে কলেজে পড়াশুনা করার ব্যবস্থা হতে পারে এই আশায়। জ্ঞানতঃ একটাই মিথ্যা বলেছি -প্রতিদিন এই মিথ্যা আমার মনে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। আজ আমি মুক্ত। আমায় ক্ষমা করে দিন আপনারা।

আজ আমি সব সত্যি বলছি -আমি এই রোলনম্বরের অধিকারী। আমি শ্রীতমা দাশ। আমি আমার হেড দিদিমণির প্রিয় ছাত্রী, আমি জীবনে কোনদিন সেকেন্ড হইনি। আমি আমার দুঃখিনী মায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে। মা-ই বলতেন জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে যেদিন পারবি...সেদিন ভাবব আমার মেয়ে চাওয়া সার্থক হয়েছে। আমি 'শক্তি' নই আমি 'শ্রীতমা'।

(৩)

আজ থেকে তুই হলি আমাদের মেয়ে শ্রীতমা--ব্যস এই হল তোর পরিচয়। তোকে অনেক উঁচুতে উঠতে হবে। আর আমরা জানি তুই পারবি সেটা...গিন্নিমা ছুটে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। তোর দাদা তো বলেই গেছে তোকে পড়াবার জন্য। একেবারে কলেজ ডিগ্রি নিয়ে তবে তোকে আমি তোদের বাড়িতে যেতে দেব রে মেয়ে...।

মাঝে তোর মাকে দেখতে ইচ্ছে হলে আমাদের বলিস। সাথে যাবি আর সাথে আসবি, বুঝলি?

হঠাৎ মেঘ কেটে যেমন সূর্যদেবের হাসি দেখতে পাওয়া যায় ঠিক তেমনি শ্রীতমার হাসিমুখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। আর সেই হাসিতে ছিল রৌদ্র-এর মধ্যেও ঝির ঝির বৃষ্টির মত...

ইস্কুলের ছড়া

লেখাঃ অতনু কুমার, ছবিঃ অনির্বাণ সেনগুপ্ত

(১)

দশানন দফাদার, অঙ্কের মাস্টার,
রেগে গেলে ছুঁড়ে মারে চক পেন ডাস্টার।
পা পিছলে সিঁড়িতে,
ঠ্যাং ভেঙে ফিরিতে,
একমাস কুপোকাৎ পায়ে নিয়ে প্লাস্টার।।

(২)

রামতনু রুইদাস, পড়াতেন ইতিহাস,
পুষতেন একজোড়া দুধসাদা রাজহাঁস।
দরজাটা খোলা পেয়ে,
গেল তারা পালিয়ে,
দুঃখেতে রামবাবু ফেলে দীর্ঘঃশ্বাস।।

(৩)

ভূগোলের দিদিমণি, মিস মণিমালিনী,
এমনিতে ভালো বটে, খেপলে চণ্ডিনী।
ক্রিস্বাস কারে কয়,
আখরোট কোথা হয়,
বলতে না পারলেই খাবে রামপিটুনী।।

(৪)

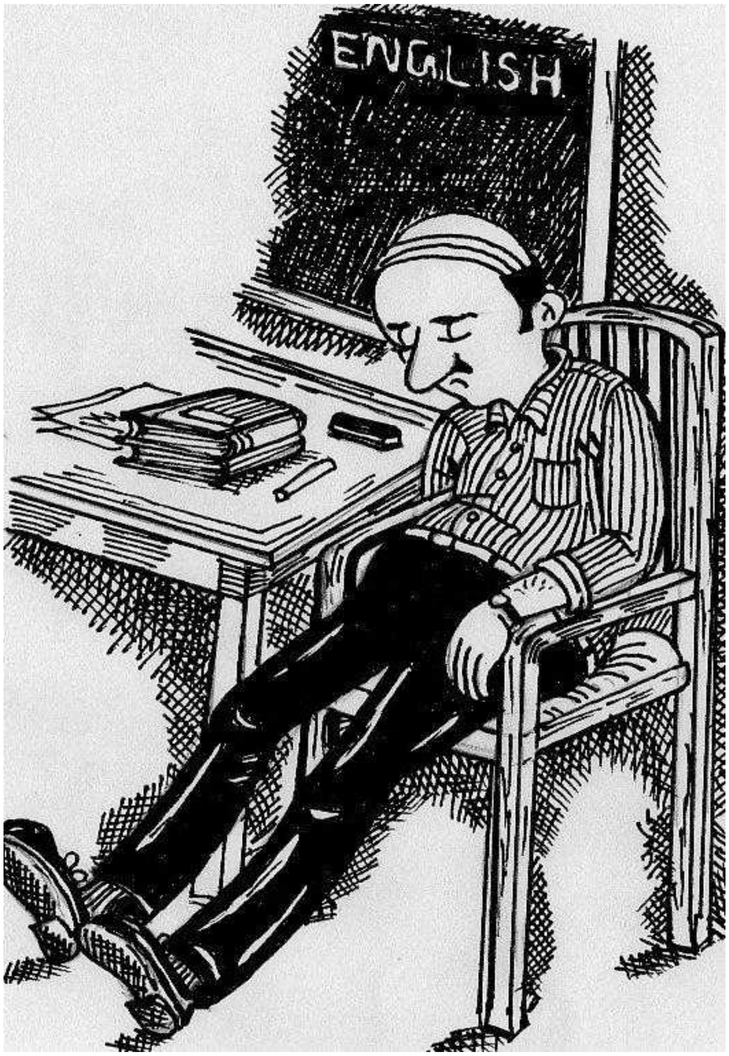

শ্যামলাল শিকদার, মাথাজোড়া টাক তাঁর,
ইংরেজি ক্লাসে বসে ঘুমোতেন বারবার।
চুল মোটে কয়গাছি,
তাই দিয়ে সাজি সাজি,
কত বৃথা চেষ্টা যে টাকখানি ঢাকবার।।

হাঁদা গঙ্গারাম

সিদ্ধার্থ দেব

এ অঞ্চলটা একসময় খুব ফাঁকা ছিল। বাবা যখন বাড়িটা করেছিলেন, তখন ফাঁকা জমিই ছিল বেশি। বড় রাস্তায়, বাস থেকে নেমে বাড়িটা দেখা যেত, মাঠ পেরিয়ে পৌঁছতে দু মিনিটও লাগত না। এখন ফাঁকা জায়গা প্রায় নেই, আর বড় রাস্তা থেকে অনেকটা ঘুরে আসতে হয়। প্রথমে এ পাড়ায় এসে, সোমেনের মনটা খারাপই হয়ে গিয়েছিল। ধ্যারধ্যারে গোবিন্দপুর যেন, চেতলা থেকে অনেক দূরে। কোনও বন্ধু বান্ধব নেই ধারে কাছে। বাসে উঠে স্কুল পৌঁছতে অন্ততঃ আধঘন্টা লেগে যেত। কিন্তু আস্তে আস্তে বেশ ভাল লাগতে শুরু করল।

একতলা বাড়ি; কিন্তু হাজার হোক নিজেদের, আর বেশ ছড়ানো আর অনেকটা বড়। দু-কামরার ভাড়া বাড়িতে বেশ চাপাচাপি করে থাকতে হত। কিন্তু এখানে নিজের একটা আলাদা ঘর আছে। রমুর ঘরও আলাদা। মা বাবার ঘরটা তো বেশ বড়, আর দুটো বাথরুম, মার আলাদা ঠাকুর ঘর। একটা হল, বসার ও খাওয়ার ব্যবস্থা। পাশে একটা রান্নাঘর। সামনে পেছনে বারান্দা।

রান্নাঘর নিয়ে মা একটু অখুশি ছিলেন প্রথম দিকে, একটু নাকি ছোট। এখন অবশ্য কিছু আর বলেন না। এখন যা বলার রুমা বলে, যদিও রুমাকে খুব একটা রান্নাঘরে ঢুকতে হয় না, বাঁধা রাঁধুনি আছে, বেশ ভাল রান্না করে। তবে সাদামাটা রোজকারের রান্না। বিশেষ কিছু করতে হলে রুমাকে ঢুকতে হয়। মা রান্না করলে পাপাই খুব উত্তেজিত থাকে। রুমারও অভিযোগ, কিচেনটা খুবই ছোট, হাঁটা চলার অসুবিধে। কথাটা অবশ্য খুব একটা মিথ্যে নয়। রুমার বাপের বাড়ি ভবানীপুরে, বেশ বড় আর সাবেকি, পেল্লায় রান্নাঘর। রুমার বাবা এবং কাকা দু-ভাই একসঙ্গে থাকেন। সচ্ছল অবস্থা।

গাড়িটা হঠাৎ থামাতে হল সোমেনকে। সামনে বিরাট লরি, ইঁট নামাচ্ছে। অবিনাশ বাবুদের বাড়িটা ভাঙা হয়েছে, ফ্ল্যাট হবে। একতলা বাড়ি ছিল, অবিনাশ বাবু সস্ত্রীক থাকতেন, এক ছেলে আরেক মেয়ে। ছেলে মেয়েরা সঙ্গে থাকে না। ছ-তলা ফ্ল্যাট বাড়ি হবে, জি প্লাস পাঁচ, প্রতি তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট, দশটি পরিবার থাকবে, উচ্চ মধ্যবিত্ত। কম পক্ষে ছ'খানা গাড়ি, বেশিও হতে পারে। অবিনাশ বাবু মারা গেছেন বছর তিনেক আগে, মাসিমা এখন ছেলের কাছে নয়ডাতে থাকেন। মেয়ে জামাই থাকে হায়দ্রাবাদে।

কোনও রকমে পাশ কাটিয়ে বাড়িবাড়ির সামনে পৌঁছল সোমেন। গেট খোলাই আছে, নিশ্চয়ই রুমা বাড়ি ফিরেছে। ধীরে ধীরে গাড়ি গ্যারাজে ঢোকায় সোমেন। এইবাড়ির সব কিছুই বাবার করা শুধু এই গ্যারাজটা বাদে, এটা সোমেনই তৈরি করিয়েছিল পাঁচ বছর আগে, এই লাল রঙের মারুতি-জেনটা কেনার পর।

গ্যারাজে ঢুকে প্রথমে গাড়ির মিউজিক সিস্টেমটা অফ করে সোমেন। এই একটাই শখ সোমেনের; নতুন নতুন গান শোনা। এই বাংলা ব্যান্ডগুলোর বেশ এলেম আছে। সাহসও আছে পরীক্ষা নিরিক্ষা করার। গান লিখে, সুর দিয়ে গান রচনার স্বপ্ন সোমেনের ছিল। চেষ্টাও করেছে কিন্তু সেসব প্রচেষ্টা কলেজ জীবনেই শেষ হয়ে গেছে।

বেল দেবার সঙ্গে সঙ্গে রুমা দরজা খুলে দেয়।

"ওয়েলকাম হোম জাঁহাপনা" – রুমা সবসময়েই বেশ হাল্কা মেজাজে থাকে। কোনও সমস্যাকেই গুরুত্ব দেয় না।

"পাপাই এসেছে?" জিজ্ঞেস করে সোমেন।

"ইয়েস স্যার, দাদুর সঙ্গে আড্ডা মারছে। তা সাহেবের এত মুখ ব্যাজার কেন?"

"ব্যাজার কোথায় দেখলে? কখন ফিরলে?"

"চারটেয় বাড়ি পৌঁছে গেছি। আজ শুধু দুটো লেকচার আর একটা স্টাফ মিটিং ছিল"

সোমেন সদর দরজার পাশে রাখা মোড়ায় বসে জুতো ছাড়ে, শু-র‍্যাকে জুতো রেখে চটি পায় দেয়। বাথরুমে ঢুকে হাতে মুখে জল দেয়, তোয়ালে দিয়ে মোছে। এই অভ্যাসটা সোমেনের ছোটবেলা থেকে। পেছনের বারান্দায় পাপাই মহা আনন্দে দাদু ঠাকমার সঙ্গে গল্প করছে।

“কিরে তোর টিউশন নেই আজ” সোমেন জিজ্ঞেস করে

“না বাপি, কোর্স শেষ, সামনের সপ্তাহে টেস্ট আছে”

“তা টেস্টের জন্য তৈরি হতে হবে না?”

“আঃ যাবে, এই তো একটু আগে স্কুল থেকে ফিরল” এক কাপ চা হাতে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে রুমা। হাত বাড়িয়ে কাপটা নেয় সোমেন।

“কি রে? অফিসে খোঁজ নিয়েছিলি?” বাবা জিজ্ঞেস করলেন

“হ্যাঁ বাবা, কিন্তু একটু অসুবিধে আছে। দেখি সর্ট আউট করা যায় কি না” সোমেন চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

“রমুর সঙ্গে কথা বলেছিস?”

“ঐ সেদিন কথা বললাম তো, তুমিও তো বললে, তারপর আর ঐ ব্যাপারে কথা হয়নি”

“মা, আজ তোমার সমিতি নেই” কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে সোমেন

“আজ? না তো, আমাদের মিটিং তো প্রতি মঙ্গলবার, খালি ভুলে যাস”

একটা সমস্যায় পড়ে গেছে সোমেন। বাবার ইচ্ছে ছেলেরা বাড়িটা দোতলা করুক। সোমেন অফিস থেকে লোন পাবে, সেই লোনের টাকায় দোতলার কাজ শুরু হোক। রমেনও কিছু দেবে। রমেন আবার আনোয়ার শাহ রোডে একটা লাক্সারি ফ্ল্যাট বুক করে বসে আছে। বাবা জানেন, কিন্তু ছোট ছেলের সাহায্যও আশা করেন। ছোট ছেলে দুবাইএ আছে যখন, তখন তো অসুবিধে হবার কথা নয়।

সোমেন লোন পেতে পারে যখন ইচ্ছে, কিন্তু তাতে এ বাড়ির কাজ করা সম্ভব নয় কারণ বাড়ি সোমেনের নামে নয়। লোনের টাকা নিতে হলে বাড়ির মালিকানা সোমেনকে হস্তান্তর করতে হবে আর সেটা সম্ভব নয়। সোমেন তাই ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়ার কথা ভাবছে।

রুমার আপত্তি আছে। এ পাড়ায় অনেক দিন হয়ে গেল রুমার, বিয়ের পর থেকে প্রায় উনিশ বছর। ভবানীপুর থেকে এসে প্রথম দিকে খারাপ লাগত না। বেশ খোলামেলা। প্রচুর আলো বাতাস। পাড়া পরশিরা সবাই সবাইকে চিনত। কিন্তু দিনে দিন কেমন ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে। পুরনো বাড়ি ভেঙে সব নতুন অ্যাপার্টমেন্ট হচ্ছে। রাস্তার মোড় গুলো চেনা যায় না। জোড়াতালি দিয়ে সব দোকান হয়েছে, পানের দোকান, চায়ের দোকান। বাইরে বেরোলে অচেনা মুখ, পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে হাসা তো দূরের কথা, তাকায় না অব্দি। তা ছাড়া আজকাল একটু আধটু চুরিচামারিও শুরু হয়েছে, আগে এসব ছিল না। সবাই মিলে কোথাও যাওয়া যায় না, বাড়িতে একজনকে থাকতে হয়। এখন মনে হয়, ফ্ল্যাটই ভাল, অন্ততঃ পাহারা দেবার জন্য সিকিউরিটির লোক আছে। বাড়ির সদর দরজায় তালা দিয়ে দারোয়ানকে জানিয়ে গেলেই হল।

তবে এ পাড়ার ফ্ল্যাট নয়। আজকাল কলকাতার নানা জায়গায় সব বড় বড় হাউসিং কমপ্লেক্স হচ্ছে। ফ্ল্যাটের সাইজ ভাল, তা ছাড়া সুন্দর ল্যান্ডস্কেপিং, সুইমিং পুল, ক্লাব এবং কমপ্লেক্সের ভেতরে শপিং সেন্টার। এসব জায়গায় ফ্ল্যাট নিলে অফিসের লোন সহজেই কাজে লাগানো যাবে, আর ফ্ল্যাট সোমেনের নামেই নেওয়া যাবে। এ নিয়ে সোমেনের সঙ্গে কথাও হয়েছে বার দুয়েক।

আজ রাতে আবার কথাটা তুলল রুমা।

"আজকের খবরের কাগজ দেখেছ?" রুমা জিজ্ঞেস করেছিল।

"হ্যাঁ দেখলাম তো, কেন?"

"প্রথম পাতার নীচে ডানদিকে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে কি?"

"ও, সেই উত্তরা আবাসন, মিনি শহর প্রকল্প?"

"চোখে পড়েছে তা হলে?" চোখ পাকাল রুমা।

"দেখ রুমি, তুমি জানো ইট ইজ নট পসিবল।"

"হোয়াই নট?"

"মা বাবা যতদিন আছেন, আমাদের পক্ষে এ বাড়ি ছাড়া সম্ভব নয়"

"তুমি বুঝতে পারছ না কেন? আমরা তো মা বাবাকে ফেলে যাচ্ছি না। তিন বেডরুমের ফ্ল্যাট নিলে সবাই মিলে থাকতে পারব"

"আর রমু এলে?"

"এখন এলেই বা কি অসুবিধে হচ্ছে? পাপাই দাদু ঠাকমার সঙ্গে শুচ্ছে, রমু, পিয়া আর রিঙ্কি পাপাইয়ের ঘরে"

"ওটা পাপাইয়ের ঘর নয়, রমুর ঘর"

"ঠিক আছে—তাই। কিন্তু ফ্ল্যাটেও সেই একই ব্যবস্থা হবে। তাছাড়া পিয়া বলছিল, সামনের বার এসে ওরা ওদের নতুন ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশ করবে এবং কিছুদিন ওখানেই থাকবে"

"হ্যাঁ রমু বলেছে আমাকে এবং আমাদেরও গিয়ে থাকতে বলেছে।"

"সোমেন, ভবিষ্যতের কথা ভাবো, - পাপাই বড় হবে, সংসার বাড়বে। ফ্ল্যাটটা করে রাখি, এখনই শিফট করার দরকার তো নেই"

"রুমি..."

"তুমি যদি রাজি থাক তো মা বাবার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি"

"নো ওয়ে..."

"ঠিক আছে, জো আপ কি মর্জি" এবার হাসে রুমা "একটা কথা মনে রেখ, আই অলওয়েস হ্যাভ মাই ওয়ে" সোমেনের চুলে বিলি কেটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রুমা।

কথাটা খুব একটা মিথ্যে বলেনি রুমা। ইউনিভার্সিটির দিনগুলো থেকেই রুমাকে দেখছে সোমেন। সোমেন তখন থার্ড ইয়ারে। ক্যাম্পাসে বেশ জনপ্রিয়, গান টান গায়। পড়াশোনায়ও ভাল, সবাই মোটামুটি চেনে। বন্ধুরাই খেয়াল করল প্রথমে ... ফার্স্ট ইয়ার আর্টসের একটা মেয়ে নাকি পাশ দিয়ে গেলেই তাকিয়ে থাকে সোমেনের দিকে, চোখের দৃষ্টি নাকি একটু স্বপ্নালু। একদিন ঘুরে তাকায় সোমেন বন্ধুদের কথায়। তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসেছিল রুমা। ঘাবড়ে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল সোমেন। তারপর যখনই দেখা হয়েছে ঐ একই ঘটনা। এক দিন ক্যান্টিনে বসে আছে সোমেনরা, পাশের টেবিলে রুমা বন্ধুদের সঙ্গে। একবার চোখাচোখি হতেই নির্লজ্জের মত তাকালো রুমা। মুখে একটা ভীষণ দুষ্টু হাসি। কান লাল হয়ে

গেল সোমেনের। এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটল, বন্ধুরা কেউই খেয়াল করল না। তাড়াতাড়ি একটা ছুতো করে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল সোমেন আর সেই মুহূর্তে রুমাও উঠে দাঁড়িয়ে পিছু নিল, সোমেনকে পাকড়াও করল লাইব্রেরির সামনে, একেবারে মুখোমুখি। সোমেন কিছু বোঝার আগেই রুমা সোজা সোমেনের চোখের দিকে তাকিয়ে দু হাত ঝাঁকিয়ে চাপা গলায় বলল “হাঁদা গঙ্গারাম” বলে গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল।

সেই শুরু। মাস ছয়েক পর রুমা একদিন সোমেনকে বাড়ি নিয়ে গেল, আলাপ করিয়ে দিল পরিবারের সবার সঙ্গে। সোমেনের মনে হল রুমাদের বাড়িতে ওদের ব্যাপারটা সবাই জানে এবং কারও কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু নিজের বাড়িতে রুমাকে নিয়ে যাবার সাহস হল না সোমেনের। সেই সঙ্কোচ, মা বাবা কি ভাববেন।

সুযোগটা নিজেই তৈরি করে নিল রুমা, ঠিক এক বছর পর। সোমেন তখন এম এস সি ক্লাসে, রমু এসে ভর্তি হল ফার্স্ট ইয়ারে, ইকনমিক্স অনার্স, ঠিক রুমার সাবজেক্ট। রুমা পাকড়াও করল রমুকে। লাইব্রেরির রেফারেন্স দিল, নোট তৈরি করে দিল। রমু বুদ্ধিমান ছেলে, বুঝল যে এই রুমাদি একদিন ওর বৌদি হচ্ছে। একদিন রমুর সঙ্গেই সোমেনের বাড়িতে হানা দিল রুমা। খাতির করে বসালেন মা। রুমাকে ভাল লেগে গেল মায়ের। তারপর থেকে প্রায়ই যেত রুমা, রমুর সঙ্গে। রুমা বাড়িতে আসবে আঁচ পেলেই কেটে পড়ত সোমেন। এক রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি ছিল রুমা, একসঙ্গে রান্না বান্না, খাওয়া দাওয়া, হৈ চৈ। সেদিন সোমেন সারাদিন বাড়ি থেকে হাওয়া, ওর নাকি গানের রিহার্সাল আছে। মা’র বেশ ভাল লাগতে শুরু করল রুমাকে, বেশ মেয়েটি। তবে বড়লোকের মেয়ে, সেরকম বড় বাড়িতেই বিয়ে হবে নিশ্চয়ই।

ক’দিন পর হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গেল রুমা।

“আমার ছোট ছেলেটি তো সব সময় তোমার কথা বলে মা” মা বললেন একদিন সস্নেহে

“আর বড় ছেলে? সে কিছু বলে না?” জিজ্ঞেস করে বসল রুমা।

“বড় ছেলে?” অবাক হলেন মা, “সোমু তোমাকে চেনে নাকি?”

"হ্যাঁ চেনে বৈকি, আপনাকে বলে নি কিছু?"

"কি বলবে?"

"সে কি? আপনার বড় ছেলে তো কথা দিয়েছে আমাকে"

"কি কথা দিয়েছে?"

"যে একদিন বরাবরের জন্য আমায় নিয়ে আসবে এই বাড়িতে!"

মা হাঁ করে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ রুমার কান মুলে দিয়ে বললেন, "তবে রে, ভেতরে ভেতরে এত? এতদিন বলিসনি কেন?" বলে জড়িয়ে ধরলেন সস্নেহে।

ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল। পুরো কৃতিত্ব রুমার, স্বীকার করে সোমেন। একটু কাঁচুমাচু হয়ে "থ্যাঙ্ক ইউ" বলতে গিয়ে বিরাট মুখ ঝামটা খেয়েছিল রুমার কাছে। সেই একই কায়দায় দু হাত ঝাঁকিয়ে বলেছিল রুমা, "হাঁদা গঙ্গারাম"।

তারপর তো বহু বছর হয়ে গেল। এখন তো মাঝে মাঝে সোমেনের মনে হয় সেই বুঝি বাইরের লোক। পারিবারিক সব সিদ্ধান্তে রুমার মতামতকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু কতগুলো ব্যাপারে সোমেন রুমাকে এখনও বাধা দেয়। রুমা বিরক্ত হয় কিন্তু রাগ করে না, রাগ করা রুমার স্বভাবই নয়। রুমা শুধু অপেক্ষা করে সুযোগের।

(২)

খুব ধুমধাম করে গৃহপ্রবেশ হল রমুর ফ্ল্যাটে। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন খুব প্রশংসা করলেন ফ্ল্যাটের। পিয়ার সঙ্গে মিলে প্রচন্ড খাটল রুমা। ফ্ল্যাট সাজাতে সাহায্য করল, পিয়ার সঙ্গে ঘুরল দোকানে দোকানে। ফার্নিচার কেনা হল, রান্নাঘর সাজানো হল। মা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তিন রাত থাকল সবাই মিলে। বেশ পিকনিকের মত সময় কেটে গেল। শুধু সদর দরজার নেমপ্লেটটা কারও নজর এড়াল না, -- রমেন এন্ড পিয়া দত্ত। পাপাইও খেয়াল করল। কেউ কিছু বলল না। বাবা শুধু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। রমুরা অবশ্য এক শনিবার রাত্রে এসে সবার সঙ্গে রবিবার সন্ধ্যে অব্দি থেকে গেল।

ছুটি কাটিয়ে ফিরে গেল রমুরা। ওরা সবসময় গরম কালেই আসে। সেই সময়টাই রিঙ্কির স্কুলে লম্বা ছুটি থাকে। এবার ঐ একরাতই ছিল সবার সঙ্গে, এ বাড়িতে গরমে ওদের বেশ কষ্ট হয়। ফ্ল্যাটে ওরা এসি লাগিয়ে নিয়েছে। এতদিন বাইরে থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। বাবা সুযোগইও পেলেন না, বাড়ি নিয়ে রমুর সঙ্গে কথা বলার।

অবিনাশ বাবুর বাড়িটা বেশ অনেকটা উঠে গেছে। মোড়ের মাথায় বিশ্বাসদের বাড়িও নাকি প্রোমোটার নিয়ে নিচ্ছে। বাবার নামে প্রায়ই চিঠি আসছে আজকাল, নানা রকমের প্রস্তাব। নগদ টাকা ও একটি ফ্ল্যাট, বা দুটো ফ্ল্যাট। কনস্ট্রাকশনের সময় অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা, ইত্যাদি। চেনা অচেনা দালালরা এসে দেখা করে বাবার সঙ্গে। বাবা প্রথম প্রথম হেসে উড়িয়ে দিতেন, তারপর রেগে যেতেন। এখন কেন যেন একটু বিষন্ন হয়ে পড়েন। বড় শখের বাড়ি এটি। সোমেনের লোনের কথাও আর জিজ্ঞাসা করেন না। মাঝে পাপাইকে বলেন, “দাদুভাই তুমি না এই বাড়িটাকে একদিন দোতলা করবে, কেমন?”

বাড়িতে ঢুকে গাড়ি পার্ক করে সোমেন। গানের সিডি বন্ধ করে। সুইচ ঘুরিয়ে গাড়ি বন্ধ করে। বাড়িটা একটু রং করাতে হবে। ভাল লাগবে দেখতে। বাবাও হয়ত খুশি হবেন।

আজ মা দরজা খুলে দিলেন। একটু অবাকই হল সোমেন। মা’র কাছে জানতে চাইলে করতে বললেন, রুমা পেছনের বারান্দায় বাবার সঙ্গে কি দরকারি কথা বলছে। পাপাই বাড়ি নেই। পরীক্ষা আপাততঃ শেষ, পাপাই বন্ধুদের সঙ্গে সুইমিংয়ে গেছে লেকের ক্লাবে। অনেকটা রাস্তা, বাসেই গেছে। পাপাইয়ের দুটোই শখ, সাঁতার আর টেনিস। কোনওটারই সুবিধে নেই পাড়ায়। ফিরতে দেরিই হবে।

হাত মুখ ধুয়ে, চটি পায়ে পেছনের বারান্দায় আসে সোমেন। রুমা উঠে দাড়ায়, নিজের চেয়ারটা ঠেলে দেয় সোমেনের দিকে, চলে যায় ভেতরে চায়ের ব্যবস্থা করতে। বাবার হাতে একটা লম্বা খাম, ভেতরে কিছু কাগজ পত্র।

“এটা দেখ” বাবার মুখে একটু মৃদু হাসি

“কি এটা?”

"দেখই না"

খাম খুলে সব কাগজ বের করে সোমেন। একটা চিঠি ইংরিজিতে। সঙ্গে কিছু বিল্ডিং ও ফ্ল্যাটের প্ল্যান। ওপরে লেখা 'উত্তরা আবাসন, দ্বিতীয় পর্ব'। অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকায় সোমেন।

"এটা তুমি কোথা থেকে পেলে?"

"আজ ডাকে এসেছে। ভাল করে পড়ে দেখ। বেশ ইন্টারেস্টিং"

"এ দিয়ে আমরা কি করব? এ তো ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপন"

"পড়ে দেখ না। এগুলো অর্ডিনারি ফ্ল্যাট নয়। সঙ্গে অজস্র সুযোগ সুবিধে আছে। আমার ধারণা ছিল না। প্রচুর ফাঁকা জায়গা। খেলার ব্যবস্থা। আর জানিস তো সুইমিং পুল আছে, টেনিস কোর্টও আছে। পাপাইকে বাসে করে লেকে যেতে হবে না ভিড়ের মধ্যে। কমপ্লেক্সের ভেতরেই সব ব্যবস্থা আছে।"

"এসব কমপ্লেক্সে এই সব সুবিধে সব সময়ই থাকে বাবা। রমুর ফ্ল্যাটে দেখ নি?"

"রমুরটা তো লাক্সারি ফ্ল্যাট ছিল। কিন্তু এটা তো বলছে মিডল ইনকাম গ্রুপ। আর দামও দেখলাম মোটামুটি নাগালের মধ্যে।"

"তুমি কি করতে চাও বাবা?"

"ভেবে দেখলাম, এই বাড়িটা দোতলা করতে গেলে তো তোকে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে হবে। তারপর প্রত্যেক মাসে তোর মাইনে থেকে লোন শোধ দিতে হবে। তার থেকে বরং এই বাড়িটা প্রোমোটারকে দিয়ে সেই টাকায় ফ্ল্যাট নেওয়া যেতে পারে। যদি টাকা একটু কম পড়ে, তুই বরং একটু কিছু লোন নেয়ে নিস।"

"না বাবা, এই বাড়ি বিক্রি করা ঠিক হবে না। এই বাড়িতে আমরা, আমি, রমু বড় হয়েছি"

"ধ্যুর, এক জেনারেশনের বাড়ি, বড় বড় কয়েক পুরুষের বনেদি বাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া ঐ সব কমপ্লেক্সে সিকিউরিটিও আছে। এখন তো আমরা সবাই মিলে বেরোতে গেলে সব দরজায় তালা, কোলাপ্সিবল গেট তার ওপর আরও গোটা কয়েক তালা লাগিয়ে বেরোতে হয়। শোন, ভেবে দেখ। আমি কিন্তু তুই আসার আগে রুমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছি।"

"কি বলল রুমা?"

"রুমা এই বাড়ি প্রোমোটারকে দিতে চাইছে না। ও চাইছে দরকার হলে তুই অফিস থেকে লোন নিবি। আমি তো আজ জানতে পারলাম তুই অফিসের লোন কেন এ বাড়িতে ইনভেস্ট করতে পারছিস না। আমাকে বুঝিয়ে বললেই পারতিস।"

"বলব ভাবছিলাম। কিন্তু আর বলা হয়নি। তুমি কি সিরিয়াস?"

"হ্যাঁ রে, বেশ কদিন ধরে ভাবছি। আর দেখছিস না, চারিদিকে সব পুরনো বাড়ি উধাও হয়ে যাচ্ছে, এ পাড়ার চেহারাই তো পালটে গেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সোমেন। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে রুমা এসে দাঁড়ায়,

"বাবা, এখন থাক, আপনারা দুজনে ধীরে সুস্থে চিন্তা ভাবনা করে ডিসিশন নেবেন"

সোমেন রুমার হাত থেকে চায়ের কাপ নেয়,

"একটু ভেবে দেখি বাবা, আর যদি ফ্ল্যাট বুক করি তবে লোন নিয়েই করব, এ বাড়িতে হাত দেব না"

"ঠিক আছে, যা ভাল বুঝিস কর" বাবা উঠে ভেতরে চলে গেলেন।

রুমা বসে। তাকায় সোমেনের দিকে। চোখের দৃষ্টি একটু যেন রহস্যময় ...

"কেয়া খেয়াল হ্যায়" – ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল রুমা।

"আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। বাবা এত সহজে?" একটু হতভম্ব দেখায় সোমেনকে।

"বিজ্ঞাপনটা বেশ খুঁটিয়ে পড়েছেন সারা দুপুর ধরে। আমি কলেজ থেকে ফেরার পর আমায় ডেকে পাঠালেন"

"তারপর? তোমার মতামত চাইলেন?"

"না, বাবা নিজের মত জানালেন, আমি জাস্ট সায় দিয়েছি"

"এখন কি করা?"

"কেন? ফর্মটা ফিল কর, একটা চেক লেখো অ্যাডভান্স হিসেবে। তারপর ক্যুরিয়ার করে পাঠিয়ে দাও, সিম্পল!"

"তারপর?"

"তারপর অফিসে লোনের জন্য অ্যাপ্লাই কর। এখন তো কোনও অসুবিধে নেই, তোমার নামেই বাড়ি হবে"

"শুধু আমার নামে কেন? আমাদের জয়েন্ট নামে হবে" চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখে সোমেন।

"নো প্রবলেম, জ্যায়সী আপ কি মর্জি" উঠে দাঁড়ায় রুমা, চায়ের কাপটা তুলে নেয়।

"একটা কথা বুঝতে পারছি না রুমি" একটু বিভ্রান্ত দেখায় সোমেনকে।

"কি হল আবার?" রুমা ভেতরে রওনা দিচ্ছিল, সোমেনের কথা শুনে দাঁড়াল

"বাবাকে হঠাৎ এই বিজ্ঞাপনটা পাঠাল কে? প্রোমোটার? খামে তো কোনও প্রেরকের ঠিকানা দেখলাম না"

এবার হাসে রুমা, সেই রহস্যময়ী হাসি,

"সাধে কি বলি, হাঁদা গঙ্গারাম" মুখ ঝামটা দেয় রুমা

"তার মানে?" সোমেন হাঁ হয়ে যায়

"বলেছিলাম না, আই অলওয়েজ় হ্যাভ মাই ওয়ে"... ভেতরে চলে যায় রুমা, মহারানির ভঙ্গিতে...

মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে সোমেন।

অধরা-মাধুরী ---------

সৌমেন স্যান্যাল

ডাক্তার মুখার্জির কথা :--

গাড়ি থেকে নামার পরেই একটা আশ্চর্য আবেগ চেপে ধরে আমাকে। এই হসপিটালে নেই নেই করেও এগারো বছর হয়ে গেল আমার......এমন অদ্ভুত আর অলীক মানুষ আমি দেখেছি এখানে যে লিখতে গেলেও ঢের সময় লেগে যাবে। হরি সিং গাড়ি পার্ক করতে গেছে। ফিরে আসবে আমার লাঞ্চ বক্স নিয়ে। আমি অবশ্য দাঁড়াই না তার জন্যে। এগিয়ে যাই আমার গন্তব্যে, আমার চেম্বারে। সেখানে আশালতা অপেক্ষা করে থাকে, আমি ঢুকলেই আমার হাতে পেশেন্ট লিস্ট আর তাদের চার্ট ধরিয়ে দেবে। আমি একবার চোখ বুলিয়েই উঠে পড়ব ওয়ার্ডের দিকে ...... জানে আশালতা। আমি একটি মুহূর্ত অপেক্ষা করি না নিজের বিশ্রামের জন্যে, একথা পেশেন্ট পার্টিও জেনে গেছে আজকাল। অবশ্য এখানে সময় চলে বড় ধীর গতিতে.... কেউ-ই তেমন আসে না সহজে। মেন্টাল হসপিটালে কারও আসার বিশেষ দরকার পড়ে না টাকা দিতে আসা ছাড়া। এখানকার বাসিন্দাদের কেউ বোধ হয় মানুষ বলেই ভাবে না...... যেন অলীক মানুষ এরা সব। দিনের আলোতেও এরা প্রায়ান্ধকার ধূসরতায় অতিবাহিত করে সময়। আত্মীয়রা টাকা দিয়েই খালাস। ‘পাগলের” তত্ত্বতালাশ আর কে করে!! আমি এখন করিডর দিয়ে হাঁটছি, সামনে একটি প্রশস্ত বারান্দা.... তার শেষে মেয়েদের ওয়ার্ড। সব বয়সী মেয়েরাই ওখানে থাকে। পুরুষদের ওয়ার্ড অন্যদিকে। আমি প্রথমে মহিলা ওয়ার্ডেই যাই ভিজিটে। দরজায় এসেই গতি কমিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করি আমি। অনেক দিনের অভ্যেস। আজও চলছে। আমি বিশ্বাস করি ডাক্তারের আত্মস্থ মুখমন্ডল রোগীর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বাধ্য। আমি তাই যাবতীয় দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে হাসিমুখে পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ি ওয়ার্ডে। ওই তো কাননবালা, মৃন্ময়ী, অপা... ওরা আমাকে ভালভাবেই চিনতে পারে। নমস্কার করলে প্রতি নমস্কার জানায়। আবার কেউ কেউ চুপটি করে উদাস চোখে চেয়ে থাকে জানালার বাইরে।

কখনো এদের কারো কারো চোখে জলের নিঃশব্দ ধারা ফুটে ওঠে। আশালতা তখন ন্যাপকিন দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয়। জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেয়। কখনো জল খেতে পারে সে উদাসিনী, কখনো পারে না। ঠোঁট উপচে গড়িয়ে পড়ে জল, চোখের ধারার মতই। ধীরে ধীরে শুইয়ে দেয় আশালতা, সে অবস্থায় বসে থাকা বিপজ্জনক, পড়ে যেতে পারে রোগী। আরেকটু এগিয়ে যাই আমি......নিজেকে অধিকতর দায়বদ্ধ বোধ করি কাউকে কাউকে দেখে......যেমন বাংলাদেশি সেই আটত্রিশ বছরের মা'টি। যখন নিয়ে আসা হয় এক বছর আগে, নিজের কোন পরিচয়-ই দিতে পারেনি সেই বউটি। হাতে ও কপালে এয়োস্ত্রীর চিহ্ন দেখে বিবাহিতা বলে অনুমান করা যায়। আমরাই নাম দিয়েছিলাম পারমিতা। আঁচলে কিছু বাংলাদেশি নোট দেখে অনুমান করা হয়েছিল যে সে মেয়েটি বাংলাদেশের মেয়ে। কি ভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এখানে চলে এসেছে তা হলফ করে বলতে পারে না কেউ-ই। আমার ভীষণ মনে হয় যে তার বাড়ির লোকজন হয়ত তাদের দেশে খুব খোঁজাখুঁজি করেছে, হয়ত তারা এখনও খুঁজে চলেছে তাদের বাড়ির বউ কে। আমি খুব বেশি করে চাই এই মেয়েটির স্মৃতি ফিরে আসুক। নিজের গ্রামখানির নাম যদি সে বলতে পারে......তবে তাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব। ওকে দেখলেই তাই আমার গ্রে সেলগুলো উত্তেজিত হয়, অ্যাড্রিনালিন ছুটতে থাকে সারা শরীরে। ওকে ভাল করে তোলা আমার কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। ধীরে ধীরে একেবারে কোণার বেডের কাছে চলে আসি আমি। চার মাস আগে বিবস্ত্র অবস্থায় একটি বড় রাস্তার ধারে পাওয়া গেছিল বিছানায় উবু হয়ে বসে থাকা এই মহিলাকে। বিয়াল্লিশ খানেক বয়স হবে। এখানকার নাইটি পরে রয়েছেন এখন, আমরাই দু'সেট কিনে দিয়েছিলাম। কিন্তু ইনি সাধারণ পাগল নন। দিব্যি সংসারের নানা কথা বলতে শুরু করেন। আমি জানি যে আমি স্টেথো বসালেই শুরু হবে ওনার বকবক... আর আমাকে হাসিমুখে তা শুনতে হবে আর মাথা নাড়তে হবে। আমি দেখতে শুরু করলেই এই মহিলাটি বলতে থাকেন তাঁর অতীত গৌরবের উপাখ্যান, তাঁর সংসারের পদাবলী। খুব একটা আমল দিতাম না আগে, আজকাল আমল দিতে হয়। উনি তাঁর বাবার পরিচয় দিতে গিয়ে এক প্রথিতযশা গায়কের নাম করেন আর বলেন যে তিনি-ই তাঁর স্বর্গত পিতৃদেব। নিজের নাম বলেছেন মনোবীণা। বাবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নাকি বিয়ে দিয়েছেন এক অভিনেতার সঙ্গে। সন্তানের নাম নাকি রাহুল। আজ মৃদু হেসে সামান্য পরীক্ষা করে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি

হেসে বললেন, "জানেন ডাক্তারবাবু, রাহুল আজ বিকেলে আসবে।" আমি একটু ভাল করে শোনার ভঙ্গি করতেই তিনি কলকণ্ঠে বলে উঠলেন, "আসলে ওর বাবাই আনবে ওকে, একা কি আসতে পারে!! এখনো ছোটোই তো!!" আমি শুনি......অবচেতনের এই সুখ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে চাই না। তিনি বলতেই থাকেন, আমি চোখ নামিয়ে ওষুধ লিখি, একটু বিদায় জানাবার ভঙ্গি করি। শেষ মহিলা পেশেন্টকে আরো একবার ঘাড় নেড়ে বিদায় জানাই, তারপর ধীর পায়ে পুরুষ ওয়ার্ডে ঢুকে যাই। ডাক্তার হলেও আমার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এক বেদনাবোধ কাজ করে চলে সারাক্ষণ। কি এক উনপঞ্চাশ বায়ু যেন বয়ে চলেছে এখানকার ভর্তি থাকা নর-নারী দের মাথার ভেতর দিয়ে......মাঝে মাঝে অবোধ্য মনে হয়। মাঝে মাঝে মন ছুটি চায় এসব থেকে। মাথার ধূসর ও সাদা কোষগুলির অতিসক্রিয়তা বা আধানিষ্ক্রিয়তা আমাকে মাঝে মাঝেই বিস্মিত করে। সামান্য গড়ে ওঠার হেরফেরে কত কি না ঘটে যায় এই পৃথিবীতে। যে মানুষটা অন্য কিছু হতে পারত, সে আজ ভাগ্যের ফেরে কোথায় পড়ে আছে! এদের সিটি স্ক্যানে ধরা পড়ে স্নায়ু আর নার্ভের গোলমাল। কিন্তু মানবিক মূল্যবোধগুলি তো ধরা পড়ে না এইসব স্ক্যানে। মানুষ কে শুধুই এক্স-রে দিয়ে বিচার করা যায়? তার মনের সজল কোণগুলি ছোঁয়া যায় অত্যাধুনিক এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায়? যায় না.......আর এই পরাভব আমায় ব্যথিত করে চলে প্রতিনিয়ত। শুধুই তাদের কিছুটা ওষুধ আর অনেকটাই ভালবাসা দিয়ে সুস্থ করে তোলার ইচ্ছেটুকু সজীব এক মুঠো ঘাসের মত নির্মল আনন্দ হয়ে বেঁচে থাকে মনের গভীরে। আমি এখন পুরুষদের ওয়ার্ড ঘুরে এসে বসেছি আমার চেয়ারে। ভাবনাগুলো পাক খাচ্ছে মনের ভেতরে। আজ কোন কারণে সুলতাও যদি এমন হয়ে পড়ত! ঘরের একখণ্ড ছবি যেন ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে.... বুবুন, আমার ছেলে, এ ঘরে ও ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মা কে... তার মা, যাকে সে এক মুহূর্ত কাছছাড়া করত না ছোটবেলায়... সে যদি আজ কোন মানসিক হাসপাতালে ভর্তি থাকত? আর আমি সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ধীর পায়ে আসতাম বিকেলের দিকে, ঘোর ঘোর মায়াবি কনে দেখা আলোয় সে চিনতেই পারত না আমাদের... এখানকার রোগিনীরা তো পারে না চিনতে!! আলো নেভা চিনে ফানুসের মত তাকাতো সে... আমাদের দুজনের দিকে? না আমাদের চোখ দুটি পেরিয়ে কোন দূর দিগন্তে? কি খুঁজে বেড়াতো সে আপন মনে... প্রিয়জনকে ভুলে গিয়ে... মাথার জটিল কোষে কোষে শুধু বাধাপ্রাপ্ত

হয়ে প্রিয়জনদের চিনতে ভুলেই যেত.... আর আমরা.... তার প্রিয়জনেরা... আমরা কি করতাম সুলতা? আমরা কি বাড়ি ফিরে যেতে পারতাম? ওই মনোবীণার মত রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে কোন এক জায়গায় পৌঁছে ভুলেই যেতাম কোথা থেকে এসেছি... কোথায় যাব... অচেনা এক দিকশুন্যপুরে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়তাম দুজনে... দিক খুঁজে বেড়াতাম শুধু... সুলতা কে ছেড়ে আমরা কেউ-ই তো কখনো থাকিনি... খুঁজে পাচ্ছি না যে সুলতা... কোথায় হারিয়ে গেলে?... কোথায় তুমি... কোথায়??

'স্যর... স্যর...' ধীরে ধীরে সাড় ফিরে আসে আমার... আশালতা? হ্যাঁ... সেই তো... কি আশ্চর্য! এতোটা আত্মবিস্মৃত তো আমি কখনও হই না... কি হল টা কি আজ!! চেয়ার থেকে বেসিনে যাই... মুখে চোখে জল দিয়ে তোয়ালে দিয়ে আস্তে করে চেপে চেপে মুছি জলকণা... একটা ভয় চেপে ধরেছে আমাকে... নাঃ... মনোবীণার কাউন্সেলিং আবার করব আমি... যদি কিছু সূত্র পাই। আশালতা সব বোঝে.... জানে, আমি আজ মর্মের গভীরে ঢুকে গেছি। তাই বিরক্ত করে না। কফিটা ঢেলে দেয় যত্ন করে, কেক সাজিয়ে দেয় প্লেটে। আমি কেক চিবোতে চিবোতে ডুবে যেতে চাই অন্তহীন ধূসর সমুদ্রে.... জানে আশালতা.... আজ অনেকক্ষণ ডাক্তারবাবু পড়বেন, লিখবেন নোটস। সে ধীরে ধীরে দরজা ভেজিয়ে চলে যায় নিজের টেবিলে।

মনোবীণার কথা :--

আজ আমাকে আবার স্নান করিয়ে দিয়েছে ওরা। আমি এত করে বললাম যে বেড়াতে যাব আজ রাহুল আর পার্থর সঙ্গে। চুল না শুকোলে কি করে বাঁধব মনের মত করে? ধুত... ভাল্লাগে না। ওরা বোঝেই না আমার প্রয়োজনটা। পার্থ ফাঁপানো চুল পছন্দ করে, দুদিকে কান ঢেকে গড়িয়ে নামবে চুলের ঢল.... কাঁধ বেয়ে.... ঘাড়ের পেলবতা ঢেকে.... পিঠের ওপরে আছড়ে পড়বে চুলের গোছ.... পার্থ.... তুমি কি সুন্দর করে চুলগুলি হাতে নিয়ে আদর করতে চুলে.... চুলে চুমু খেতে বার বার.... পার্থ.... দেখ, ওরা চুলগুলো কেটে দিয়েছে....এ খন কিসে চুমু খাবে তুমি বল.... ওরা কিছু বোঝে না গো.... ওরা কি করে জানবে বল সেই রঙিন ভালবাসার

দিনগুলোর কথা.... তোমার হাতে হাত দিয়ে সাত পাকে ঘোরার শপথ.... বাবার সজল চোখের আকুতি.... আমার শ্বশুরমশায়ের বাবার হাত ধরে সান্ত্বনা.... যখন বেরিয়ে এলাম বাড়ি ছেড়ে, মা বাবার কি কান্না!! তারপর সুখের সমুদ্রে স্নান... রাহুল চলে এল আমাদের মধ্যে... কত জমাট সুখ!! বল পার্থ? তোমার দুষ্টুমিতে পাগল হয়ে যেতাম... তোমার সঙ্গে রূপোলি মায়াভরা চাঁদের রাতে তারা গুঁড়ো করা পথে হেঁটে বেড়িয়েছি কত!! গোলাপের পাঁপড়ির বিছানায় আমাদের প্রথম রাত... রাহুলের হাতের নখগুলো কি সুন্দর গোলাপি গোলাপি ছিল মনে পড়ে তোমার? তুমি বলতে গোলাপের কুঁড়ি থেকে জন্মেছে... আমার রাহুলের আজ বড্ড চাপ জান? আমি খুব চিন্তায় আছি আজ... তিনটে টিউশন সেরে ফিরতে ফিরতে বাছার আমার শরীরে কি থাকে বল... তুমি তো কাজের চাপে আনতেই পার না ওকে... শ্যামলালকে পাঠাতে হয় ওকে আনবার জন্যে...একটু সময় দাও গো এবার... এটা তোমার নিজের সংসার... আচ্ছা, আমি নাহয় তন্দ্রার মত সুন্দরী নই, গ্ল্যামারাস নই...কিন্তু তাও তো তুমি-ই একদিন বলতে আমার রূপের কথা... কি করে আজ আবার ঘরের কাজ ফেলে চলে যাচ্ছ তন্দ্রার কাছে? আমি যাই... রাহুলের আসার রাস্তায় দাঁড়াই গিয়ে... দূর থেকে আমাকে দেখলেই কেমন খুশি হয়ে ওঠে রাহুল... রাহুল... আমার ছোট্ট রাহুল... তুই দূর থেকে ছুট্টে চলে আয় সোনা আমার কোলে... দাঁড়া... আমি যাই একটু এগিয়ে.....

(২)

এই... তুমি আটকাচ্ছ কেন আমাকে? কি নাম যেন তোমার... আশা না কি যেন বলে ওরা... এখানে আর যারা থাকে... আমাকে আটকে রেখো না... ছেলেটাকে দেখতে দাও আমায়... ওর বাবা তো সব ফেলে চলে গেল ওই মেয়েটার কাছে... নাঃ... কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব... শ্যামলাল কোথায়? শ্যামলাল... আরে ছাড় আমাকে... একটু যেতে দাও তো... তোমার বুঝি ঘরে ছেলে মেয়ে নেই? সন্তানের টান কাকে বলে জানো না বুঝি?... রাহুলের নাম নিলেই আমার বুক ভিজে যায় গলে যাওয়া দুধে... বোঝো না তুমি? আমায় পার্থ আজকাল আর বড় রেস্তোঁরায় নিয়ে যায় না বলে তেমন ভাল ভাল জিনিস খেতে পাই না, শক্তিও যেন কমে গেছে... চোখের কোল কেমন অন্ধকার দেখি আয়নায়... কবে যেন দেখলাম শেষ নিজেকে? যেদিন পার্থ আমাকে

বাপের বাড়িতে দিয়ে গেল?... নাঃ... মনে করতেই পারছি না... কবে দেখেছি আয়নাতে নিজেকে ভাল করে?...রাহুল তুই আয়না দেখিস? মুখ দেখিস? টলটলে মুখটা... আয় তোকে চুমু খাই... কবে যেন চুমু খেয়েছি তোকে রে? অ্যাডমিট কার্ড যেদিন আনলি, সেদিন? না পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে? দূর... কি যেন বলত ছোট পিসি? 'ব্রাহ্মী শাক খা মনো... এ বংশে ভুলে যাওয়া রোগ আছে'... কি ভুলে যায়? কে ভুলে গিয়েছিল? কবে? কিভাবে মনে করে লোকে ভুলে যাওয়া দিনগুলো? অ্যাই মেয়ে, ছাড়ো না আমাকে... রাহুল যে আসবে এক্ষুনি... আমাকে না দেখলে অস্থির হয়ে উঠবে ছেলেটা... ছটফট করবে... পার্থ যে তন্দ্রার কাছে... কে দেখবে আমার রাহুল কে!! দাঁড়া... তোরা আমাকে আটকে রাখবি? আমি বেরিয়ে পড়ব একদিন দেখবি... পারবি না আমাকে আটকাতে...উফফফ... মুখে কি একটা তেতো ওষুধ ঢেলে দিলো... উফফফফ... আর পারি না আমি... ক্লান্ত লাগে ভারি... বিছানায় শুতে বলছে মেয়েটা... শুয়েই পড়ি... পরে নাহয় কোথায় যেন দাঁড়াতে হবে... কে যেন আসবে... কোথায় যেন... নাঃ... কি একটা গোলমাল হচ্ছে যেন... একটু ঘুমোই... উঠে ভাবা যাবে... ভাবনা মানে কি... কেমন যেন গোল গোল ধোঁয়ার মত?... রামধনু খেলে যাচ্ছে... কোথায় বিদ্যুৎ চমকাল? মাথার মধ্যে? উহুহু... আর না... কোথায় যেন গড়িয়ে যাচ্ছি পিছলে... অন্ধকারে... একটা আলো কোথায় নিভে গেল... কে জানে!! কে জানে!!......

(৩)

সকালটা বড় মিষ্টি আজ... রাহুল আবার সকালে পড়তে গেছে নাকি? দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমি কি একটু ঘুরে আসব বড় রাস্তা থেকে? ওই আশালতাকে একটু এড়িয়ে যেতে পারলেই হবে... ওই তো আটকে দেয় আমাকে... কি যেন করছে মেয়েটা... আমি আস্তে করে দরজা দিয়ে চলে যাই... ঠিক সময়ে রাস্তায় আমাকে না দেখলে রাহুল যে কি অস্থির হয়ে উঠবে!! নাঃ ... যাই আমি... যাই........

(৪)

উফ... কি বড় বড় গাড়ি... পার্থ কি ভেবে নিজের সংসার ছেড়ে এখন তন্দ্রার কাছে গেল!! কোন দায়িত্ববোধ আছে ওর!! আমি ছোট গলি দিয়ে দিয়ে যাই বরং... তাতে ঝামেলা কম...আচ্ছা... কি খুঁজছি আমি!! কোথায় যাচ্ছি... কার কাছে? আমার বাড়ি কোথায়? আছে বাড়ি? পার্থ আমাকে একটা বাড়ি দেখিয়েছিল... সেইখানেই থাকতাম আমরা... আবছা আবছা চোখের সামনে ঘরের ভেতরটা ভাসছে... ও হ্যাঁ হ্যাঁ... রাহুল... রাহুল... আমার ছেলে... রাহুলের ভিডিও গেমটা একবার সরিয়ে নিয়েছিল পার্থ... কি কান্না রাহুলের... ফুলে ফুলে কান্না... আমি পারিনি ওকে থামাতে... শেষমেষ পার্থ ওটা ফিরিয়ে দিয়ে একটি রফা করেছিল ওর সঙ্গে... কি যেন রফাটা? ধুর... হারিয়ে যাচ্ছে... হারিয়ে যাচ্ছে... কে যেন রাস্তার ধারের ফুটপাথে শুয়ে আছে... আমি দাঁড়াতেই ওর শোওয়ার জায়গাটুকু পা ছড়িয়ে বড় করে নিল... দুর বোকা... আমি কি শুতে এসেছি এখানে? রাহুল ফিরলেই আমি ওকে নিয়ে ঘরে যাব... রাহুল কখন ফিরবে?... বলে গেছে কি? না তো!! আমি তো কিছু জানি না... তাহলে কি ফিরে যায় মানুষ এখান থেকে? কেমন করে!! কোন রাস্তায় এসেছিলাম আমি? বুঝতে পারছি না যে!! কোথায় ফিরব আমি? আমি যে ফেরার রাস্তা জানি না... কালকের তেতো ওষুধটা এখনো ঝিম ধরিয়ে রেখেছে শরীরে... আচ্ছা... এই জায়গাটা আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছে কেন? আমি কি কোনদিন পার্থর সঙ্গে এইখানে তারা গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেওয়া পথে হেঁটেছি? ওই বিরাট সাদা সৌধটা কি? কেউ কি বলে দেবে আমায়? আমি কি ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি কখনো? কে জানে!! বড় ক্লান্ত লাগে যে... একটু শুয়ে পড়ব এখানে? কেউ কি কিছু বলবে তাতে? চারপাশটাতে কি করে এমন অন্ধকার নেমে এল? কখন এল নেমে? যেখানে থাকি সেখানে তো পরিপাটি বিছানা ছিল... এখানে কেউ কি দেবে না করে... বিছানা? নাঃ... আর নয়... এইবার একটু গড়িয়ে নিই... রাহুল এলে আর তো শোওয়া হবে না... রাহুল... ডাক দিস বাবা... আমি তড়াক করে উঠে পড়ব তক্ষুনি... একটু চোখ লেগে যাচ্ছে তাই চোখ বুজে আছি রে... উম... হাতে মাথা রেখে শেষ কবে শুলাম? শুয়েছি কি কখনো? কে জানে... জড়িয়ে আসছে দু চোখ... একটু শুয়ে থাকি... আবার উঠে পড়ব... ডাক এলেই....

আশালতা উদ্বিগ্ন হয়ে চিৎকার করছিল। কোনদিন হয়নি এমন। এখান থেকে মিসিং হয়নি কোন মানসিক ভারসাম্যহীন রোগী। অবশ্য মনোবীণা তেমন রোগী ছিলেন না। অশান্তি করতে দেখা যায়নি তাঁকে কোনদিন-ই । শান্ত প্রকৃতির মানুষটি, কোন ঝামেলায় থাকতেন না। অনেক কিছু ওনার মনেও পড়ত, তাই ডাক্তারবাবু তাঁকে স্বাভাবিকভাবে দেখাশুনা করতে বলেছিলেন... ব্যবহারিক ভালবাসা দিয়ে তাঁর মন জয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন আশাকে। সেভাবেই এগোচ্ছিল সব ঠিকঠাক। হঠাৎ করে উনি এমন বাইরে চলে যাবেন তা আশালতার বোধগম্যের বাইরে ছিল। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী ভাবছিল সে। যদিও ডাক্তার মুখার্জি তাকে কিছুই বলেননি, কিন্তু পরশু থেকে ডাক্তারবাবু যে মনোবীণার বিষয়েই পড়াশুনা করছিলেন তা আশা জানত। তাই ডাক্তারবাবুর দুঃশ্চিন্তার কারণ হিসেবে নিজেকেই ভাবছিল সে। অন্য নার্সরা সবাই আশালতার জুনিয়র। সবাই চুপ করে কাজ করে যাচ্ছে আজ। ডাক্তারবাবু বেরিয়ে পড়েছেন পুলিশের বড়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে সম্ভাব্য সব জায়গা দেখবার জন্যে। বিকেলের দিক থেকে উধাও মনোবীণা... ডাক্তারবাবুর কাছে খবর গেল সন্ধ্যের আগেই... উনি এসে পড়লেন খুব তাড়াতাড়ি আর এসেই নোটস এর খাতা খুলে কি সব যেন দেখে নিলেন। তারপর পুলিশের বড়বাবুকে ডেকে এনে বেরিয়ে পড়লেন পুলিশের-ই গাড়ি করে। মহানগর তোলপাড় করে খুঁজতে হলেও তিনি নিয়ে আসবেন মনোবীণাকে, আশালতা তা দেখেই বুঝতে পারছিল। দশ বছর ধরে সে দেখে আসছে তার ডাক্তারবাবুকে। গভীর শ্রদ্ধাবোধ তার এমনি এমনি জন্ম নেয়নি। সে ধীর পায়ে ওয়ার্ডে ঢুকে কাজ শুরু করে... ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট... আর এ কাজটা সে ভালই পারে......

রাত্রির গভীরতা কে দুটি আলোর রেখা চিরে ফালাফালা করে বেড়িয়ে যাচ্ছিল, হু হু করে ছুটছিল পুলিসের গাড়িটা। ডাক্তারবাবু সামনেই বড়বাবুকে নিয়ে বসেছেন... অনেকগুলি জায়গা খুঁজে দেখা হয়ে গেছে... ঝুঁকে পড়ে চোখ দুটি কুঁচকে দেখে চলেছেন রাজপথের দুই ধারের শুয়ে থাকা মানুষজনকে... বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলেছেন তিনি... বড়বাবু একটু শোনবার চেষ্টা করতেই ডাক্তারবাবু সতর্ক হয়ে গেলেন...তারপর বললেন, “ভিক্টোরিয়ার সামনেটা একবার দেখে নেব... ওখানে একটু দাঁড়াবেন...” গাড়ি খানিকটা এগিয়ে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে

থেমে গেল... ডাক্তার লাফিয়ে নামলেন... বড়বাবু নামার আগেই ছুটে গেলেন কয়েকটি দলা পাকিয়ে শুয়ে থাকা মানুষের দিকে... কয়েকজন শুয়ে আছে... নাম না জানা কয়েকজন প্রান্তিক মানুষ এই মহানগরীর বুকে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে আছে যেন... এদের নিয়ে কেউ কখনও ভাবেনা... কেউ এদের জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখে না... যেন এদের হিসেব করতে যাওয়াই বাতুলতা... ডাক্তার হাতের জোরালো টর্চের তীব্র আলো ঘুমন্ত মুখগুলির ওপর ফেলতে থাকেন... তীব্র উত্তেজনায় কাঁপছেন তিনি... অবশেষে কিছু যেন খুঁজে পান তিনি... দূরে দাঁড়িয়ে বড়বাবু সিগারেট ধরিয়েছিলেন, তিনি হাতের সিগারেট নামিয়ে কৌতুহলে এগিয়ে আসেন ধীর পায়ে... ডাক্তার তখন নিচু হয়ে একটি আধাবয়সী মহিলাকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কি যেন বলছেন... বড়বাবু খুব কাছে আসার পর শুনতে পান অস্পষ্টভাবে... আবছা অন্ধকারে... ডাক্তার দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে থাকা মহিলাকে বলছেন বিড়বিড় করে, "ফিরে চল মনোবীণা, ফিরে চল... এই তো খুঁজে পেয়েছি তোমায়... আর তোমায় হারাতে দেব না আমি... মনোবীণা... এভাবে আর কারো সুলতা কে আমি হারিয়ে যেতে দেব না... ফিরে চল... জাগো...."

বড়বাবু নিঃশব্দে ফিরে যান কালো ভ্যানের কাছে......শুক্লা দ্বাদশীর নিঃসঙ্গ চাঁদ তখন সবে ঘাড় কাত করে সস্নেহে তাকিয়েছে সেই তারা গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেওয়া রাস্তার দিকে....আশ্চর্য রূপোলি আলোর ঝর্ণাধারার ভেতর দিয়ে এক ডাক্তার তখন তাঁর রোগিনীকে নিয়ে ফিরে আসছেন নিরাপদ এক আশ্রয়ের দিকে।

পটলডাঙায় খুন

উত্তরায়ণ সেনগুপ্ত

আমি হাঁটি রাস্তায়, ফুটপাথে, সবুজে, ধূসরে, ড্রেন + ম্যানহোল টপকে। কখনো ধীরে, কখনো জোরে। ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নিই এক ভাঁড় চায়ে, পাতি সিগারেটে। ভোরবেলা বাদামি বকের মতো দাঁড়িয়ে বেঞ্চ। গুঁড়ো গুঁড়ো দূষণ। বিশ্রামে দার্শনিকতা, দেওয়ালে থুতুর স্ট্যাম্পে রাগ, ছন্দে জালি মিস্টেক, পা মাড়ালে ফোঁস।

আক্ষেপ ছুটে আসে। নুন শোর ছাপ মারা পোষ্টারগুলো কই আর। বানান ভুলের মজা, সাদা (A) কালো নাম ব্র্যাকেটে (কালার), গোপনতার র‍্যাকেটে শাওয়ার, স্কুলছুট হুট করে বড় হওয়া। অশালীনতার রেশ নস্টালজিয়ায় বাঁচে বেশি। অটোর লাইন, ভ্যান গঘ ছেলে, শান্ত সমুদ্রের মত মেয়ে। যাঃ। রিকশাওয়ালা ডেকে নিল। বিরক্ত চোখ- না ধেড়িয়ে এগোন তো দাদা।

লেখা হয় না কতদিন। কলেজ স্ট্রিট লাল নীল মলাটময়। দাড়িকবি আর বৌঠান মাখানো বটতলা। তাও কেনে হুড়মুড়ে গাধা। আড়ালে ঠোঁট চাটে তেলতেলে রবীন্দ্র সমালোচক। আমি পুরনো বই লাকি লিউক, রেমার্ক। তৃতীয় অনুচ্ছেদে গোঁজা পঁচাশির ঝিরঝিরে চিরকুট। “আমাকে মনে রেখো, রাখবে তো?”। ফিক করে হাসি। তোকে মনে রাখবে কোন শালা! Percentage না ফেরিওয়ালা! আমিই কিনেছি পঁয়তাল্লিশে।

কালিঘাট, সোনাগাছি... অন্ধকারে রং চটা ফুটপাথে ফেসিয়াল প্রস্ট। দালালের বুকে ছেঁড়া “চে”, পকেটে ভেজা “চে”, চোখেমুখে শেয়ালানা। কি revolution আনবে কে জানে? খদ্দের নিয়ে দুই বেশ্যার লড়াই। রুজ , লিপস্টিক রক্ত মোছে ধুলো। জনগণ ভিড় চেটেপুটে। তরুনবাবু ক্লাসে-“বেশ্যা বলবে না বল দেহপসারিনি”। কিন্তু স্যার শব্দ চাপালেই কি এই দুনিয়াটা পাল্টায়? টেক্সটের বাইরে শুধু করিনা কাপুর দাঁড়ালে গ্ল্যামার, চম্পারা দাঁড়ালে নয়। আবার

একমুখ ধোঁয়া। সিগারেটের নয় মনের। সক্কলে তো আমরা বেশ্যাই। realization ফুট বদলে দেয়।

একাকী রাত স্টেশনে newspaper। ধোঁয়ার aftershock। অক্ষর চিনতে চিনতে ঘুম। বড্ড আলো, চোখে ফিকে নীল বাষ্পরা আচমকা মেহেদি হাসান। হুঁশ ফেরে আঘাতে আঘাত। বেয়োনেট- যেন। খাকি উর্দি, মন লাঠিতে, লাথিতে। মাল কোথায়? টিকিট নেই, টাকাও নেই। বিয়ারে তিতকুটে ভিজে সে বাবুঘাট সিঁড়ি। তাড়া খেয়ে সবুজ পাতার(?) ঠেকে স্টিমার। ভোরে কোন গাছের তল + ঘুম। আবার ঘুম... দুপুর। কলম ছুঁড়ে- ধুর শালা।

ইনন্যুয়েনডো

সৌরভ কুমার দাশ

দেহরোমের ভেতর দিয়ে
অসহায় পতঙ্গের পথ হারানো –
একমাত্র পুরুষ এই দেখে আনন্দ পায়।

জীবন চলছে পৌণপুনিকের মতো,
যার দশমিকটাই প্রধান
তারপর শুধুই স্বমেহনের একঘেয়েমি।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে লেখা আছে কি
আজ শারীরিক মিলনে বাধা?

ফাঁকা বালতি অনেকটা যৌবনের মতো,
ভর্তির দিকে নয়-কল খুলে
ধীরে ধীরে
মৃত্যুর দিকে এগোনো।

জ্যোতিষী বলেছে এ বছর
প্রেম হবে; সবুজ উদ্ভিদের মতো এক নারী
যার নরম মাংসল কাণ্ড
মাটির অনেক নিচে পোঁতা।

আমার শুধু জীবনের নয়
যৌবনেরও দীর্ঘমধ্যায়ু যোগ চাই।

সংরক্ষণ

রুদ্রদীপ মজুমদার

পায়ের বুড়ো আঙুলের ভাঙা নখ জোড়াকে
যত্নে বাঁচিয়ে রাখার কথা ভেবেছি,
ওরা স্মৃতিসৌধ, সাক্ষী।
বাধা পেরোবার বহু মুহূর্ত,
ব্যথা পেরোবার কিছু মুহূর্ত
ও হঠাৎ আঘাতে মস্তিষ্ক জখম হবার স্মৃতিরা
নেমে, জমে, আটকে আছে ওখানেই।
আমার বেশ খানিকটা ইতিহাস থেমে আছে,
ওরই ফাটলে, আনাচ – কানাচে।

মাকড়সা, তুমি, আমি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

(১)

রান্নাঘরে খাটুস খুটুস আওয়াজ । শুনে ঠিক ভোর পাঁচটা নাগাদ বিশুর মা, বিনোদার ঘুম গেল।

- এই খেয়েছে রে, থ্যাঁতা-বেড়ার ফোকলটা দিয়ে নিশ্চয়ই কোনও কুকুর বেড়াল ঢুকে পড়েছে। গতকাল রাত্তিরের উদ্বৃত্ত খাবারটুকু তোলা-উনুনের পাশে কাঁসার থালা দিয়ে ঢাকা দেওয়া ছিল। ঢাকা খুলে হয়ত এতক্ষণে সব সাবড়ে দিয়েছে।

পড়ি কি মরি করে দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকে তাঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। আদুড় গায়ে বিশুকে ঘরের কোণে পেতলের জলতোলার ঘড়াটার কাছে উবু হয়ে বসা অবস্থায় দেখে বিনোদা তো হতবাক। যে বিশু ছেলেবেলায় বেলা অবধি শুধু পড়ে পড়ে ঘুমতো, সেই বিশুর আজ এ কি আমূল পরিবর্তন? চোখে দেখলেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর লোকে যাই বলে বলুক, জেল হেপাজত তাহলে দেখছি বাপু তেমন কিছু খারাপ নয়, ভাবেন বিনোদা।

পথের ধকলে পরিশ্রান্ত বলে রাতের খাওয়াটা হয়ত তেমন জমেনি, তাই কি বিশু সবার অলক্ষ্যে এখন সুদে আসলে সেটা উশুল করে নিতে চাইছে, না কি, বছর দুয়েক ধরে জেলের অখাদ্য খেয়ে খেয়ে যে অরুচি, সেটা মায়ের হাতের রান্না খেয়ে এইবার ভুলে যাবার চেষ্টা করছে? একমুহূর্ত এমন কথা মনে এলেও বিনোদা বাইরে কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না। বিশুও অপ্রত্যাশিতভাবে মাকে হাজির হতে দেখে, যেন চুরির দায়ে ধরা পড়ে গেছে, এমন একটা আমতা আমতা ভাব দেখিয়ে বাঁহাতে ঘড়াটা নিয়ে সটান উঠে দাঁড়িয়ে ডানহাত দিয়ে মাথা চুলকোয়।

- কিরে বিশু, এই সাতসকালে ঘড়া নিয়ে আবার কোথায় চললি? আরে, তোকে কে জল তুলে আনতে বলেছে বল্ তো? কদ্দিন বাদে বাড়িতে এলি, কোথায় একটু জিরোবি, তা নয়.....এসব তোর কি যে অপোকাণ্ড..... বুঝিনা বাপু।

বিশুর দৃষ্টি তখন মেঝের ওপর নিবদ্ধ। মায়ের দিকে চোখ না তুলেই বলে, খাবারজল তুলতে তো যাচ্ছি না। জল তুলে মন্দিরে মন্দিরে শিবচান করাব, তাই ঘড়াটা নিলুম। শেষ হলে, চাও তো খাবার জলও তুলে দেব'খন।

- তা তো বুঝলুম, কিন্তু তুই কেন? তুই শিবচান করাবি কেন? সতুঠাকুরপোর কোনো নয়া আদেশ নাকি? কই, আমায় তো ঠাকুরপো এসবের কিছু জানায়নি !

- না, না, সতুকাকুর সঙ্গে এ নিয়ে কোন কথাবার্তা হয়নি। এটা তো আমি নিজের মনে ভেবেই করছি, কেউ কোনো আদেশ দেয়নি।

- এ আবার তোর কি বাই উঠল রে বাবা? কি জানি আমার বরাতে আরও কিসব লেখা আছে? কোথায় কোনো কাজের কাজ শিখে পয়সা রোজগার করবি, বে'থা করে ঘরসংসারি হবি, তা নয়... যতসব তোর আগের মতোই ছেলেমানুষি খেলা। কতবার মা বিবিমার দোরে তোর জন্যে ধন্না দিয়েছি, কত মানত করেছি, তোর যেন একটা হিল্লে হয়, তা বিবিমাও দেখছি এখনও আমার ওপর বিরূপ... মুখ তুলে একবারও চাইছেন না।

- ওসব মানত টানত আর করো না, মা। দরকার হলে আমি নিজেই আমার পথ বেছে নেব, তোমাদের কাউকে কোন মাথা ঘামাতে হবেনা। মুখের ওপর বলে দেয় বিশু।

- না কি, শুধু আমার আর তোর ছোট ভাইয়ের ঘাড়ে বসে বসে খাবি, আর বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবি?

- উঃ, এ কি গেরো রে বাবা, সকাল হতে না হতেই খিটখিট আর কচকচানি শুরু হয়ে গেল। খালি খালি তোমরা অত খাবারের খোঁটা দাও কেন বল তো? ঠিক আছে, আজ থেকে আমি তোমাদের খাবার খাব না, শুধু তোমাদের ফাইফরমাশ খেটে যাব।

- যা ভেবেছি তাই, এমন কথা তোর মুখে শুনব এ আর নতুন কি। তা আমার হাতের রান্না এখন আর তোর মুখে রুচবে কেন? দু'বছর ছিঘরের অমৃতি রান্না খেয়ে খেয়ে তোর মুখের সোয়াদই বদলে গেছে।

- আঃ, এতো টিকটিক আর সয় না। আমি যাই করি না কেন, তোমাদের মন পাওয়া দায়। এগোলে আবাগীর ব্যাটা, পেছোলেও আবাগীর ব্যাটা। দেখো মা, তোমরা তোমাদের কাজ করো, আর আমি আমার কাজ করি। কেউ কারুর ব্যাপারে নাক না গলালেই তো হল। তাহলেই সব শান্তি।

- কি বললি, আমার হাতে খাবি না? তা, খিদে পেলে কি করবি? ছোটবেলায় তো খাওয়ার জন্যে ডেকে ডেকে মুখে ফেকো পড়ে যেত, কিছুতেই খেতে আসতিস না। খাবার খোঁটা দেওয়া হয়েছিল বলে, একবার তো গোঁ ধরে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসেছিলিস। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যেতেও তোকে আর খেতে ডাকা হয়নি বলে তুই তারপর কি করেছিলি মনে আছে তোর? খোলামকুচি দিয়ে দরজার পাল্লার বাইরের দিকে লিখেছিলিস, আর একবার ডাকিলেই খাইতে যাইব। আর ডাকছ না কেন? বানান ভুল দেখে তোর বাবার সে কি রাগ। খ এর বদলে ন লিখেছিলি বলে সবার তখন সে কি হাসাহাসি, মনে নেই তোর? না খেয়ে এবার থেকে শুকিয়ে থাকবি ঠিক করেছিস নাকি? তা আমার মাথার দিব্যি দিয়ে আগে থেকে জানালে ভাল হয়, তোর জন্যে তাহলে আর চালও নেব না।

বানান ভুলের ব্যাপারে বিশুর এখনও কেমন খটকা লাগে । কেবল দুটো জায়গায় ওর কেবলই ভুল হয়ে যায় । 'ঠ' লিখতে গিয়ে লিখে ফেলে উল্টো করে " ঠ ", আর 'অথচ' লিখতে গিয়ে শুধু লিখে ফেলে "অচথ" তাই নয়, মুখেও বলে। অনেক চেষ্টা করেও বিশু তা এতদিনেও শুধরোতে পারেনি। বানান ভুলের কথায় কান না দিয়ে বিশু উত্তর দেয়,

- শুকিয়ে থাকব কেন, মা? গাঁয়ে এর ওর বাগানে কত ফলমূল, লতাপাতা... তাই খেয়েই দিন কাটিয়ে দেব।

গোড়াকাটা গাছের মতো বিনোদা ধপাস করে রান্নাঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে দুহাতে কপাল, বুক চাপড়াতে চাপড়াতে আক্ষেপ করতে শুরু করে দিলেন,

- এ আমার আজ কি দশা হল গো, সবাই শোন গো, আমার নিজের পেটের ছেলের কি সব মতিগতি। পরের আগানে-বাগানে গিয়ে ফল চুরি করে বেড়াবে। বাড়িতে যেন খাওয়া জোটে না।

- পেড়ে খেলে চুরি করা হয়। কুড়িয়ে খেলে তো আর কেউ বলবে না যে, আমি চুরি করে খাচ্ছি। আর নেহাৎ পেটের খিদে মেটাতে যদি দু-একটা পেড়েও খাই, কেউ আমাকে দুষবে না।

আর বেশি কথা না বাড়িয়ে বিশু ঘড়াটা নিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে বেরোতে যাবে বিনোদা বাধা দিলেন,

- ঘড়ার জলটা অন্তত ওই কুঁজোটায় ঢেলে দে। আর হ্যাঁ, তোর যা খামখেয়ালি স্বভাব, ঘড়াটা যেন আবার ভুলে কোথাও ফেলে রেখে আসিস না। খাঁটি পেতলের ঘড়া, তোর বাবা বিয়েতে যৌতুক পেয়েছেলো। তা, আমার মাথা খেয়ে কখন ফেরা হবে শুনি? আমার কিন্তু কারুর মুখের ভাত বেড়ে বসে থাকতে একদম ভাল্লাগে না।

মা যে কখন কি বলেন, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝার উপায় থাকে না। বিশুর মনেও এবার কেমন যেন একটা ধন্দ লাগে।

- আমি কি এখনও তোমার কচি খোকাটি নাকি যে, হারিয়ে বসব?

- আর হ্যাঁ, ফিরে এসে ভিজে কাপড়টা দড়িতে শুকোতে দিস, নইলে মসের দাগ ধরে যাবে। হাজার কাচলেও উঠবে না।

সদর দরজার কাছাকাছি গিয়ে, বিশু আর একবার ট্যাঁকের বাঁদিকটা পরখ করে নেয়। আঙুল দিয়ে বাইরে থেকে অনুভব করার চেষ্টা করে দানাগুলো সব আছে কিনা। হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক। চলি মা, বলে সটান সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

জেল হেপাজত থেকে ছাড়া পাবার দিন বিশুরই এক সাগরেদ কয়েদি তাকে একমুঠো শিম, করোলা আর বরবটির দানাগুলো দিয়ে বলেছিল, দেখ, তোর কি ভাগ্য, ছাড়া পেয়ে গেলি। আমি তো আর তোর মতো অমন ভাগ্য করিনি যে, এ জন্মে কোনোদিন ছাড়া পাব। যা, তুই এগুলো নিয়ে যা। তোদের গাঁয়ে কোনো নিরাপদ জায়গা বেছে, পুঁতে দিস। যেখানে গরু, ছাগলের কোনো দৌরাত্ম্য নেই। গাছগুলো বাড়লে ফলও পাবি। আর ফসল ফললে, আমার নাম নিয়ে তোর গাঁয়ের সব লোকেদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাস। তোদের আনন্দ হলে, আমার কথা তোদের মনে পড়বে, তা জেনেই আমার আনন্দ।

কেন জানিনা বিশু সেদিন তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, "সে কিরে, এ্যদ্দিন তোর সঙ্গে এক জায়গায় রইলুম, আমার মন কি এতই ঠুনকো যে, চোখের আড়াল হলেই ভুলে যাব? আসব রে, আমি আবার আসব, এসে তোর সঙ্গে দেখা করে যাব। আর একটা কথা জেনে রাখ, তোকে আপন বলে যদি কেউ মানতে নাও চায় তো কি, আমি কি তোর কেউ নই? আমি তো আছি। জেলে বন্দি হয়ে থাকলেও তুই একদম একা নোস।"

- য্যা, য্যা, বাজে কচ্‌লাসনি আর। একবার রেহাই পেলে এখান থেকে, কেউ আর এদিক মাড়ায় নাকি? নিজের বৌ, নিজের একমাত্র ছেলে, একদিনও কেউ এল না, আমার সঙ্গে দেখা করতে। তুই তো আর আমার নিজের কেউ হোস না। আসবি কেন?

- তোর ছেলে, বৌয়ের কথা বাদ দে। আমি ওদের মতো নই। দেখবি, কথা যখন একবার দিয়েছি, তখন হেরফের হবে না, আসবই। নিজের হাতে তোর গাছের শিম, বরবটি আর করোলা দিয়ে তৈরি করা রান্না নিয়ে এসে খাইয়ে যাব।

- তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, ভগবান তোর ভাল করুন। যাই বলিস রে বিশে, ভগবান আছেন, নিশ্চয়ই আছেন। নইলে, এ্যাদ্দিন বাদে তুই ছাড়া পেলি কি করে? তাও বেকসুর?

- বলছিস? ভগবান আছেন?

বিশুর ঠিক সেই মুহূর্তে মাথায় আসেনি যে, সে গাঁয়ে ফিরে শিবমন্দির নিয়ে পড়বে। এই খেয়ালটা কিন্তু হঠাৎই তার মাথায় চাপে। আগে থেকে কোন কিছুই জানা ছিল না তার। গাঁয়ে ফিরে কি কাজ করবে, তারও কোনো পরিকল্পনা ছিল না।

- আর মানুষ? মানুষও আছে নাকি রে? মানুষের মতো মানুষ? প্রশ্ন করে বিশু।

- কে জানে। তবে ভগবানের সঙ্গে যদি কোনো দিন দেখা হয়, তখন জিজ্ঞেস করে দেখব। বলে, হাসে বিশুর কয়েদি বন্ধু।

নিরাপদ জায়গা হিসেবে গাঁয়ের শ্মশান, গো-ভাগাড় আর খাল বরাবর রেললাইনের ধারটা মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিল বিশু। তাছাড়া রানীপিসির বাস্তুভিটের চার পাশের পাঁচিলটা তো আছেই। পাঁচিলের ধার বরাবর দানাগুলো পুঁতে দিলে নির্বিঘ্নে বেড়ে উঠবে গাছের চারাগুলো। শ্মশান আর গো-ভাগাড়েও তো কেউ সচরাচর গরু, ছাগল চরাতে আনে না। সবারই মনে ভয়। কে জানে কোন অতৃপ্ত অশরীরী আত্মা কার ঘাড়ে চেপে কোন গৃহস্থের ঘরে গিয়ে কি সব ফষ্টিনষ্টি

করবে। তাই গাছগাছালির এখানে অবাধ বাড়। আজ বিশুর কত কাজ। এ্যাদ্দিন বাদে গাঁয়ে ফিরছে। আবার নতুন করে লোকজনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করা দরকার। গাঁয়ের নাড়ীনক্ষত্র বিশুর চেনাজানা হলেও, কালের ব্যবধানে কত কি যেন কেমন সব পাল্টে গেছে।

(২)

জোড়া শিবমন্দিরের লাগোয়া পুকুর থেকে জল তুলে পাড়ে উঠে এল বিশু। জলভরা সেই পেতলের ঘড়া কাঁখে করে রাস্তায় যেতে দেখলে ভাতারমারি গাঁয়ের ছেলে-ছোকরারা সবসময়ই তার পেছু লেগে যেত, আর বলতো, এই পাগলা, এই পাগলা ! কাদের কুলের বৌ রে তুই, কাদের কুলের বৌ? হেলে দুলে, কলস কাঁখ, কোন যমুনায় জলকে যাস?

কুচোকাচা ছেলেদের মুখে এমন কথা শুনে বিশু প্রথমদিকে বেজায় খাপ্পা হয়ে যেত। কারণটা অবশ্য তুইতোকারি করার জন্যে নয়। ওদের মুখে পাগলা সম্ভাষণ, তা বিশু কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারত না। মাঝে মাঝে রুখে দাঁড়িয়ে বলতো, রোস, দেখাচ্ছি মজা তোদের, একেবারে চোদ্দগুষ্ঠির বাপের নাম ভুলিয়ে তবে ছাড়ব। গর্ভস্রাব যতসব, নচ্ছার, পাজি-পাঝড়ার আখড়া কোথাকার। তারপর ঘড়াভর্তি পুরো জলটা ঢেলে দিত ছেলেগুলোর গায়ে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম। দিন, ক্ষণের কোন বিচার নেই। ছেলেরা জলকে মোটেই ভয় পায় না। ফল হত বরং উল্টো। মাগনায় এমন চানের মজা, সে সুযোগ হাতছাড়া করতে ওরা নারাজ। অনেকে আবার সর্ষের তেল মেখে আগের থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে আসত। কেউ কেউ আবার হাফপ্যান্টের পকেট থেকে বের করতো সানলাইট সাবান। ব্যস, ষোলকলা পূর্ণ!

গাঁয়ের ছেলে সব, বর্ষায় জলে, কাদায় হুড়-দুজ্জুতিতে পোক্ত। সামান্য বিশুর ঘোড়ার জলকে ভয় পেতে ওদের বয়েই গেছে। কিন্তু ওদের মাসি-পিসিরা তা দেখে দারুণ ভয় পেত। এ ভয়, ছেলেদের জলে ভিজে সর্দি লেগে যাবে বলে নয়। এ ভয়ের শিকড় অনেক গভীরে। কিংবদন্তী

আছে, পাশের গাঁয়ের জাগ্রত মা শেতলাদেবী নাকি কারুর ওপর রুষ্ট হলে তার গায়ে ঘড়াভর্তি জল ঢেলে দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় সারা গায়ে মায়ের দয়া। মায়ের কাছে ভক্তিভরে পূজা-অর্চনা করলে, জোড়াপাঁঠা কিংবা অন্য আরও কিছু মানত করলে, কেউ কেউ হয়ত সে দফায় মায়ের দয়া হওয়া সত্বেও প্রাণে মরার হাত থেকে সে যাত্রা রেহাই পায়। কিন্তু দাগের আঁচড় দেহে লেগে থাকে জীবনভর।

আরো ভয় পেত, বিশুর নামে অন্য আর একটা বদনাম ছিল বলে। একটা খুনের বদনাম। কে এক মেয়েমানুষ নাকি ওর হাতে খুন হয়েছিল। কার কোথায় কিসের বদনাম আছে বা ছিল, ছেলেছোকরাদের তা নিয়ে তবু কোন মাথাব্যথা নেই। ওরা চায় শুধু মজা পেতে। বিশু-পাগলাকে খেপিয়ে। মৌমাছির কামড়ের পেছনে যে সুস্বাদু মধুর আহ্বান, শুধু তার লোভেই তারা মগ্ন।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর বিশু একদিন নিজের থেকেই উপলব্ধি করে যে, সবসময় ছেলেছোকরাদের এই উস্কানিতে গা দিলে, মোদ্দাকথায় তার জলতোলা কাজের বহর দ্বিগুণ বেড়ে যায়। জল তো আর সে শুধু ছেলেদের গায়ে ঢেলে জব্দ করার জন্যে পুকুর থেকে তোলে না। তার দৈনন্দিন কাজের একটা বড় অংশ হচ্ছে গাঁয়ের পাঁচটা শিবমন্দিরের শিবলিঙ্গ ধোয়া। হঠাৎই তাই একদিন বন্ধ হয়ে গেল ছেলেদের গায়ে জলঢালা। ছেলেরাও টের পায়, বিশু-পাগলা আর তাদের টিটকিরির তোয়াক্কা না করে আপনমনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। তেমনি হঠাৎই ছেলেদের তরফ থেকে তাই ফেউ-লাগাও বন্ধ হয়ে গেল। ধ্যুর, মাকড়া, যে পাগলকে পাগল বললেও খেপে না, সে পাগলের পেছনে লাগা মানে, উলুবনে মুক্তো ছড়ানো। মন্তব্য করে কেউ কেউ।

(৩)

মা বিবিমার মন্দিরটা ছাড়া এ গাঁয়ের সব কটা মন্দিরেরই একছত্র মালিক জমিদার সত্যবানবাবু। অন্যান্য মন্দির বা দেবস্থানে প্রায় প্রতিদিনই পূজো পাঠ লেগে থাকে। তাই সেই সব দেবস্থান

পরিপাটি, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন দেখায়। এ মন্দির থেকে ও মন্দিরে গিয়ে স্বয়ং জমিদারবাবু তদারকি করেন মাঝে মাঝে। এই একটা ব্যাপারে তিনি দারুণ দেবভক্ত। পুরুতদের সঙ্গে প্রায়ই পরামর্শ করেন, কি করলে পূজার তরফ থেকে খরচ কমিয়ে আয়টাকে কিভাবে দ্বিগুণ করা যায়। ভাতারমারি গাঁয়ের লোকেরা দেবদেবীর নামে যতই ভয় পাবে, বিপদ আপদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে লোকের মনে যতই যুগপৎ ভীতি ও আশার সঞ্চার হবে, জমিদারবাবুদের মন্দিরের ব্যবসা ততই রমরমা হবে। উপেন সর্দারকে দিয়ে তাই জমিদারবাবু পুরাণের সব কাহিনি ঘেঁটেঘুঁটে এমন সব যাত্রাপালা লিখিয়ে অভিনয়ের বন্দোবস্ত করাতেন, যাতে লোকের মনে দেবদেবীর ওপর ভয় এবং ভক্তি, দুটোই বাড়তে বাধ্য। ওপর ওপর দারুণ অমায়িক আর দরাজ মনের খোলস পরে রক্ষকের ভূমিকা নিলেও, পেছনে পেছনে এই জমিদারবাবুটি সর্বদাই গ্রামবাসীদের ওপর কারণে অকারণে গুন্ডাফুন্ডা লাগিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করার পর, ফের দয়ালু সেজে এমন ভাবসাব দেখাতেন, যেন তিনি নিজে উপযাচক হয়ে কেবল গ্রামবাসীদের মঙ্গলের জন্যে গাঁ চড়াও হওয়া গুণ্ডাদের কঠোরহস্তে দমন করেছেন। গাঁয়ের লোকেরা আদৌ টের পেত না যে, সেই সব গুণ্ডাগুলো জমিদারবাবুরই ভাড়া করা। গ্রামবাসীদের মনে সুস্থভাবে বাঁচার আশাটা ভ্রূণের মতো তাই দিনের পর দিন আবার বৃদ্ধি পেত।

তিনি নিজে অবশ্য বিশুকে শিবলিঙ্গ ধোয়ার দায়িত্বটা দেননি। দু'বছর হাজতবাসের পর গাঁয়ে ফিরে বিশুর এই বাতিকটার কথা শুনে কিন্তু কোন বাধার সৃষ্টিও করেন নি, তার কারণ, মন্দির নিয়মিত ধোয়া মোছা হলে লোকেরাও সজাগ হয়ে আবার নতুন করে পূজো দিতে আসবে। বছরে একমাত্র একবার শিবরাত্রির দিনটি ছাড়াও ঘন ঘন পূজো হলে মন্দিরের আয় বাড়বে। অথচ আলাদা করে কোন পয়সাও খরচ করতে হবে না, মন্দিরগুলোর সংস্কার বা ধোয়ামোছার জন্যে। মন্দিরের ভেতর গাঁজা, ভাঙ, চরস-খোরের এবং ইঁদুর, চামচিকির আড্ডাগুলোও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। আগে কিন্তু বিশু একেবারেই অন্যরকম ছিল। ঠাকুরদেবতার ধারই মাড়াত না। এমন কি নাম শুনলেই

গাঁয়ে তার কাঁপ দিয়ে জ্বর এসে যেত। তাছাড়া, তার সমবয়সী ছেলেরা যখন সারা গ্রাম জুড়ে চোরপুলিশ খেলায় ব্যস্ত, বিশু তখন বিছানায় শুয়ে অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমতো। তার মা আর ছোটভাই এ নিয়ে দিনরাত খিটখিট করলেও কোনো ফল হত না।

মা, বিনোদার মুখে তাই প্রায়ই আক্ষেপ শোনা যেত, "কি যে একটা কুম্ভকর্ণ আমি পেটে ধরেছিলাম, ভগবানই জানেন। সারাটা জীবন কি তুই এইভাবে ফালতু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটাবি নাকি, এ্যাঁ ?" ঘুমের ঘোরে মার কথাগুলো তখন ঠিকমতো বিশুর কানে যেত কি না, কে জানে।

ছোটভাই, গুঁড়ু, তো ঘ্যানঘ্যান করে কানের পোকা নাড়িয়ে দিত, কিরে দাদা, তুই না বলেছিলিস আমাদের সঙ্গে বড়মাঠে ফুটবল খেলতে যাবি। ওঠ না! কিন্তু কে কার কথা শোনে। এক পাশে ঠেলা দিলে, বিশু অন্য পাশ ফিরে শোয়। গুঁড়ুর হাজার ঠেলাতেও বিশুর ঘুম ভাঙতো না।

আর একটা ব্যাপারে বিশুকে কেউ কোনদিন টলাতে পারেনি। সেটা হল গিয়ে, স্কুলে যাওয়া। স্কুলে গিয়ে নাম লেখানোর কথা তুললেই গোঁস গোঁস করে বলত, ওসব অঙ্কফঙ্ক শিখে, এ বি সি ডি পড়ে, তো পরে সেই পরের গোলামি করতে হবে। ও আমার ধাতে সয় না। খাইয়ে দেখ না আমায় সন্দেশ, রসগোল্লা ? স্কুলের বিদ্যে না হলেও কি বলতে পারব না, খাওয়ার শেষে ক'টা খেলাম ? এর জন্যে আলাদা করে অঙ্ক শিখতে হবে কেন? স্বয়ং জমিদারবাবু উপচে এসে বলেছিলেন স্কুলের বেতন ফ্রি করে দেবেন। তাতেও টলানো যায়নি বিশুর মন। কত মামা, কাকা এলেন গেলেন, ঝরালেন গালভরা উপদেশবাণী। কিন্তু কারও কোন হামরাইতেও কোন কিছুর সুরাহা হল না।

- কোথায় তুই কাদায় গুন ফেলে নিজের আখের গুছিয়ে নিবি, তা নয়, কেবল বেঁকে বসছিস। বিনেপয়সায় স্কুলে পড়বি, এমন সুযোগ কজন আর পায় বল ? বিনোদার আক্ষেপের অন্ত নেই।

ঘুম থেকে উঠে চোখমুখ ধোয়া, দাঁত মাজা, খাওয়াদাওয়া ভুলে হাতের কাছে বিশু যা পেত তাই নিয়েই শুরু করে দিত লোফালুফি। ঢিল-ঢাল, শিশিবোতল, কিছুই বাদ পড়ত না। এমন কি

একবার পুষিবেড়ালের ছানা দুটোকে নিয়ে সে এমন লোফালুফির কসরৎ জুড়ে দিয়েছিল যে, ভয়ে ছানাদুটোর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হলেও, যারা দেখেছিল, তারা বিশুর তারিফ না করে পারেনি। একবাক্যে তারা স্বীকার করেছিল, এ বিশু নিশ্চয়ই একদিন এক মস্তবড় খেলোয়াড় হবে, দেখে নিও।

আর খুঁজে পেতে মানানসই পেয়ারাগাছের ফ্যাঁকড়া ডাল কেটে গুলতি কিংবা ডাংগুলি খেলার পাউড়ি আর গুলি বানাত। কুমোরপাড়া থেকে বাতিল করা মাটির মালসা চেয়ে এনে, তার মুখে ব্যাঙের চামড়া টান টান করে বেঁধে ঢাকের মতো বানিয়ে, কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে কাঠের দু'চাকা জুড়ে ডুগডুগি-গাড়ি তৈরি করত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিশুর কাছ থেকে এই ধরণের উপহার পেয়ে বেজায় খুশি হত। বিশেষ করে রথ কিংবা চড়কের সময়। আর বানাতো কঞ্চির পাও দিয়ে পিচকিরির মতো ছোট ছোট খোল। কাঠি দিয়ে সেই খোলের একপাশে জামরুলফুল ঠুকে ঠুকে ভরাট করার পর, অন্য পাশ দিয়ে কাঠির চাপ দিলেই পটকা ফাটার মতো আওয়াজ হত। আগুন বা বারুদের ঝক্কি না নিয়েও ছেলেদের প্রাণে পটকা ফাটানোর কি যে আনন্দ হত, তা সত্যিই কহতব্য নয়।

একবার এক বড়োপূজোর সময় ভাতারমারি গ্রামে এল এক সার্কাসের দল। সে কি হৈহৈ কাণ্ড। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সার্কাসে গিয়ে যেমন যেমন খেলা দেখে আসে, ঘরে এসে ঠিক তেমন তেমন খেলার অনুকরণ করার চেষ্টা করে। নিজেরাই কেউ কেউ হাতি, ঘোড়া, বাঘ সেজে জন্তু জানোয়ারের কেরামতি দেখায়। কেউ কেউ আবার জোকার সেজে রঙভঙ করে। বিশু তখনও নাবালক। গাঁয়ের কেউ কখনও সেদিন ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে, এই বিশুই একদিন ফট্ করে ওইরকম একটা সার্কাসদলের সঙ্গে ভিড়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। সে আজ প্রায় বছর আষ্টেক আগেকার কথা।

(৪)

“সরকারি উকিলের সব অভিযোগই তো আপনি শুনলেন। এবার বলুন, এর বিরুদ্ধে আপনার বলার কিছু আছে কি না?”, শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করেন ফৌজদারি আদালতের বিচারক। অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বিশুর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না। শুধু মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানায়, নতুন করে তার কিছুই বলার নেই। যা ঘটে গেছে গেছে, তা তো আর কোনোমতে ফেরানো যাবে না। স্বীকার করি বা নাই করি, মায়াকে তো আর জ্যান্ত করা যাবে না। অযথা কথা বাড়িয়ে কাজ কি? আইনে যা যা বলে, তাই হবে। আমি মিছিমিছি ভেবে মরি কেন? ভাবে বিশু। মুখে কোনও কথা ফোটে না।

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা হলেও আজও বিশু কোনো কিছুই ভোলেনি। তার সেই একান্ত বিপদের দিনে সে হাড়েহাড়ে বুঝেছিল, কে তার আসল আপন, কে নয়। বিচারের সেই শেষদিন অবধি ভাতারমারি গাঁয়ের কে কে নিঃস্বার্থভাবে তার পাশে পাশে ছিল। কিছুই ভোলেনি সে। শুনানির দিনগুলোয় দর্শকদের ভেতর বিশু কয়েকবার দেখতে পেয়েছিল, ভাতারমারি গাঁ থেকে এসেছে ছবি মিঞা, নবীনচাষা, আর গাঁজাখোর হাবুল। বয়সের ভারে আজ মাজা ভেঙে গেলেও একাদশীকে সঙ্গে করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আদালতে এসেছিল কামিনীবুড়িও। আর এসেছিল খানকিপাড়া থেকে সুশীলা। মায়ার সই। মা বিনোদা আসেন নি। তাই বলে এই নয় যে, বিশুর প্রতি তাঁর কোন মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা কিছুই ছিল না। আজ খুনের দায়ে কাঠগড়ায় উঠলেও হাজার হোক বিশু তাঁর নিজের পেটের ছেলে। কথায় আছে না, কুপুত্র যদিও হয়, কু-মাতা কখনো নয়। বিশু নিজেই বারণ করেছিল, তার মাকে সঙ্গে নিয়ে কোর্টে আসতে। এসে হয়ত কোর্টের ভেতর বুকপিঠ চাপড়ে পেল্লায় কান্নাকাটি জুড়ে বসবে। কামিনীবুড়ি যেদিন এসেছিল, সেদিন কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বিশুর বেশ হাসি হাসি পাচ্ছিল, একটা কথা মনে পরে যেতে। সেটা হচ্ছে কামিনীবুড়ির রেলভ্রমণ।

গাঁয়ের আর পাঁচজনের সঙ্গে রেলে চড়ে একবার কালীঘাটে তীর্থ করতে গিয়েছিল বুড়ি। ছেলের কাছ থেকে রেলের মাসিক টিকিট নিয়ে। চেকার এসে, টিকিট দেখে জিজ্ঞেস করেন,

- কি নাম, বয়স কত?

- আ মোলো যা, আমার কোন উকিল এয়েচেন, নামধাম জেরা করতি শুরু করেচেন ।

- জেরা করব না? এ তো ব্যাটাছেলের টিকিট।

- তো কি? ও আমার পোলা?

- ছেলের টিকিট নিয়ে আপনি যাচ্ছেন কি করে?

- কেন যাবু নি ? আমার পোলার টিকট নে গাঁ শুদ্দু নোক যায়, আর আমি গব্বোধারিণী হয়ে যেতি পারবুনি ক্যানো ?

(৫)

ছ'বছর সার্কাস আর দু'বছর হাজতবাস। সর্বসাকুল্যে আট বছর বাদে আবার গাঁয়ে ফিরে এল বিশু। হাজত থেকে দিনের বেলা ছাড়া পেলেও, ইচ্ছে করেই সে গাঁয়ে ফিরল রাতের শেষ ট্রেন ধরে। এ্যাদ্দিন বাদে বলে, আসতে চাইল চুপিচুপি। সবার অগোচরে। অযথা লোক জানাজানি করে লাভ কি?

ভাতারমারি স্টেশনে নেমে সেই গাঁয়ের লোকালয়ে কিংবা আশেপাশের অন্য কোন গাঁয়ে যেতে হলে সবাইকে পাবুমুদির দোকানের সামনে দিয়েই যেতে হয়। দিনের বেলাতে তো বটেই, রাতের বেলাতেও রাস্তার ওপরে তেরছাভাবে পড়া মুদির দোকানের হ্যাজাকের আলো, যে কোন পথচারীরই হদিশ জানিয়ে দেয়। কিন্তু আজ কেন কে জানে, আলোর জায়গাটুকু হনহন করে পেরোবার সময় কেউই বিশুকে চিনতে পারল না। যদিও পাবুমুদির ভাই, গবা, দোকানের সামনে একদিকের পাল্লা বন্ধ করে, দেয়ালে হেলান দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে একমনে তামাক দিয়ে

দাঁত মাজছিল আর মাঝে মাঝে রাস্তার ওপর পিক ফেলছিল। সং দেখার মতো গাঁ-শুদ্ধু লোক উপছে পড়ুক তা বিশু না চাইলেও, কেউ যে তাকে দেখেও দেখবে না, এতটা সে আশা করেনি। ভিড়ভাড় তার আর ভাল লাগে না ঠিক। হাজতে একা একা থেকে এটাই তার গা সওয়া হয়ে গেছে। তবুও কেমন যেন সব অদ্ভুত মনে হয় বিশুর। গাঁয়ে ঢুকে, এমন থমথমে ভাব দেখে।

বাড়ি পৌঁছে সদর দরজায় বিশুর ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ শুনে প্রতিবেশীদের অনেকে হ্যারিকেন হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। কে এল আবার এত রাতে? জানার জন্যে সবাই আগ্রহী হয়।

বাড়ির ভেতর থেকে বিশুর মা আর ভাই, গুঁড়ু, প্রায় একই সঙ্গে শুধোয়, "কে রে? এত রাতে কে কড়া নাড়ে?"

যতটা গলা ছাড়লে আওয়াজটা শুধু ওদের কানে গিয়ে পৌঁছায়, গলার স্বরটাকে ঠিক ততটাই উঁচু করে বিশু জানায়, "আমি গো মা, আমি, তোমার বড়ছেলে বিশে, দরজা খোলো মা!"

হাঁইফাঁই করে এসে বিনোদা সদর দরজা খুলে বিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। হাউমাউ করে কেঁদে কেঁদে বলেন, "ওমা, আজ আমার কপাল খুলে গেছে গা। ঘরের ছেলে ঘরে এয়েচে। কালই আমি বিবিমাতলায় গিয়ে পূজো দেব। মা আমার ছেলেকে অক্ষত শরীরে ফিরিয়ে দিয়েচেন। তা, হ্যাঁরে, এ কি তোর শুকনো চ্যায়রা হয়েচে রে? এ্যাদ্দিন ওরা কি তোকে ঠিকমত খেতে পরতেও দেয়নি? যা, কলঘরে গিয়ে হাত পা ধুয়ে আয়। আমি তোর জন্যে খাবার বাড়ি।" বিশু শুধু বলে, "না, কেন এতো ব্যস্ত হচ্চো মা, আমার কোনো খিদে নেই। দেরি করে বাড়ি ফিরলে আগের মতো যে বাড়ি নিয়ে তেড়ে এলে না, এতেই আমার পেট ভরে গ্যাচে। এখন টেনে একটা লম্বা ঘুম দেব।"

জেল হেফাজতে কতদিন রাতে তার ঠিক ঘুম হত না। দেওয়ালে দেওয়ালে ছারপোকার ঘুপটি। অন্ধকার হলেই পিলপিল করে বেরিয়ে এসে কুটকুটুনির আদরের জ্বালায় বিশুর প্রাণ অতিষ্ঠ করে

তুলত। বাড়ির সদ্য কাচা চাদর ঢাকা গদিওয়ালা বিছানায় গড়িয়ে আরামে ঘুম দেওয়ার চিন্তায় মায়ের সঙ্গে সে আর কোন কথা কাটাকাটির মধ্যে যেতে চাইল না।

বিনোদা শুধু বলেন, “তোর সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা যায় না । সব ইয়েতেই বাড়াবাড়ি।”

পাশের বাড়ির বড়বৌ পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি মারে। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, “কি বিনুদি, কে এলে গা এত রাতে তোমার কাছে?”

অন্য সময় হলে বিনোদা নির্ঘাৎ মুখঝামটা দিতেন। যদিও মনে মনে ভাবলেন, ঘুঁটে পোড়ে আর গোবর হাসে, আঁটকুড়িদের মরণও হয় না। কিন্তু আজ আর অমন সময় নয়, তাই স্বাভাবিকভাবে হেসে ছোট্ট করে উত্তর দিলেন, “আমাদের বিশে গো।”

তারপর অযথা আর কথা বাড়াবার সুযোগ না দিয়ে দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজাটার পাল্লাটা।

(৬)

সার্কাস দলের সঙ্গে কত জায়গাতেই না ঘুরেছে বিশু। কত রকমের খেলাই না সে দেখিয়ে বেড়িয়েছে ছ’বছর ধরে। পেয়েছে কত তারিফের হাততালি। তারপর অকস্মাৎ একদিন ঘটে গেল দুর্ঘটনা।

বাইরে থেকে দেখলে লোকে তা-ই বলবে। আর বিশুর নিজের জবানিতে বলতে গেলে, বলতে হয়, - করলাম, কিন্তু কেন করলাম, কিসের চাপে করলাম তা তো জানিনা, স্বপ্নেও যা ভাবিনি তাই এবারে করে বসলাম। শুধু জানি, এই আক্ষেপটুকু আমাকে আজীবন কুরে কুরে খাবে।

সমবেত জনতার চোখের সামনে করল বিশু। আড়ালে আবডালে নয়। ভুল, বড় মারাত্মক ভুল করল সে। ছুরির খেলাটা দেখাতে গিয়ে। তির্যকভাবে দুদিক থেকে আলো এসে পড়েছে রিংয়ের

মাঝখানে। তাছাড়া আর সবই অন্ধকারে। রিংয়ের চারপাশে কৃত্রিম কুয়াশা সৃষ্টি করায় খেলার উপযোগী তৈরি করা আবহসঙ্গীতের বাদকদের কাউকেও চাক্ষুষ দেখা যাচ্ছে না। রিংয়ের মাঝখানে শুধু বিশু আর মায়া। আর বিশুর পাশে তার সহকারি, চাহিদামত ছুরি জোগান দিতে প্রস্তুত। চাকা লাগানো কাঠের পাটাতনের গায়ে দাঁড়ানো মায়া, প্রসারিত হাত দুটো দড়ি দিয়ে টান টান করে বাঁধা। আর পা দুটোও, তবে প্রসারিত নয়। একত্রে জড়ো করা। এক একটা ছুরি ছুটে যাচ্ছে বিশুর হাত থেকে পাটাতনের দিকে, গিঁথে যাচ্ছে মায়ার দেহের সীমানায়। আবহসঙ্গীতের ঝংকারের সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন হাততালি পড়ছে কৃত্রিম কুয়াশাঘেরা পরিবেশে।

শেষ ছুরিটা বিশুর হাত ফসকে বেরিয়ে যেতেই, বিশু নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে দুহাতে মুখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে। চোখের পলকে, দর্শকরা কিছু আঁচ করার আগেই, সার্কাসের অন্য সবাই একটা কালো কাপড়ে ঢেকে পাটাতনের গায়ে বাঁধা মায়াকে গড়িয়ে নিয়ে চলে যায় তাঁবুর বাইরে। তির্যকভাবে আসা আলোটা ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকে। দর্শকরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাততালি দেওয়ার পর যে যার মতো একে একে যেতে শুরু করে। কেন করল বিশু এমন ভুল? প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে বিশু ভাবে, যাকে আমি এক জীবন থেকে উদ্ধার করে আনলুম, তাকেই আবার শেষ করে দিলুম নিজের হাতে?

পাটাতনে আটকানো মায়ার মুখে সবসময় লেগে থাকত এক মনভোলানো হাসি, আর চোখে এক রমনীয় আভা। সেই হাসি, সেই আভা ধীরে ধীরে কুয়াশার মতো মিলিয়ে গিয়ে, তীব্র যন্ত্রণার এক ছোপ বুলিয়ে দেয় তার সারা মুখে। মাথাটা ঝুলে পড়ে সামনের দিকে। আঘাত পেলে বা পাওয়ার আশঙ্কা দেখলে সাধারণত যে ধরণের প্রতিক্রিয়া হওয়া মানুষের স্বাভাবিক, তার উপায়টুকু পর্যন্ত ছিল না মায়ার। কুঁকড়ে যাওয়ার বা ছটফট করার কোন সুযোগই পায়নি মায়া, হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। এমনকি বুকের ছুরিবেঁধা জায়গাটা যে একবার দুহাতে আঁকড়ে ধরে যন্ত্রণার উপশম করবে, তারও কোন উপায় ছিল না। এ সত্ত্বেও কিন্তু সেদিন কেউ টের পায়নি, মারাত্মক কিছু

একটা ঘটে গেছে। চিৎকার করে খেলাটা ভণ্ডুলও করে দেয়নি মায়া। মুখ বুজে সার্কাসে যেমন এসেছিল, তেমনি মুখ বুজেই চলে গেল।

তাঁবুর বাইরে মানেজারবাবু নিজে এসে মায়ার বুকে গেঁথা ছুরিটা টেনে বের করে নিয়ে চিৎকার চেঁচামিচি জুড়ে দেন, “কিরে, তোরা হাঁ করে কি দেখছিস, ন্যাকড়া দিয়ে চেপে ধর জায়গাটা। এত রক্ত বেরোলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই ফুরিয়ে যাবে।”

হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সেইসব কাপড়চোপড় দিয়ে সকলে আপ্রাণ চেষ্টা করে পাটাতনশুদ্ধু মাটিতে শোয়ানো অবস্থায় মায়ার রক্তক্ষরণ বন্ধ করার। মাত্র একবার মায়া চোখ খুলে তাকায়, দেখতে পায় চোখের সামনে অনেকগুলো মানুষের মুখ আর মেঘবহুল আকাশে আবছা আবছা রোদের ছোঁয়া। তারপর সে চোখ বুজিয়ে ফেলে।

ডাক্তারবাবু এসে ক্ষতটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “কে করেছে, কার কাজ এটা?”

আমতা আমতা করে এগিয়ে এসে রক্তমাখা ছুরি হাতে ধরা ম্যানেজারবাবু বলেন, “আজ্ঞে, আমি।”

“আপনি? সবার চোখের সামনে খুন করলেন?” – বললেন ডাক্তারবাবু ।

তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হাতে সময় খুব অল্প, অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিলে আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। পারেন তো আপনাদের কেউ গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে চলুন। আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আর পুলিশেও এক্ষুণি একটা খবর দিয়ে দিন। মার্ডার কেস বলে কথা।

ম্যানেজারবাবু ডাক্তারবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, ছুরিটা আগে থেকে বুকে গেঁথা ছিল। তিনি শুধু টেনে বের করেছেন।

- ওসব রূপকথার গপ্পো আমাকে বলে লাভ কি?

- আপনি বুঝছেন না। ছুরিটা আমি মারিনি ।

- মারেননি মানে? আকাশ থেকে উড়ে এসে বুকে গিঁথে গেল? আর গিঁথেও যদি যায়, তাহলে টেনে বের করতে গেলেন কেন? গিঁথে থাকলে তো ভালই হতো, এত রক্ত বের হত না। আমি ডাক্তারি করতে এসেছি, আপনার কোনো অজুহাত শুনতে আসিনি। যা বোঝাবার তা পুলিশ বা আদালতকেই বুঝিয়ে বলবেন। আমায় বলছেন কেন?

মায়াকে ধরাধরি করে কোনরকমে গাড়িতে তুলে নিয়ে ডাক্তারবাবু আর সার্কাসের দুজন লোক মিলে হাসপাতালের দিকে রওনা দিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে পুলিশ আসে। খুনিকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে ভেবে দারোগাবাবু উল্লসিত হয়ে ওঠেন। ম্যানেজারবাবুর উদ্দেশ্যে বললেন, "খুনের কোনো নিশানা পেতেই বছরের পর বছর আমাদের হিমসিম খেতে হয়, কোন সুরাহা হয় না। আর আপনি খুনের অস্ত্রসমেত ধরা দিয়ে আমাদের কাজটা কি যে লাঘব করে দিলেন। এর জন্যে আমি আপনার প্রশংসা না করে পারছি না।"

ম্যানেজারবাবু আবার বলার চেষ্টা করেন যে, এটা কোনো খুন নয়। সার্কাসের খেলা দেখাতে গিয়ে খেলোয়াড় বিসমিল্লা মানে বিশু...

দারোগাবাবু পুলিশকে দিয়ে ম্যানেজারবাবুর কোমরে দড়ি বাঁধিয়ে এবার জানান, খুনি সন্দেহে আপনাকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০৭ নম্বর ধারায় আপাতত গ্রেপ্তার করা হল। আপনার বিরুদ্ধে যায় এমন কোন মন্তব্য না করাই ভাল, আপনার যা বলার, কেস উঠলে আদালতে দাঁড়িয়েই বলবেন।

সার্কাস ফাঁকা হতে বিশু উঠে দাঁড়ায়। মনমরা হয়ে তাঁবুর বাইরে গিয়ে পুলিশ ম্যানেজারবাবুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে একজন পুলিশ এগিয়ে এসে তার পেটে লাঠির

গুঁতো মেরে বলে, পুলিশের কাজে বাধা, চল শুয়োরের বাচ্চা, তোকেও পুরে দিই গারদে। ভাল চাস তো, কেটে পড়।

অন্য একটা পুলিশ জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁটে দোক্তা চেপে বিশুর কণ্ঠি পাকড়ে ধরে হুমকি দেয়, পুলিশের গায়ে হাত! পেঁদিয়ে বৃন্দাবন ছুটিয়ে দেব, মেরে কত ঘাঘুমালের চামড়া ছাড়িয়ে দিয়েছি, তোরও বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব।

দুজনকেই ধরে নিয়ে গেল পুলিশ।

তখন থেকে তাঁবুর পাশে তেঁতুলগাছে কা কা করে ক্রমাগত ডেকে চলেছে কয়েকটা কাক। মুনিয়া মুখ ঝামটা দেয়, আঃ খেলে যাঃ, ডাকার আর সময় পেলি নি তোরা? মরণ হয় না তোদের? হুস হুস শব্দ করে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করতে তারা কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে যায়। পরে কাকগুলো সমস্বরে কা কা করতে করতে উড়ে চলে যায় অন্য কোথাও। যেখানে তাদের ডাকে কেউ বাগড়া দেবে না।

(৭)

বিশুর বিচার হল। তদন্তের পর বিচারের রায় বেরোতে স্বভাবতই অনেক সময় লেগে গেল। সেই সুবাদে বিশুর দু’বছর হাজতবাস। খুনের দায় থেকে পরে বেকসুর খালাস পেলেও, আর কিন্তু বিশু তার পুরোনো সার্কাসের দলে ফিরে যেতে পারেনি। যে খেলা দেখাতে গিয়ে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল, সে খেলা আবার দেখানোর হিম্মৎ হয়নি তার।

নিজের গাঁয়ে ফিরে আসার যে কি মহিমা, তা আজ বিশু হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। যদিও এ গাঁয়ে অনেক কিছুই কেমন যেন ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। অন্য জায়গা, অন্য দেশ আর যেমনই হোক না কেন, এ গাঁয়ের সঙ্গে তুলনাই হয় না, এ গাঁয়ের মর্যাদাই আলাদা। তা, নিজেদের মধ্যে যতই

ঝগড়াঝাঁটি বা দলাদলি থাকুক না কেন, এত শান্তি আর যেন কোথাও পাওয়া যায় না। বিশু যেন সেটা আবার নতুন করে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে।

নতুন কোনও কিছু করার আগে বিশু প্রথমে মনে মনে ঠিক করে নিয়ে ছিল, গাঁয়ে ফিরে সেরকম নির্দিষ্ট কিছু আপাতত করবে না। তবু সে কেমন করে কখন মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে শিবলিঙ্গ ধোয়া আর ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের দু'দফায় রাস্তা পারাপার করে দেওয়ার কাজটা হাসিল করল, তা সে নিজেই জানেনা।

রাতের অন্ধকারে সেদিন গাঁয়ে ঢুকেই তার মনে কেমন যেন একটা খটকা লাগে। কেন তাকে দেখেও কেউ চিনতে পারল না? এমন কি, একটা কুকুরও তার দিকে তেড়ে এল না, ঘেউ ঘেউ করে। পাবুমুদির দোকানের কাছে গবা তাকে চিনতে পারেনি বলে বিশু নিজেকে মনে করেছিল, সে যেন এ গাঁয়ের এক অচেনা মানুষ। কিন্তু তেলেভাজাওয়ালা গুণোমনির দোকানের মাচার নিচে শুয়ে থাকা তাগড়া কুকুরটাই বা তেড়ে এল না কেন? ও কি তবে বিশুকে চিনতে পেরেই চুপ করে রইল? না কি, অন্য সবার মতো কুকুরটাও ওকে এড়িয়ে যেতে চাইল। পরের দিনই তার নজরে পড়ে ভাতারমারি গাঁয়ে এ পাড়ায় ও পাড়ায় আগের মতো তেমন আর সদ্ভাব নেই। আগে বিশু ছিল সকলের, সারা গাঁয়ের। এখন থেকে নিজেকে বিশুর কেমন যেন ছাঁটা ছাঁটা মনে হতে লাগল, সে যেন এখন অনেক ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

ক্ষমতাশালী বলতে এ গাঁয়ে তখন প্রথমদিকে ছিলেন একমাত্র জমিদারবাবুরা। গাঁয়ের ভালমন্দ সব কাজের তদারকি তাঁরাই করতেন। ছোটখাটো মামলার ফয়সালাও তাঁরা নিজেরাই করে নিতেন। কোর্টকাছারির প্রয়োজন হত না। পরে আস্তে আস্তে সেই একচেটিয়া ক্ষমতা ভাগাভাগি হতে শুরু করল। জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ হবার পর জমিদারবাবুরাই যখন সদ্য বেকার নায়েবমশাইকে ভাতারমারি গাঁয়ের মোড়ল বলে ঘোষণা করলেন, তখন গাঁয়ের কেউ কোন আপত্তি করেনি। যদিও

এই নায়েবমশায়ের খাজনা আদায়ের জ্বালায় গ্রামবাসীরা তিতিবিরক্ত হয়ে যেত প্রতিবছর। মিউনিসিপ্যালিটির একটা ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হল এই গ্রাম। আর জমিদারবাবুই নিজের মনোনীত একজনকেই ভোটে জিতিয়ে এ গাঁয়ের নির্বাচিত কমিশনার করে দিলেন। ক্ষমতাটা আপাতদৃষ্টিতে ভাগাভাগি হয়ে গেলেও, পেছন থেকে কিন্তু তিনি সব ব্যাপারে একাই ছড়ি ঘোরাতেন। বাইরে থেকে দেখে মনে হত এ গাঁয়ের সবাই যেন কেমন সুখে শান্তিতে আছে, একজোট হয়ে মিলেজুলে কাজ করছে।

বিশুই স্পষ্ট উপলব্ধি করে, সেই একজোট হয়ে কাজ করার যে রেওয়াজ এতদিন এ গাঁয়ে বহাল ছিল, তা যেন উবে গেছে। দলাদলি শুরু হয়ে গেছে পাড়ায় পাড়ায়। লোকে সবসময় ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছে ঝগড়া, দাঙ্গা বাধানোর। শুধু টেক্কা দেবার আর রেষারেষির পালা। শুনল, এপাড়া ওপাড়ায় কয়েকবার মারামারি, কাটাকাটিও হয়ে গেছে। মামুলি ছুতোয় বেঁধেছে কোঁদল। এমন কি যাত্রাদল, ফুটবল প্রতিযোগিতা আর দুর্গাপূজোও আজ আলাদা আলাদা। পরস্পরের প্রেমে পড়াও যেন অচল হতে চলেছে, এপাড়া ওপাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

ফুটবল নিয়ে এ গাঁয়ে আগে যে ঝগড়াঝাঁটি বাঁধত, সেটা কিন্তু খেলার মান বা হারজিৎ নিয়ে নয়। চারদশের প্রতিযোগিতায় যে দল বয়স্ক খেলোয়াড়দের কোমরে কষে বেল্ট বেঁধে উচ্চতা কমিয়ে খেলাতো, সে দল হেরে গেলে সবাই টিটকিরি দিত। কিন্তু জিতে গেলেই বেঁধে যেত তুলকালাম কাণ্ড। হুড়িয়ে নেবার দরুণ। বেশ কিছুদিন ধরে আবহাওয়া থমথম করলেও কয়েকদিন বাদেই আবার সব আগের মতো ঠিকঠাক হয়ে যেত। আর অবস্থা স্বাভাবিক হলে আগের মতই সবাই একজোট হয়ে ফন্দি আঁটত, জমিদারবাবুর পেছনে লাগার। আগে যেমন এ গাঁয়ে জমিদারবাবু ছিলেন একাই সব। কেউ তাঁর কোন অবমাননা করার কথা চিন্তাই করতে পারত না। সে দিনকাল আর নেই। আজ লোকে জমিদারবাবুর বিরুদ্ধাচরণ করতে পেছপা হয় না। সামনাসামনি না হলেও গ্রামবাসীরা পেছনে লাগার কায়দাকানুনগুলো জমিদারবাবুর কাছ থেকেই ভাল করে রপ্ত করে

নিয়েছে এতদিনে। জমিদারবাবুও যে সেটা একেবারেই টের পাচ্ছেন না, তাও বলা যায় না। তবে তিনি ধৈর্য্য ধরে ঠিক সময় ঘাই মারবার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন। দিনের হালচাল খারাপ, ইংরেজরা থাকার সময়ে যে দাপট ছিল, তা এখন দেখাতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। এখন আর হুমকি দিলে কাজ হয় না। বাবা বাছা বলে সব করাতে হয়। শুধু দাদাগিরি করার মেয়াদ যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, তা তিনি ছবি মিঞার নির্বাক প্রতিবাদের বহর দেখে আগেই বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন। যদি সবাই এ গাঁয়ে ছবি মিঞা হয়ে যায়, তাহলেই শিরে সংক্রান্তি। জমিদারির আভিজাত্যের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অন্য ফন্দি না নিলেই নয়।

বিভিন্ন পাড়ায় দুর্গাপূজোর ব্যাপারটাও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আজ গাঁয়ে পূজোর ক'দিন চার চারটে বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ এসেছে গ্রামবাসীদের। আগে যখন একমাত্র জমিদারবাবুর বাড়িতে পূজো হত, তখন যে গ্রামবাসীরা আনন্দ একেবারেই পেত না, তা নয়। তবে সে আনন্দ যেন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, কেমন যেন ঝিমিয়ে থাকত জমিদারবাবুর নানারকম বাধানিষেধে। বিশেষ করে যাদের বাড়িতে সারাবছরই ভাত বাড়ন্ত, তারা এই পূজোর ক'দিন কাঙালি ভোজনে পেটভরে খায়। আর সচরাচর আধপেটা খেয়ে থাকা দিনযাপনের সমস্ত অভাবটা তারা যেন একসাথে এই সুযোগে সব উশুল করে নিতে চায়। বলা তো যায় না, আবার কে, কবে, কাদের বাড়িতে লোক খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করবে। বিয়ে, শ্রাদ্ধ, আঁশপান্না কিংবা কারো কারো অন্নপ্রাশনে।

যে কারণেই হোক, গ্রাম থেকে অনেকে যেমন সুযোগ পেলেই বড় শহরে পালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি শহর থেকেও কিছু কিছু লোক স্বেচ্ছায় গ্রামমুখী হচ্ছে। এটাও একটা নতুন লক্ষণ। নতুন পাশকরা ডাক্তারবাবু বা রানীবামনী তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে যেমন এ গাঁয়ে এসেছেন, তেমনি নবীনচাষার ছেলে, ক্যাবলা, সেই যে শহরে পালিয়ে গেছে আর ভুলেও এমুখো হয়নি। গাঁ থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকেদের নিয়ে যেমন গুঞ্জন চলে, তেমনি নতুন যারা এ গাঁয়ে আসে তাদের নিয়েও বেশ কিছু

কানাঘুষো হয়। আগেকার সবকিছু ছেড়ে যারাই অন্য কোথাও গিয়ে আস্তানা গাড়তে চায়, তাদেরকে যে প্রথম প্রথম সবাই সাদর অভ্যর্থনা জানাবে এমন কোনো কথা নেই। অতিথি হিসেবে এলে খাতিরের বহরটা ক্রমশ থাকার মেয়াদ বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু যখনই প্রকাশ পায় এই স্থিতি দীর্ঘমেয়াদি তখনই শুরু হয়ে যায় দুই তরফেই টানাপোড়েন। লোকে ভাবতে শুরু করে, এই বুঝি জমিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আমার বাড়া ভাতে ভাগ নিতে অথবা ছাই দিতে এল। আগে লোকের সঙ্গে কথা বললে কেউ কোনরকম সন্দেহ করত না। আর আজ? কিছু বলার আগেই লোকে মনে করে, নিশ্চয়ই ব্যাটার কোন বদ মতলব আছে। এই জমিদারবাবুকেই দেখুন না, উনি গাঁয়ে এক প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও, কেন নিজের খালি কাছারিঘরটা ভাড়া দিয়ে একজন নতুন ডাক্তারকে এনে বসিয়ে দিলেন। কেন উনি বাজারচত্বরে ছোট ছোট কুঠি বানিয়ে পেতলকাঁসার বাসনের দোকান, একটা চুলকাটার সেলুন, একটা মনিহারি, আর একটা তেলেভাজার দোকান বসালেন, তা গাঁয়ের লোকেরা প্রথমদিকে বুঝে উঠতে পারেনি। পরে ব্যাপারটা সবার কাছে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হওয়াতে গাঁয়ের সবাই একে একে বিরোধিতার পথ নিতে শুরু করে। কুমোরদের একমাত্র জীবিকা বন্ধ হওয়ার জোগাড়। মাটির জালা, হাঁড়ি, খুরি, ম্যাজলা, কলসি পেতলকাঁসার দোকানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিক্রি করা দুরূহ হয়ে ওঠে। নিজের আত্মীয় কিশোরী ডাক্তারের প্রতিপত্তি খর্ব করতে নতুন ডাক্তার, আর ওষুধ বিক্রির একটা আলাদা দোকান। গাঁয়ের একঘর নাপিতও রেহাই পেল না জমিদারবাবুর কোপ থেকে। পাবুমুদি আর তেলেভাজাওয়ালা গুণোমনিও তার সামিল হল। এরা সবাই জমিদারবাবুর কার্যকলাপের প্রতি কোন না কোন বারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল। বিশেষ করে যখন গাঁয়ের পথঘাট উন্নয়ন বাবদ সরকারি অনুদান পেয়ে জমিদারবাবু নিজের বাড়ি থেকে রেলস্টেশনের পাশ দিয়ে বাস রাস্তা অবধি রাস্তাটাকে পাকা করে বাঁধিয়ে নিয়েছিলেন। এমন কি বিদ্যুতের লাইন আসায়, সেটা ওই পাকা রাস্তা বরাবর একমাত্র জমিদারবাবুর বাড়িতেই গিয়ে পৌঁছেছিল। ফল্গু নদীর মতো গাঁয়ের লোকেদের মনে ভেতরে

ভেতরে একটা বিক্ষোভের ধারা বইছে, সেটা কেউ বাইরে থেকে টের পায় না। বারুদ আছে অঢেল, এখন শুধু আগুনের ফুলকির অপেক্ষা।

(৮)

ছেলেরা আবার বিশুর পেছনে লাগছে দেখে তেলেভাজাওয়ালা গুণোমনি ওদের একদিন আচ্ছা করে ধমকে দেয়।

- এই পচা, এই জালু, ইদিকে আমার কাছে আয় দিকি এগ্‌বার। আচ্ছা, তোরা রোজ রোজ বিশের পিছে লাগিস ক্যানো বল তো? ও তোদের কোন বাড়া ভাতে ছাই দিতে গ্যাছে যে, এত উস্কোচ্ছিস? শিবচান করায় বলে, ভেবেছিস, ও বদ্ধপাগোল? ওরে, একটা কথা তোরা জেনে রাখ, ওর মতো দিলদরিয়া মানুষ বড় একটা দেখা যায়না আজকাল। তোদের মতো বয়সে ও ছিল এ গাঁয়ের একমাত্র বিপদতারণ মধুসূদন। যে কাজই হোক না কেন, সবেতেই বিশে। নিঃস্বার্থভাবে পরের উপ্‌গার না করতি পেলে ওর যেন ঘুমই হত না। আর তোরা? তোদের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই... পরোপকারী স্বভাবটা কিন্তু আগের মতোই বিশের এখনো অটুট। স্বচক্ষে দেখলি না তোরা?

- কি দেখলাম আবার? উসখুস করতে করতে জিজ্ঞেস করে ছেলেরা।

- মলিনার জন্যে শহরের বড় হসপিটালে চিকিৎসের বন্দোবস্ত করে দিলেন নতুন ডাক্তার। কিন্তু ট্রেনে যাওয়ার অনেক ধকল বলে সরাসরি গাড়ি করে পাঠানো হল।

- খেয়েছে রে, বুড়ো শালা এবার ইঞ্জিরি বলছে। ছেলেদের মধ্যে কে যেন ফোড়ন কাটে। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসিও করে। আর অন্য একজন উত্তর দেয়, এ আর নতুন কি? সবই তো আমরা নিজের চোখেই দেখেছি।

- দেখলে কি হবে? কিছুই শিখ্‌লিনি। মলিনাকে বিছানা থেকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে কে তুলে দিয়েছিলো গাড়িতে?

- জানি, বিশুপাগলা। সারাদিন শিবের মাথায় জল ঢালা ছাড়া আর তো কোন কাজ নেই। তা মলিনাদিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে কি এমন আহামরি বাহাদুরি কাজ করেছে শুনি? আর এতে শেখারই বা কি আছে?

- ও তোদের পুঁচ্‌কে বিট্‌কেলে মাথায় ঢুকবে না। মলিনা যুবতী মেয়ে, আর কেউ তো ভরসা পায়নি এত অনায়াসে পাঁজাকোলা করতে। শরমে বাধছিল। বিশে কিন্তু পারলে। তাই বলে তো, ওকে পাগলা বলা যায় না। ও তোরা এখন বুঝবি না, পরে বয়েস হলে বুঝবি।

সন্তে বলে, "গুণোমনিজ্যেঠু, জ্ঞানের কথা তো অনেক শোনালেন, এবার একটু আমাদের পেটের খ্যাঁটের কথাটা ভাবলে কেমন হয়? আমাদের সবার পেট জ্বলছে, আপনি ওই আপনার ফাউয়ের গোটাকতক ফুলুরি আর আলুর চপ আমাদের দিয়ে দিন, ব্যস, পেট চুপ করে যাবে।"

- ফাউ মানে? এটা কি তোদের বাপকেলে মাগ্‌নার দোকান? এখানে কেবল ফেলো কড়ি, মাখো তেল...

- আমি কি তোমার পর? - খোঁচা দেয় সন্তে – "আরে জ্যেঠু, তেল কে চেয়েছে আপনার কাছে? কয়েকটা ফুলুরি..."

কথা শেষ করার আগেই হাঁক্‌রে ওঠে গুণোমনি – "চোপ, ফের মুখের ওপর কথা, ফক্কর ছেলে কোথাকার?"

তেলেভাজার ঝাঁঝরি হাতে মারমুখী গুণোমনি দোকান থেকে বেরিয়ে তাড়া দিতে গিয়ে ধুতিতে পা আটকে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তবুও ছেলেদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললে, "বিশের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে, দেখবি, ও তোদের জন্যে জান লড়িয়ে দিচ্ছে, হ্যাঁ।" মাটিতে পড়ার ফলে বাঁ হাতে বেশ চোট লেগেছে। দোকানের ভেতরের আধবোজা দরজার দিকে চেয়ে এইবার সে চিৎকার

জুড়ে দেয়, “আ মোলো যা, হাতটা বোধহয় ভেঙেই গেছে, ও আন্নার মা, একবারটি বাইরে এসে দেখো না গা, ওরে বাবা, কি টনটন করছে।”

অনেক দূর পালিয়ে গিয়েও আবার কি মনে করে সন্তে গুণোমনির কাছে ফিরে যায়। গুণোমনি তখনও মাটিতে আধশোয়া। সন্তুকে ফেরত আসতে দেখে এবার দ্বিগুণ চটে গিয়ে বলে, “ফের ঢং দেখাতে এয়েছিস, গো-ভাগাড়েও তোদের স্থান জুটবে না, এই বলে দিলুম, যা পালা! দূর হ’ আমার চোখের সামনে থেকে!”

সন্তে শান্ত গলায় উত্তর দেয়, “না, দাদু, মানে জ্যেঠু, আমি শুধু আপনাকে মনে করিয়ে দিতে এলুম, ধুতির বদলে হাফপ্যান্ট পরলে কিন্তু আপনার এমন দুর্দশাটি হত না।”

গুণোমনি সন্তের এই টিটকিরির কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখাবার আগেই সে পিট্টান দেয়। অন্য ছেলেরা সন্তের এই ব্যবহারে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু কেন যে সন্তে হঠাৎ হাফপ্যান্টের প্রসঙ্গ তুলল, তা তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সন্তেই ব্যাপারটা খোলসা করে বলে, “জানিস না, ওই বুড়ো ভাম আমায় দুর্গাভাসানের সময় কি বলেছিল? সবাই যখন দুর্গামূর্তির কাছে গিয়ে কানে কানে যে যার মনের অভিলাষ প্রকাশ করার জন্যে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছে, এই বুড়ো তখন আমার কাঁধে টোকা দিয়ে বলেছিল, যা, মায়ের কাছে কামনা করে বল্ গে, মা, আমায় ধুতি পরতে শিখিয়ে দাও, মা। বাঙালির ছেলে হয়ে জন্মেও তোরা নিজেদের পোশাক পরা শিখলিনি। সায়েবরা তো কবে আমাদের দেশ থেকে বিদেয় হয়েছে, কিন্তু তাদের সেই পোশাকআশাকের ভড়ংটা আজও থেকে গেছে। যতসব ইয়ে! যা, বল্ গিয়ে মাকে। ভেবে দেখ, মা দুর্গাকেও যদি বিদেশের মাইয়াদের মতো পোশাক পরানো হতো, তাহলে...” বলে আমার মাথায় একটা গাঁট্টাও মেরেছিল বুড়ো। জীবনে কি আর ওসব ভোলা যায়?

ছেলেছোকরারা বিশুর পেছনে লাগলেও, এ গাঁয়ের আইবুড়ো যুবতী মেয়েদের মনোভাব অবশ্য অন্যরকম। বিশুর শিবচান করানোর ব্যাপারটায় তারা মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করতো। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতো, আসছে জন্মে নিশ্চয়ই ও মেয়ে হয়ে জন্মাবে। আর শিবরাত্রির দিনে পূজা-অর্চা না করেই পেয়ে যাবে শিবের মতো বর।

বিশুপাগলা এইসব মেয়েদের দেখে সবসময় মিটিমিটি হাসত বটে, কিন্তু সেই হাসির ভেতর কোথায় যেন কিসের একটা দমফাটা আর্তনাদ লুকিয়ে থাকত, তা মেয়েদেরও নজর এড়াত না।

(৯)

বিশুর কানে সবসময় গোঁজা থাকত একটা পেন্সিল আর ট্যাঁকে থাকতো ছোট্ট একটা নোটবুক। ভাতারমারি গাঁয়ে কোথায়, কি ঘটল, তা সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে টুকে রাখত নোটবুকে। স্থান-, কাল- আর পাত্রসমেত। গাঁয়ের অনেক ঘটনা গাঁয়ের লোকেদের কাছে প্রকাশ না পেলেও, কোন কিছুই বিশুর অগোচরে থাকত না। তা সত্ত্বেও বিশু নিজের চোখে যা দেখেছে, নিজের কানে যা শুনেছে, নোটবুকে সবকিছু লিখে রাখলেও, অন্য আর কাউকে সে খবর জানতে দিত না। এইখানেই বিশুর সঙ্গে পাবুমুদির আমূল পার্থক্য। পাবুমুদি কস্মিনকালে কদাচিৎ নিজের দোকান ছেড়ে বের হত বলে পাবুমুদির কাছে গাঁয়ের যেসব খবরাখবর পাওয়া যেত, তা শুধু পরের মুখে খাওয়া ঝাল। অন্যেরা এসে যেসব খবরাদি করত, তাতে আর কোন গাঁজাখুরি খবর মিশে গেছে কিনা, তা বিচার করার কোন মৌকাও মিলত না। সে তুলনায় বিশুর খবর টাটকা। চাক্ষুষ দেখা খবর হলেও, সাধারণ জনতা সেইসব খবরের কোন ইশারাও পেত না ।

ভাতারমারি গাঁয়ে কে কিসের রোগে ভোগে, কে কি দিয়ে রোজ দাঁত মাজে - ঘুঁটের ছাই, গুলে তামাক, নিম না আসশেওড়ার ডালের দাঁতন কিংবা দোকানে কেনা কোন মাজন দিয়ে, কে কোথায় কবে কিভাবে পটল তুলল, আমকাঁঠালের মরশুমে কার গাছে কটা পাকা ফল সড়েলে খেল, কার

আমগাছের ক'টা ডাল ফলের ভারে ভেঙে পড়ল, কার পুকুরে কারা মাঝরাতে জাল ফেলে মাছ চুরি করতে গিয়ে পুকুরে ফেলা বাঁশের খোঁচায় জাল ছিঁড়ে ফেললে, কোন মেয়েটা কোন ছেলের সঙ্গে খুনসুটি করতে শুরু করেছে, এইসব খবর বিশু জানত। জেনেও চুপ করে থাকত, কাউকে নিজের মুখে জানাত না। আর এসব খবর একমাত্র সে ছাড়া আর অন্য কেউ জানে না বলেই হয়ত সে মনে মনে কেমন যেন এক পরম স্বস্তি বোধ করত।

অনেক ঘটনার খবর বিশু জানত ঠিক, কিন্তু কেন যে সেই ঘটনা ঘটল, তার হদিশ সে পেত না সবসময়। এই তো সেবার, বগার লাশটা তেপলতেগাছ থেকে নামাবার সময় বিশুই লোকেদের বলেছিল, কাঁটাভরা গাছে উঠে লাশ নামানোর চেষ্টা না করে গাছটাকে কেটে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যায়। অন্যথায় নিজেদেরও অযথা জখম হবার ঝুঁকি আছে। "কেটেই ফ্যাল না ওই অকেজো গাছটাকে", বিশুপাগলার সেই মন্তব্যকে সেদিন কেউ উপেক্ষা করেনি, উল্টে বরং তারিফই করেছিল। বগার আত্মহত্যার দিনটা টুকে নিয়েছিল বিশু, ক্ষণটা ঠিক জানা যায়নি, মহকুমা শহর থেকে পুলিশ আসার আগেই লাশটা পুড়িয়ে দেওয়াতে এ ব্যাপারে আর কিছুই বিশদভাবে জানা সম্ভব হয়নি। বিশু নোটবুকে এই সংবাদের বিবৃতির পেছনে একটা নয়, পরপর তিনটে জিজ্ঞাসার চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিল। তার অর্থ হল, ঘটনাটা ঘটেছে ঠিক, কিন্তু কেন ঘটেছে, তার আসল কারণটা রহস্যময় থেকে গেছে ।

হাজত খেটে গাঁয়ে ফেরার পর আগের মতই আবার সবকিছু বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা চালায় বিশু। এমন ভাব দেখায় যেন তার জীবনে কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। এ গাঁ থেকে কোনো মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় হলে এখনও আগের মতোই বিশুর ডাক পড়ে সঙ্গী হয়ে যাওয়ার জন্যে। বিশু যে কয়েকটা বছর গাঁয়েই ছিল না, পরে কি মারাত্মক এক অপবাদের বোঝা কাঁধে নিয়ে ফিরে এসেছিল, তার সবকিছুই যেন ক্রমশ ভুলে যেতে লাগল গ্রামবাসীরা।

ইস্কুলের পথে বাসরাস্তায় যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তা কিন্তু আজও কেউ ভোলে নি। ইস্কুলে যাওয়ার পথে ঘনাবাবুর একমাত্র ছেলে লরি চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সেদিন লোকে এ গাঁয়ের গোটা জমিদারবংশকেই দোষারোপ করতে শুরু করেছিল। গাঁয়ে এত জমিজায়গা থাকতে কেন যে মরতে জমিদারবাবুরা ইস্কুলটা মহকুমা শহরে বাসরাস্তার ওপারে খুলেছিলেন, তাই নিয়ে। গাঁয়ে হাইস্কুল খুললে অন্য গাঁ কিংবা মহকুমা শহর থেকে কেউ যে এখানে ইস্কুলে আসতে চাইবে না, জমিদারবাবুরা সে কথা ভাল করেই জানতেন। ইস্কুল খুলে গরু চরাতে কে-ই বা চায়? মুনাফা ছাড়া জমিদারবাবুরা কবে কোথাও কিছু করেছেন কি?

পুত্রশোকে ঘনাবাবু পাগলের মতো নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছেন আর বিলাপ করছেন, "এ আমার কি হল গো, আমি কি পাপ করেছিলুম যে, ভগবান আমায় এমন শাস্তি দিলেন? আমার রাজপুত্তুর বংশধরকে ছিনিয়ে নিয়ে শূন্য করে দিলে আমার ভাবী সিংহাসন। গাঁয়ের বাৎসরিক যাত্রায় শাহজাহান, সিরাজদ্দৌলা আর ছত্রপতি শিবাজির ভূমিকায় অভিনয় করে ঘনাবাবু এমন নাম করেছিলেন যে, তাঁর আসল নামটাই অনেকে জানত না। লোকে শুধু গাঁয়ের বাইরেও ঘনাবাবুকে চিনতো শাহজাহান, সিরাজদ্দৌলা আর ছত্রপতি শিবাজি বলে। সেদিনের সেই বিলাপের মধ্যেও লোকে যেন শুনেছিল সেই সব অভিনয়ের আবছা আবছা আভাস। বিশু সেদিন তার খাতায় লিখে রেখেছিল, লরি পিষলো ঘনাবাবুর ছেলেকে, আর লরিচালক মরল গণধোলাই খেয়ে। ঘনাবাবুর ছেলেকে তো আর বাঁচানো যাবে না, কিন্তু আর কেউ যাতে স্কুলে যাবার পথে বেঘোরে গাড়িচাপা পড়ে না মরে, তার দায়িত্ব বিশু যেচে তুলে নিয়েছিল নিজের কাঁধে। স্কুলের শুরু আর শেষের বেলায় তাই সে নিয়মিত বাস রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। ছাত্রছাত্রীরা রাস্তা পেরোবার সময় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশু একটা লালরংয়ের পতাকা নেড়ে চলন্ত গাড়ি, বাস বা লরি থামিয়ে দিত। তার জন্যে গাড়িচালকদের বেমালুম খিস্তিখেউরও জুটে যেতে বরাতে।

কেন যে বিশু এই কাজ স্বেচ্ছায় করছে, তা নিয়ে অনেক কানাঘুষোও চলে। রাস্তার কোণে যে মেটেবাড়িটা, সেটা আনন্দপুরুতের বাড়ি। আর সেই বাড়িটার আসল আকর্ষণই হল আনন্দপুরুতের ডগবগে যুবতী মেয়ে, হেনা। চলনে বলনে যেন প্রত্যক্ষ কবিতার ছন্দ। হেনার হাসিটিও তো আর যে সে হাসি নয়। হেনা যখন হাসে, তখন তার দুর্গাপ্রতিমার মতো টানাটানা চোখদুটো বুজে আসে, দু'গালে গভীর টোল পড়ে। তা দেখেই তো বিশুর ভোল পাল্টে গেছে। বলাবলি করে লোকে। মায়ার সঙ্গে হেনার কেমন যেন একটা মিল, তাও লক্ষ্য করেছে বিশু।

ভাতারমারি গাঁ থেকে ইস্কুলে যাবার দুটো রাস্তা। একটা পথ বাঁদিকের বেশ্যাপাড়ার ভেতর দিয়ে বাসরাস্তায় উঠে আরও পাঁচ মিনিট হাঁটা পথ। অন্যমনস্ক ছেলেদের পক্ষে সেটা বড়ই বিপজ্জনক পথ। ডানদিকের অন্য পথটা সে তুলনায় ঘুরপথ হলেও অনেক নিরাপদ, গাড়িঘোড়ার বালাই নেই, খালবিলও নেই। একটু বেশি হাঁটতে হয়, তবু শান্তি। এ পথে পর পর ঠাকুরদেবতাদের বাস। হাটের আগে প্রথমে পড়ে কয়েকটা দোকান, তারপরই শুরু হয় দেবতাদের স্থান। প্রথমে পঞ্চানন তলা, পরে একে একে কালীতলা, বিশালাক্ষীতলা, মহাপ্রভুতলা, সদাব্রততলা। সর্বক্ষণ এ পথে ভক্তদের গতায়াত। বেশির ভাগ ছেলেদের এই পথটা বেছে নেওয়ার কারণ নিরাপত্তা যতটা না হোক, যাওয়ার পথে ভক্তদের কাছ থেকে প্রসাদ হিসেবে বাতাসা, মুড়কি, নকুলদানা, কিংবা গুজিয়া পেয়ে যাওয়ার লোভও প্রাধান্য পায়।

মহাপ্রভুতলা পেরিয়ে সরু পথটা আনন্দপুরুতের বাঁশের কঞ্চি আর রাংচিতের বেড়া দেওয়া বাড়ির উঠোনের পাশ দিয়ে গিয়ে পড়ে বাসরাস্তায়। এইখানে রাস্তা পেরোলেই ইস্কুল। তাই ঠিক এইখানটাই বিশুর পাহারা দেবার জায়গা।

দিনের এই সময়টা উঠোন ঝাঁট দেবার কথা নয়। তবু যে কেন ইস্কুল থেকে ফিরে সব কাজ ফেলে হন্তদন্ত হয়ে হেনা উঠোন ঝাঁটের কাজে মন দেয়, তা বাইরে থেকে দেখে আর কেউ বুঝল

কি না বুঝল, বিশু বোঝে। কিন্তু উঠোন ঝাঁটের সময় মাঝে মাঝে হেনার বুকের আঁচলটা খসে পড়ার ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত না অনবধানবশতঃ, তা বিশু ঠিকমতো বুঝতে উঠতে পারে না। বোঝার চেষ্টাও করে না। দেখতে যে মন্দ লাগে না, তা সে জানে বলেই বার বার ফিরে ফিরে তাকায়, আর হেনার সঙ্গে মায়ার ছবিটা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

আচমকা একদিন বিশু বাসরাস্তায় যাবার পথে দেখল, হেনা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা খ্যাংরা ঝেঁটা, শাড়ির আঁচলটা আঁটোসাঁটো করে কোমরে গোঁজা। চণ্ডমণ্ড করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, যেন কার অপেক্ষায় রত। হেনার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে বাধা পায় বিশু। হেনা এমনভাবে পথ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে যে, গায়ে গা না লাগিয়ে পেরোবার পথ নেই। বিশু একটু থমকে যায়। বলে, "একি, পথ আটকালে কেন, ছাড়।" হেনা উত্তর দেয়, "বা রে, আমি আপনার পথ আটকাব কেন, আপনিই তো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন আমার সামনে। ভালই হল, অনেকদিন ধরে ভাবছি, আপনাকে একটা কথা বলব, অবিশ্যি যদি কিছু মনে না করেন।"

বিশু অনুভব করে, তার হৃদপিণ্ডটা যেন এবার লাফাতে লাফাতে একেবারে গলার কণ্ঠির কাছে এসে পৌঁছে গেছে। কোনরকমে একটা ঢোঁক গিলে বিশু জানতে চায়, "এমন কি কথা যে, এক্ষুনি বলতে হবে। যা বলার পরে বলো'খণ, এখন আমার অনেক কাজের তাড়া।"
- হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই কাজের কথাই তো কইতে চাইছি আপনার সঙ্গে।

বিশু যেন নিজেকে আর চিনতে পারেনা। কিছু বলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল হঠাৎ গলা দিয়ে আর কোন স্বরই বের হচ্ছে না। ঘাবড়ানো বিশুর কুষ্ঠিতে লেখা নেই, তবু আজ এই মুহূর্তে কেন এমন হচ্ছে তা ভেবে পায় না সে।

- পেছনে লোকে আপনার নামে কত কিছু বলে, তাই না? আপনি কিন্তু ওসব কথায় কান দেবেন না। নিন্দে করা তো অনেকেরই স্বভাব। তাতে কি এসে যায়, আপনার গায়ে তো আর ফোস্কা পড়ছে না। আগে যদি কেউ আপনার মতো চিন্তাভাবনা করত, তাহলে কি ঘনাবাবুর পোলাটার এমন বেঘোরে মরণ হত?

- ও, এই কথা। আমি তো ভাবলুম, কি না কি ... বলে বিশু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

বাড়ির ভেতর থেকে এক খাণ্ডারী গলার আওয়াজ ভেসে আসে।

- ফুটকি, ওরে ও ফুটকি। বাবার খড়মজোড়া আবার কোথায় থুয়েছিস, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না।

ফুটকি হেনারই ডাকনাম। তাই উত্তর দেয়, "যাই মা। বাবার খড়ম তো বাবার পায়েই ছিল। কোথায় খুঁজছে?"

- যাই মা, মানে? দোরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে রস মশগুল হচ্চে শুনি? তোকে না হাজারবার করে বলেচি, গায়ে পড়ে অজানা অচেনা কোন লোকের সঙ্গে কথা বলবি না। তা কে কার কথা শোনে। ধিঙ্গিবাজ, ধেড়ে মেয়ে কোথাকার! কে ওই ঘোর বাউণ্ডুলে মদ্দটা?

ইস্কুলের ছেলেরা আসতে শুরু করেছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। বাঁ-বগলে ছাতা গোঁজা বাংলার মাস্টারমশাই, বিভূতিবাবুকেও আসতে দেখা যাচ্ছে, ডান হাতে মোটা লাল পেন্সিল দিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। নাহ, আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। 'চলি', বলে বিশু পা বাড়ায়, যেতে যেতে আবছা আবছা শুনতে পায় হেনা আর তার মায়ের কথোপকথন।

- অচেনা, অজানা কি বলছ বল দিকিনি, ও তো আমাদের ভাতারমারি গাঁয়ের বিশুদা গো।

- কে বিশু, কোন বিশু? সেই মাগিখেকো বিশে নাকি? একটাকে খেয়ে হয়নি, এবার তোর ওপর নজর পড়েছে? এর একটা যথাযথ বিহিত না করলেই নয়। নইলে নির্ঘাৎ তোর বাপকূলের পুরুতবংশের নাম ডুববে।

আজ বিশু বেশ অন্যমনস্ক। প্রতিদিনের মতই ছেলেরা কেউ তাকে দেখে কিছু একটা বলে। কি বিশুদা, খবর কি? এই ধরণের কিছু। বিশু যেন শুনেও শুনতে পায় না। ওর মাথায় এখন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে অন্য সব কথা। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরার সময় মাত্র ক'দিন আগে অকস্মাৎ একটা কদবেল গাছ আবিষ্কার করেছে বিশু। গাছভরা পাকা টুসটুসে কদবেল। জঙ্গলের এদিকটায় ঘন আনারস - আর বেতগাছের ঝাড় বলে বড় একটা কেউ আসে না। হয়ত গাছটা সত্যিই বুনো, মালিকহীন। কয়েকটা পাকা কদবেল পেড়ে এনে হেনাকে দেবার কথাও ভাবে বিশু। নুন মাখিয়ে বুড়ো আঙুল চুবিয়ে কুরে কুরে কদবেল খাচ্ছে হেনা, আর তৃপ্তিতে বুজে আসছে চোখ, টোল পড়ছে গালে। এই দৃশ্যটা মনে মনে ভাবতে থাকে বিশু। সারা দেহের মধ্যে কেমন যেন একটা সিড়সিড়ে ভাব। সেই মুহূর্তে ছেলেদের কোন প্রশ্নই আর তার কানে যায় না।

আর, হ্যাঁ, এনে দেবে জামরুল। নিজেদের বাগানের রসেভরা টোসা টোসা জামরুল। ভাগ্যিস, ঝড়ের আগেই সব পেড়ে নেওয়া হয়েছিল। নইলে মাটিতে পড়ে সব থেঁতো হয়ে যেত। মাটির জালার ভেতর পরতে পরতে কলার বাসনা দিয়ে সাজিয়ে রাখা জামরুল। মা তো ক'দিন ধরেই তাগাদা দিচ্ছেন বিশুকে, যা না, হাটে গিয়ে বেচে দে জামরুলগুলো, বেশিদিন রাখলে কিন্তু সব পচে ঢোল হয়ে যাবে। আসলে হাটে গিয়ে ফলমূল বেচতে বেশ লজ্জা লজ্জা করে বিশুর, তাই এতো গড়িমসি। এবার কবে হাটে গিয়ে বসবে তা তার আগে হেনাকে জানিয়ে দেবে, মনে মনে ঠিক করে নেয় বিশু। পঞ্চাননতলার কাছে, বটগাছটার নিচে বসে বেচার ভান করে এমনিতে এক কোঁচড় জামরুল হেনাকে দিয়ে দিলে কেউ টেরও পাবে না।

(১০)

নতুন ডাক্তার গাঁয়ে আসার দিনকয়েক বাদে যে ঝড়বাদল হয়েছিল, তাতে জমিদার সত্যবানবাবুর বড় বাগানের তালগাছটায় বাজ পড়েছিল। সেই তালগাছটা পাওয়ার আশায় বিশু একদিন সুযোগ বুঝে জমিদারবাবুর কাছে গিয়ে বললে, "আপনার তালগাছে বাজ পড়েছে, জানেন বোধহয়?"

- শুনেছি, দেখিনি। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?

- ওই বাজপড়া মরা তালগাছটা আমায় দিলে, বড্ড উপকার হয়, বড়কত্তাবাবু।

বিশুর এই আবদার শুনে জমিদারবাবু না হেসে পারেন না।

- তার মানে? মরা তালগাছ নিয়ে তুই কি করবি রে, বিশু? জ্যান্ত হলে না হয় বুঝতাম, তুই তালের মেথি খাবার লোভে...

- কুচোকাচাদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সাধ তো আমার অনেকদিনের। কাছারিবাড়ির কাছ থেকে খাল বেয়ে সেই সদাব্রততলা অবধি ঘুরে আসব।

জমিদারবাবু কথার মাঝে বাধা দেন, "তা যা না, কে তোকে বারণ করেছে? এই জন্যে আমার কাছে এসে ফালতু ছেনালি করার কি দরকার?"

- না, মানে, ওই তালগাছটা পেলে, তা দিয়ে একটা শালতি বানিয়ে নেব। দারুণ মজা হবে।

- মজা হবে, তা তো বুঝলুম, কিন্তু খালে জল কই? আর জল থাকলেও, থাকে কচুরিপানা। শালতি বাইবি কি করে? আমি তো ভাবলুম তোরা খাল বরাবর পায়ে হেঁটে যাবি।

- সবাই মিলে আমরা কচুরিপানা সাফ করে... দরকার হলে জলসেচের কাজেও শালতিটা কাজে লাগাব।

- হুজুগে কোন কাজ ভাল হয় না। দাঁড়া, আমায় একটু ভাবতে দে।

- কত্তাবাবু, এখন না কাটলে কিন্তু গাছটা রোদে আরো শুকিয়ে যাবে।

- হুঁ, তাও বটে । তুই তো বেশ ভাবনায় ফেললি আমাকে।

জমিদারবাবু এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি খুব বড় একটা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। হাতের কাছের পাঁজিটা খুলে কিছুক্ষণ ধরে এলোমেলো পাতা উল্টোতে থাকেন।

বিশু ধৈর্য্য ধরে দাঁড়িয়ে ভাবে, জমিদারবাবু হয়ত কোন একটা ভালো দিনক্ষণ আছে কিনা পাঁজিতে তাই-ই দেখার চেষ্টা করছেন। জমিদারবাবু এবার পাঁজিটা বন্ধ করে সরাসরি বিশুর দিকে তাকিয়ে বললেন,

- শোন বিশু। তোর কাছে আমারও তাহলে একটা আর্জি আছে। অনেকদিন বলব বলব করেও বলার ফুরসৎ হয়ে ওঠেনি। কাজের কাজ তো তুই শুনেছি আজকাল কিছুই করিস না। ঘরের খাস আর কেবল বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াস। আমাদের তেতলা উঠছে, দেখছিস তো। তাই ভাবছিলাম আর কি, তুই যদি রাজমিস্ত্রির কাজে এই একটু আধটু জোগানটোগান দিয়ে দিস... জলখাবার ছাড়া মজুরিও কিছু পাবি। ভাবিস না, তোকে চাকরবাকরদের বরাদ্দ এলেবেলে খাবার দেওয়া হবে না। আমরা বাড়িতে সবাই যা খাই, তুইও সেই খাবারই খাবি। হাজার হোক আত্মীয় বলে কথা। আর হ্যাঁ, শুনলুম তুই নাকি শিবমন্দিরের জন্যে রোজই জল তুলিস, তা সেই সঙ্গে যদি এই একটু আধটু আমাদের ফুল আর সব্জির বাগানেও জলের ঝারা দিয়ে দিস...

জমিদারবাবুর মুখে আত্মীয় কথাটা শুনে হাড়পিত্তি জ্বলে যায় বিশুর। সম্পর্কে বিশুর বাবা ছিলেন জমিদার সত্যবানবাবুর কিরকম এক মাসতুতো ভাই, ঠিক কথা, কিন্তু তাতে বিশুর আখেরে কি লাভ? কারণ যাই থাক না কেন, জমিদারবাবুদের দরদালান কোঠায় মাথা গোঁজার সংস্থান হয়নি বলেই তো বিশুর বাবা ভাতারমারি গাঁয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় জমি কিনে নিজের হাতে তিনঘরা একটা মাটির কুঁড়েঘর বানিয়ে নিয়েছিলেন। সত্যবানবাবু আর বিশুর বাবা সমবয়সি না

হলেও তাদের মধ্যে অবশ্য যোগাযোগটা সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়নি। বাবার সঙ্গে নানান বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার জন্যে জমিদারবাবু প্রায়ই বিশুদের বাড়িতে আসতেন। যাতায়াতের মাত্রাটা বিশুর বাবা মারা যাবার পর আরও বেড়ে যায়। প্রায়ের বদলে সেটা পরে ঘন ঘন হতে শুরু করে। বিশুর মা শুকনো মুখে জমিদারবাবুকে কখনও ফিরতে দিতেন না। হাজার হোক সম্পর্কে ঠাকুরপো বলে কথা, তাই তাঁর তোয়াজের কোন কার্পণ্য করতেন না বিনোদা। খাইয়ে জমিদারবাবুর মুখে তাঁর নিজের হাতের রান্নার সুখ্যাতি কানে শোনার জন্যে বিশুর মা যেন সর্বদাই ওৎ পেতে বসে থাকতেন।

আর এই সুবাদে ছোটবেলা থেকেই উঠতে বসতে জমিদারবাবুর টিপ্পনি শুনে শুনে বিশুরও গা-সওয়া হয়ে গেছে। ছেলে কি করে মানুষ করতে হয়, তা নিয়ে বাবার চেয়েও জমিদারবাবুরই যেন বেশি মাথাব্যথা ছিল। প্রায়ই তিনি বিশুর মাকে বলতেন, জানেন বৌদি, ছেলেছোকরাদের অযথা লাই দিলে পেয়ে বসে, এক্কেবারে খপ করে মাথায় চড়ে যায়। শক্ত না হলে আজকাল ছেলে মানুষ করা দুরূহ ব্যাপার। সবেতেই জমিদারবাবু হামরাই হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করার ব্যাপারে বিশু দেখেও না দেখার বা না বোঝার ভান করে থাকত। নোটবুকে সবকিছু টুকে রাখার বাতিকটা তখনও ঠিকমতো দানা বাঁধেনি।

বিশুর মা, লাই দিক বা না দিক, বিশুকে কেউই কোনদিন বাগে আনতে পারেনি। দিন নেই রাত নেই, সুযোগ পেলেই বিশু বনেবাদাড়ে পালিয়ে যায়। কোন না কোন গাছের মগডালে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। সেখানে জমিদারবাবুর মতো কারুর টিকটিকিনি নেই। আগে আগে বনের পাখিরা বিশুকে আসতে দেখে কেমন যেন চনমন করে উঠত, বিশেষ করে যে সব পাখির বাসায় ডিমগুলো ফুটব ফুটব করছে। পরে সেই পাখিরাও টের পায়, যতক্ষণ বিশু বাসার কাছাকাছি আছে, ততক্ষণ তাদের ডিমগুলো সাপ কিংবা গোঁয়াড়গেলের হাতে থেকে নিরাপদ।

বিশুর তরফ থেকে জমিদারবাবুর প্রস্তাবের কোন জবাব আসছে না দেখে উনি এবার রীতিমতো তাড়া দিলেন,

- কি রে, বিশে, আমার কথার জবাব দিলি না যে? লেগে যা তাহলে কাল থেকে। কখন যে তোর কি আবার মতিগতি হয় কেউ কি তা বুঝতে পারে? সেই তো সেবার হুট করে যে সার্কাসের দলে ভিড়ে গেলি, কেন, তার হদিশ কি কেউ আগে থেকে পেয়েছিল? আবার গাঁয়ে ফিরেই যখন এসেছিস, তখন এই গাঁয়ে থেকে কাজের কাজ কিছু একটা করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দে। তুই নিজেও শান্তি পাবি আর গাঁয়ের লোকেরাও তোর জন্যে গর্বিত বোধ করবে। কি রে, বিশে, ঠিক বলিনি?

কি উত্তর দিলে লাগসই হবে তা ভাবতে বিশু বেশ কিছুটা সময় নেয়। না করে দিলে, তালগাছটা নির্ঘাৎ হাতছাড়া হয়ে যাবে। কাওরাপাড়ায় যারা বাঁশের ঝুড়ি, ঝাঁকা, চুবড়ি বানায়, তাদের সঙ্গে আগে থেকেই বলা-কওয়া হয়ে আছে। প্রথম প্রথম ওরা অবশ্য বলেছিল, হুঁ, শালতিফালতি ক্যামনে বানাতি হয় কে জানে, ও ব্যাপারে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই। তবে আপনি বামুনের ছাবাল, এতো করি য্যাখোন বলতেছেন, ত্যাখোন বানাবার চ্যাষ্টা করে দেখতি আপত্তি নাই। তা, আমাদের পোলাপানদেরও চড়তি দিবেন তো?

- আলবৎ, সেই জন্যেই তো এতো তোড়জোড়। শুধু ব্যাটাছেলেরা কেন, মেয়েরাও সুযোগ পাবে।

- আরে, না না না, মাইয়াদের লইয়া আবার ক'নে যাবেন? শুধু বজ্জাত পোলাপানদের নে যেতি চান তো মোদের কোনো আপত্তি নাই।

বিশু শুধু বলেছিল, "সেসব পরে দেখা যাবে'খন। আনন্দ করতে হলে, ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়েই আনন্দ করতে চাই। অত বাছাবাছি আমার আবার ধাতে সয়না।"

জমিদারবাবুর প্রশ্নে বিশু বেশ দোটানায় পড়ে যায়। কোনকিছু উত্তর না দিয়ে চলে যে যাবে তারও উপায় নেই। জমিদারবাবু অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রই নন, তা বিশুর ভালরকমই জানা ছিল। তাই সে এবার আমতা আমতা করে বলে ফেলে, “তবে একেবারে ঘড়ি ধরে কিন্তু আমি কাজে আসতে পারব না, আগে থেকেই তা জানিয়ে রাখলুম, হ্যাঁ।”

- ঘড়ি ধরে তো তোকে কাজে আসতে বলছি না। তবে দুপুরে খাওয়ারদাওয়ার সময়টা দেরি করে এলে কিন্তু ফস্কে যাবে। খাওয়ার ব্যাপারে কোন গড়িমসি তোর কাকিমা একদম পছন্দ করেন না। তোর অপেক্ষায় যে ভাত বেড়ে আলাদা করে কেউ বসে থাকবে এ কথা ভাবিস না। তাই ...

- আমি যে সকাল-বিকেল ইস্কুলের ছেলেদের বাসরাস্তা পার করাই। তার কি হবে? সারাদিন আপনার কাজে লেগে থাকলে... ওটা কে করবে তাহলে, বড়কত্তাবাবু?

জমিদারবাবুর হাবেভাবে স্পষ্ট হয় তিনি কেমন যেন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছেন। কেমন যেন অসন্তুষ্টির ভাব। কিন্তু কিসের কারণে? বিশুর ঠিকমতো কাজে মন নেই দেখে? জোরজার করে তো আর কাউকে কোনো কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

ভীম সিংয়ের কথা মনে পড়ে বিশুর। তার সার্কাসের সহকর্মী বন্ধু। বুকের ওপর হাতি তোলার খেলা দেখাত। খুনের মামলার জেরা চলছে। বিচারক তার কাছে জানতে চাইলেন, কেন সে সার্কাসের মালিকের অনুরোধ সত্ত্বেও বিশুর সঙ্গে ছুরির খেলায় সহায়তা করতে রাজি হয় নি।

ভীম সিং উত্তর দিয়েছিল, “আরিব্বাস, ওর হাতে যা টিপ।”

- নিখুঁত টিপ? তাহলে আবার ভয়ের কি আছে?

পাল্টা প্রশ্ন করেন বিচারক ।

- তাছাড়া আপনি সার্কাসে হাতি বুকে তোলেন, সে তো বড় দুঃসাহসিক কাজ, অনেক বিপদের ঝুঁকি। তবু কেন এই সামান্য খেলায় ভয় পেয়ে গেলেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

- সামান্য খেলা মানে? এসব কি বলছেন, হুজুর? হাতি নিয়ে আমার অনেকদিনের কারবার। আমি আমার খেলার হাতিদের নাড়িনক্ষত্র জানি ও চিনি। ওরা কি ভাবছে, তা আমি আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারি, দরকার হলে রীতিমতো সাবধানও হয়ে যাই। কিন্তু বিসমিল্লা, মানে ওই বিশুভায়ের মনে যে কি আছে বাইরে থেকে দেখে তা বোঝা যায় না, তাই ভয়।

বিশুর আজ মনে হোল, জমিদারবাবুর ক্ষেত্রেও ভীম সিংয়ের কথাটা খাটে। হাজার চেষ্টা করেও বাইরে থেকে কখনই বোঝা যায় না, কি আছে জমিদারবাবুর মনে। ঝড়ের পূর্বাভাষ বুঝে বিশু অনেকটা জমিদারবাবুর মন রাখার মতো করে কথা বলার চেষ্টা করে। বলে, "যদি বাড়াবাড়ি কিছু বলে থাকি, তাহলে আমায় নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন, বড়কত্তাবাবু!"

- ফের আমাকে কত্তাবাবু বলে ডাকছিস? জানিস না, তোর বাবা আমাকে ছোট ভায়ের মতো কত স্নেহ করতেন? আমায় কাকুমনি, কাকাবাবু, বা ওইরকম আর কিছু একটা বলতে পারিস না? লেখাপড়া তো আর কিছু শিখলিনি, ভদ্রতা আর শিখবি কোত্থেকে? সে যাক গে, অযথা কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। ভুলে যাসনি, তোকে আপনজন ভাবি বলেই তো তোর খুনের মামলার ব্যাপারে অমন একটা নামকরা বড় উকিলের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম, নইলে হয়ত আজও তোকে হাজতে দিন কাটাতে হত। বেকসুর খালাসই শুধু নয়, উল্টে পুরো হাজতবাসের দরুণ ক্ষতিপূরণটাও পেয়ে গেছিলিস। সেসব কথা কি বেমালুম ভুলে গেলি নাকি?

জমিদারবাবু উকিলের ঠেকো দিয়ে কথা বললেন, কিন্তু উকিলের ফি বাবদ বিশুদের পৈতৃক জমিটা বিনোদা যে জমিদারবাবুর কাছে বাঁধা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে কথাটা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ

করলেন না। নেহাৎ ঠেকায় না পড়লে বিশু যে ভুলেও কোনোদিন জমিদারবাবুর ধার মাড়াবে না, তাও ইত্যবসরে জমিদারবাবুও বেশ ভাল করে টের পেয়ে গেছেন।

- না, সতুকাকু, আমি কিছুই ভুলিনি। আজ্ঞে, ইস্কুলের লেখাপড়া শিখিনি বলে আমায় খোঁটা দিচ্ছেন, কিন্তু আমার গায়ে যদ্দিন মানুষের রক্ত আছে, তদ্দিন ওসব কি আর এত সহজে ভুলতে পারি, সতুকাকু? না, না, আমি অতো ভুলোমন আমি নই। এই যাঃ, দেখলেন তো এবারে সত্যি প্রায় ভুলেই গেছিলাম, আপনার কাছে আমার আরও একটা নিবেদন আছে।

- ফের কিসের নিবেদন? আজকাল দেখছি কেবলই আবেদন নিবেদনের ছড়াছড়ি। চটপট বলে ফেল, কি বলবি !

- আপনি তো জানেন, রানীপিসি ইদানিং ছেলেপুলে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এসেছেন। নিজেদের পৈতৃক ভিটেয়। বছর ছয়েক ও ভিটেয় কেউ বাস করেনি বলে বাড়ির উঠোনে মানুষসমান উলু গজিয়ে গেছে।

- কার ভিটেয়, কোথায় উলু গজিয়েছে, তো আমি তার কি করতে পারি?

- না, মানে, আমায় উনি বলেছেন উলুঘাসগুলো কেটে দিতে।

- উলুই কাট বা অন্য আর কোনো ঘাস কাট, আমি বাধা দেবার কে? কিন্তু কেন, তোকে বলেছে কেন? কৈবর্ত্যপাড়ায় কি আর কোনো লোক নেই? কাউকে পেল না?

- থাকবে না কেন, রানীপিসি কেন জানিনা আমাকেই বললেন।

- ও, তাই বুঝি? তোকে বলল? বলবেই তো। কাজের কাজ যদি কিছু করতিস, তাহলে বলার কোন সুযোগই পেত না। ঠিক আছে, তাহলে উলুকাটা শেষ করেই আমার কাজে লেগে যা।

জমিদারবাবুর বাড়িতে মজুর খাটবে, এ কথাটা ভাবতেও বিশুর কেমন যেন গা বমিবমি করে। তবু রেহাই নেই। বিশুকে বাগে যখন একবার পেয়ে গেছেন জমিদারবাবু। কোন উপায়ান্তর নেই। সমস্ত পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে তালগাছটা বাগাতে না পারলে। ফের গাছটার কথা পাড়তেই

জমিদারবাবু বললেন, “কিন্তু গাছটা তো এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কাটবি কি করে? আশপাশের আম আর লিচুগাছে কদিন বাদেই বউল ধরবে, ওই গাছগুলোর ওপর বেয়াড়াভাবে তালগাছটা আছড়ে পড়লে কতগুলো ডাল যে ভেঙে যেতে পারে, তা একবার খেয়াল করে দেখেছিস? সেই ক্ষতির কথাটা কি একবারও খুঁটিয়ে ভেবেছিস?”

- আমি নিজে তো কাটব না। কাওরাপাড়ার লোকেরা এসে কেটে দেবে। তাছাড়া নোবনেকাকা নিজে দাঁড়িয়ে তদারকি করবে কাটবার সময়। আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। অন্য কোন গাছের একটুও ক্ষতি হবে না। ওদের তাহলে কালই আসতে বলে দিই, সতুকাকু?

এমন সময় জমিদারবাবুর এক ছেলে, মণ্টে, বাড়ির অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসে। হাতে একটা হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া চোপসানো ফুটবল। তাকে দেখে জমিদারবাবু বললেন, “মণ্টে, মাকে গিয়ে বল তো, কয়েকটা লুচি আর পরিমাণ মতো আলুরদম এক্ষুণি বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দিতে। বিশুও মণ্টের সঙ্গে কথা বলে, কি রে মণ্টে, আজ ইস্কুলে যাসনি যে বড়?”

- গেলে নিজের চোখেই তো দেখতে পেতে বাস রাস্তায়। আচ্ছা, বিশুদা, আজকাল তোমার মনটা কোথায় থাকে বলত! যাইনি, শরীরটা আজ খারাপ বলে, ব্লাডারে কাঁটা ফুটে গেছে, সারিয়ে দিতে হবে। পয়সা যা লাগবে বাপির কাছ থেকে নিয়ে নিও।

মণ্টে বিশুর হাতে চোপসানো বলটা ধরিয়ে দিয়ে দৌড়ে আবার বাড়ির অন্দরমহলের দিকে চলে যায়।

সত্যবানবাবু চোপসানো বলের দিকে তাকিয়ে বললেন, - “কতবার করে বলেছি, উঠোনে এত জায়গা থাকতে বনেবাদাড়ে গিয়ে খেলিস না, তা কে কার কথা শোনে, কে জানে কোন আনারসের বনে বল পেটাতে গেছল ... সারাতে কত লাগবে বলে মনে হয়? একটা সিকিতে হবে তো?

- কে জানে, সাইকেলওয়ালার দোকানে যা চাইবে তাই দিতে হবে।

- সিকির বেশি লাগলে, তুই দিয়ে দিস। আর পরে একটা পাকা রশিদ এনে বাকিটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাস, কেমন?

জমিদারবাবুর এই কথাটা শেষ হবার আগেই বিশু হঠাৎ ঢকাস করে তাঁর পায়ে একটা প্রণাম ঠুকে দেয়। ছোটবেলা থেকেই বিশু জানত উনি প্রণামের বড় ভক্ত। মুখে অবশ্য বলে, "আপনি যা হুকুম করেন, তাই করব। তাহলে এবার আসি, সতুকাকু?" জমিদারবাবু বাধা দিয়ে বলেন, "আসি, মানে? তোর জন্যে যে খাবার পাঠাতে বললুম, খেয়ে যা।" বিশু পায়ের চপ্পলটা খুলে আবার দাওয়ায় উঠে বাবু হয়ে বসে।

জমিদারবাবু বলে চলেন, "ইস্কুলের ব্যাপারে আর তোর নাক গলানোর কোন দরকার নেই, ইস্কুলের নিজেরও তো একটা দায়িত্ব আছে, ছেলেরা যাতে নিরাপদে ইস্কুলে যেতে আসতে পারে। ইস্কুলের আর্দালিরাও ওই কাজটার ভার নিতে পারবে। সে আমি সেক্রেটারিকে বলে সব ব্যবস্থা করিয়ে দেব।"

কথাটা শুনে বিশুর পিলে চমকে যায়। তাহলে কি হেনার কথাটা জমিদারবাবুর কানেও পৌঁছে গেছে? ছলছুতো করে সেইজন্যেই কি উনি এতেও ভাংচি দিতে চাইছেন?

তড়িঘড়ি করে বিশু বলে ফেলে, "না, না, ও কাজ আমার ভাল লাগে বলেই স্বেচ্ছায় করি। অন্য কাউকে সে ভার দেবেন না, সতুকাকু।"

কলাপাতায় করে কয়েকটা লুচি আর কষা আলুরদম নিয়ে বাড়ির অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসে অউলা। বিশুকে বলে, "খুরিখ্যানা ধরো বিশে চাচা। এক্ষুণি পানি এনে দিচ্ছি।"

মুখে কিছু না বললেও অউলাকে দেখে বিশু যে অবাক হয়ে গেছে, তা জমিদারবাবুরও নজর এড়ায় না। তিনি যেন কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে শুরু করলেন, “জানিস বিশে, বড্ড ভাল মেয়ে, এই অহল্যা। মোচরমানের ঘরে জন্মালেও কি পয়মন্ত লক্ষ্মীশ্রী মেয়ে। কি ভাগ্য করে ছবি মিঞা এমন একটি মেয়ে পেয়েছে। তোর কাকিমার হেঁসেলে মুখ বুজে এই এটা ওটা ফাইফরমাশ খেটে দেয়, কোন কাজেরই প্রতিবাদ করে না। এই আর কি!”

অনেকদিন আগে এই অউলার স্কুলে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে বিশু তার মা বিনোদার সঙ্গে যে আলোচনা করেছিল তা মনে পড়তেই আবার সে কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়।

খবরটা শুনে বেশ উত্তেজিত হয়েই সেদিন বিশু তার মাকে বলেছিল, “এ কি অবিচার বল তো মা। জমিদারবাবুর সঙ্গে যোগসাজশ করে তোমরা আমাকে জোর করে ইস্কুলে পাঠাতে চেয়েছিলে। আর পারোনি বলে, সে কি তুলকালাম কাণ্ড করেছিলে। আর দেখো, এই ছবিদার মেয়েকে নিয়ে কি কেচ্ছাকাণ্ড ঘটে গেল আজ। গরিব ঘরে জন্মেছে বলে, কেউ তার আবদারের এতটুকুও আমল দিলে না। একে মুসলমান, তায় মেয়েমানুষ। ওদের কি লেখাপড়া শেখার কোন অধিকার নেই? তোমরা মুখেই বল, সব মানুষের একটা মৌলিক অধিকার আছে। কেন তাহলে কেষ্টমাস্টার অউলাকে পাঠশালায় নিলেন না? দূর দূর করে খেদিয়ে দিলেন? সাফ সাফ বলে দিলেন, বিদ্যামন্দির হিন্দুর পাঠশালা, মন্দিরে মুসলমানদের জায়গা হয় না। হিন্দুরা কি কখনো মসজিদে যায়? সংসারে যে যেমন জন্মেছে তাকে তাই তেমন তেমন মেনে নিয়ে চলতে হয়। অউলাকে যদি লেখাপড়া শেখাতেই চাস তো কোনো এক মাদ্রাসায় নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দে গে।”

- তা, তুই এর কি বিহিত করবি ভেবেছিস? তুই বললেই কি আমাদের সমাজের এতদিনের আচারব্যবস্থা ফট্ করে সব পাল্টে যাবে?

- আমাদের গাঁয়ে তো ওই একঘর মুসলমান। তাও তিনটি মাত্র প্রাণী। তা বলে কি ওদের কোন সামাজিক অধিকার নেই? আমি ইস্কুলের ব্যাপারে বেঁকে বসেছিলাম, কেন তা তখন ঠিক বুঝিনি। এখন বুঝতে পারছি, কি ভালই না করেছিলাম। আর দ্যাখো, হাইস্কুলে হিন্দুদের সঙ্গে যদিও মুসলমান ছেলেরাও পড়ছে, তবু একটা বিভেদ কিন্তু ওখানেও থেকে গেছে। এই ভাষার ব্যাপারে ধর, হিন্দুদের জন্যে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে পালি বা সংস্কৃত পড়ার আর মুসলমান ছেলেদের জন্যে আরবি, ফার্সি কিংবা উর্দু। নড়নচড়ন হবার উপায় নেই। কেন বলতে পারো? লেখাপড়ায় এত সীমা, এত গণ্ডি কেন? আর লেখাপড়া শিখলেও তো মানুষে মানুষে তফাৎ কোথাও না কোথাও থেকে যাচ্ছে, মা।

চেষ্টা করেও বিনোদা ছেলের বক্তব্য ঠিকমত বুঝতে পারেন না। মুখে শুধু বলেন, "লেখাপড়া শিখতে চাইলেও আমাদের দেশে সবাই একরকম সুযোগ পায় না। মানলাম, কিন্তু তোর মতো এমন করে কেউ কোথাও ঘরের লক্ষ্মী পায়েও ঠেলে না। আরে বাপু, লেখাপড়া না শিখলে শুধু চাষবাস করা ভিন্ন অন্য কোন গতি থাকে না। তোর যে কি মতিগতি হয়েছিল, তা আমি কিছুই বুঝিনে। সারাজীবন অন্যের গলগ্রহ হওয়া ছাড়া আর কি পথ হবে তোর?"

- যেদিন কোন ভেদবিচার থাকবে না, বয়সেরও কোন তারতম্য থাকবে না, গরিব কি বড়লোক, ছেলে কি মেয়ে, কানা কি খোঁড়া, হিন্দু কি মুসলমান, সবাই যেদিন একসঙ্গে সমানভাবে লেখাপড়া শেখার অধিকার পাবে, সেদিন, হ্যাঁ, সেদিন আমিও আবার ইস্কুলে যাব, মা, দেখে নিও। শেখার তো আর কোন বয়সসীমা নেই। আমি বুড়িয়ে গেলেও সেদিন আবার সবার সাথে ইস্কুলে গিয়ে বসব। আমার ব্যাপারে তুমি এখনো এত মাথাঘামাও কেন বল তো, মা?

- কাজের কাজ তোকে দিয়ে কোনোদিনই হবে না, মুখে কেবল চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, - বিনোদা আঁচল দিয়ে আড়ালে চোখ মোছার চেষ্টা করেন। আপনমনেই বলেন, 'কে জানে বাপু, এ আবার কোন এক বিশ্বত্রাতা অবতার আমার পেটে এসেছিল।'

বিশু খাবারটা খাচ্ছে না দেখে সত্যবানবাবু কয়েকবার তাগাদা দেন, “কি রে, র‍্যালা করছিস কেন, খা। জুড়িয়ে গেলে স্বাদ ভাল লাগবে না। তোর কাকিমার নিজের হাতের রান্না, খা, খেয়ে নে। মনে মনে কত সাধ হয় আমিও তোর কাকিমার হাতের রান্না খাই, কিন্তু উপায় কি বল। আটা, ময়দা, মিষ্টিমণ্ডা সবই বারণ। চেহারা দেখে তোরা যাই ভাবিস আমি আর তা নই। রক্তে চিনির ভাগ এত বেশি যে, তোরা আমায় সতুবাবু না বলে মিষ্টিবাবু বলেও ডাকতে পারিস।” জমিদারবাবু নিজেই নিজের রসিকতায় হো হো করে হাসতে শুরু করে দেন।

যাবার সময় বিশুকে বলটা সারিয়ে আনবার কথাটা জমিদারবাবু আর একবার মনে করিয়ে দেন।

উঠোন পেরিয়ে বিশু প্রায় সদর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। জমিদারবাবু ফরাস ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরি চটিতে পা গলাতে গলাতে আবার বিশুকে এক পেছনডাক দেন। বলেন, “কাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমার এই বৈঠকখানায় একটা মিটিং ডেকেছি। গাঁয়ের অনেকে আসবেন। এ গাঁয়ের আদিবাসিন্দা না হলেও, নতুন ডাক্তারকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি। খুব জরুরি মিটিং। জলখাবারেরও সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তোকেও বললুম, চলে আসিস। ঠিক পাঁচটায়। ছবি মিঞা আর নবীন কাওরাকেও পারিস তো জানিয়ে দিস, আসার কথা। কেমন? ভেবেছিলুম কোন মেয়ে-বৌদের ডাকব না, কিন্তু আমাদের গাঁয়ের স্বার্থে ওদের কথারও তো বিশেষ একটা গুরুত্ব আছে। কৈবর্ত্যপাড়ায় যাবি বলছিলি না? তাহলে রানী আর একাদশীকেও ক’টার সময় মিটিং হবে জানিয়ে দিস।”

একদিকে জমিদারবাবুর বাড়িতে রাজমিস্তিরির জোগানের কাজের প্রস্তাবটা খুব একটা মন্দ লাগে না বিশুর, অন্যদিকে নিজের এই আবার ফিরে পাওয়া অবাধ স্বাধীনতা পুরোপুরি হাতছাড়া করতেও মনটা কেমন যেন বেচাল হয়ে পড়ে। বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোয় যে কি রোমাঞ্চ, তা যে ঘোরেনি, সে জানবে কি করে?

জমিদারবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিশু মনে মনে ঠিক করেছিলো রানীপিসির বাড়ি ঘুরে আসবে। কিন্তু, শালা, জমিদারবাবু, এটাও টের পেয়ে গেল কি করে? আন্দাজে? না, বিশুর মনের কথা গণনা ফণনা করে জেনে গেলেন জমিদারবাবু? বিশুর এমন রাগ হল যে, সে কোমরে গোঁজা কাস্তেটা বের করে পথের দুইপাশে খানায় গজানো ডগমগে কচুগাছগুলোকে কেটে তছনছ করে দিয়েও যেন ক্ষান্ত হতে পারল না।

বেলার আলো থাকলে আজই হয়ত বেশ কিছুটা উলু কেটে আঁটি বেঁধে রাখা যাবে। নোটবুক বের করে বিশু লিখে নেয়। জলখাবার সমেত জমিদারবাবুর বাড়িতে মিটিং। তারিখ আর ক্ষণ। আর তারপর, পর পর তিনটে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। বিনা মতলবে কি আর এই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন জমিদারবাবু? কিন্তু মতলবটা যে কি, তার কোন হদিশ পায় না বিশু।

(১১)

রানীপিসির বাবা সুদিনবাবু ছিলেন কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। সুদিনবাবুর বাবা আর জমিদারবাবুর ঠাকুরদা ছিলেন দুই ভাই, সেই সূত্রে সুদিনবাবু জমিদারবাবুদের আত্মীয় হলেও তিনি তাঁদের বাড়ির কাছাকাছি বাস করতে চাননি বলেই বিশুর বাবার মতো এই গাঁয়েরই দক্ষিণপ্রান্তে, কৈবর্ত্যপাড়ায় জমি কিনে পাঁচিলঘেরা বাড়ি বানান। কোটা ঘর তিনখানা। তিনটে ঘরের তিন রকমের চালা। একটা টালির। টিনের চালের ঘরটায় বৃষ্টি হলেই জং ধরা ফুটোগুলো দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। তৃতীয় ঘরটার ছাদ জলপেটা। বাস্তুর চারপাশে উঁচু করে পাঁচিল তোলার কারণ, ভাতারমারি গাঁয়ের দক্ষিণ দিকে তখনও বেশ ঘনজঙ্গল। বাঘের ভয়ে রাতে দলছাড়া কেউই একা একা বাইরে বের হত না। গাঁয়ের এদিকে একমাত্র কামিনীবুড়ির বাড়িটা ছাড়া অন্য সব কটা বাড়ির চারপাশে, ঘরগুলো মেটে বা কোটাই হোক, পাকা পাঁচিল না তোলার আগে কেউই সেইসব বাড়িতে বাস করতে ভরসা পেত না। তারও আগে, মানে নৌকা করে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নীলাচল যাত্রার সময়

এই গ্রামটার পাশের গ্রামে নাকি রাত কাটিয়ে ছিলেন। তখন ভাতারমারি গাঁ গঙ্গাগর্ভে ডুবে ছিল কিনা জানা যায়নি, কিন্তু একদিন না একদিন এ গাঁ যে জলের নিচে ছিল, তার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। মাটি খুঁড়লে, কত কি বেরিয়ে পড়ে, আদিকালের সনদ।

রানীপিসির এই বলা নেই কওয়া নেই দুম করে গাঁয়ে ফিরে আসায় বড়ই চক্ষুশূল হয়েছিল দুজন মানুষের। প্রথমতঃ, গজেন সাঁত। রানীপিসিদের পাঁচিলঘেরা এই বাড়িটার দক্ষিণ দিকের পুকুরের লাগোয়া জমির মালিক গজেন সাঁত। রানীপিসিদের অবর্তমানে তারাই বাগান, পুকুর আর এই তিন ঘরের বাস্তুর দেখাশোনা করার ভার পেয়েছিল। বিদেশ বিভূঁই থেকে এসে কেউ কোন তত্ত্বাবধান করত না বলে, সাঁতেরাই বাগানের ফলমূল, পুকুরের মাছ আর বাস্তুর ঘর একাই ভোগদখল করত। তাদের ভাবসাব দেখে মনে হতো যেন তারা একাই এসবের মালিক। ব্যস, রানীপিসি আসায় সেই স্বাচ্ছন্দ্যে বাগড়া পড়ল।

রানীপিসি আসার ছ'বছর আগেও তাঁর মেজভাই বেশ কয়েকবছর এ বাড়িতে ছিলেন। তিনি তখন চাকরি করতেন কলকাতায়। কিন্তু পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়ি ভাড়া করে কলকাতায় থাকাটা তাঁর আর্থিক সামর্থ্যে কুলোয়নি বলেই তিনি গাঁয়ের বসত বাড়িতে থেকে প্রতিদিন ট্রেনে করে চাকরি করতে যেতেন। যাতায়াতের পথেই দিনের প্রায় চার ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়ে যেত। তারপর একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর বড়দার সুপারিশে মিরাটে বদলির সুযোগ হতেই হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলেন। অফিসের কোয়ার্টারেই বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা। উপরন্তু কোয়ার্টার সংলগ্ন বাগান দেখাশোনার জন্যে একজন মালিও পেয়ে গেলেন। গাঁ থেকে ঘরের সব জিনিস তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেননি। রেলের অনেক ভাড়া গুনতে হবে বলে। কি কি জিনিস রেখে গেলেন, তার এক বিশদ তালিকা করে পাঠিয়ে দিলেন ছোটবোনের কাছে। আর জানিয়ে দিলেন, জিনিসগুলো আপাতত প্রতিবেশী সাঁতেদের বাড়ির গজেনের হেপাজতে রয়েছে।

দুটো কাঁঠালকাঠের তক্তপোশ। গজেনরা তার ওপরে বস্তাবোঝাই করা ঘুঁটে, নারকেল ছোবড়া, কাঠের ভুষি, তুঁষ, আর আরও কত কি সব মালপত্তর তাগাড় করে রাখত।

একটা ছোটবড় নানান আকারের টানা সমেত আয়না দেওয়া দেরাজ আলমারি। আর একটা সবুজ রং করা টিনের তোরঙ্গ। সেটা দেখে প্রায়ই অমল মনে মনে ভাবত, মা যদি একবার চাবি দিতে ভুলে যায়, খুঁটিয়ে দেখবে ভেতরে কি আছে। মেজমামা হয়তো অমূল্য কোন জিনিষ গচ্ছিত রেখে গেছেন। দেখা যাক, একদিন না একদিন সে সুযোগ আসবেই।

একটা মান্ধাতা আমলের ভারী পাথরের জাঁতা। কে কবে তাতে কি পেষাই করত তার কোন হিসেব ছিল না। শুধু বাহারে কিনা তাও জানত না কেউ।

প্রায় পনের সের ওজনের একটা পাঁঠাবলির খাঁড়া। রানীপিসির বাবার আমলে এ বাড়িতে কালিপূজোর সময় মানত করা পাঁঠাবলি হতো এই খাঁড়া দিয়ে। যাতে মরচে ধরে ভোঁতা না হয়ে যায়, তারজন্যে বিশেষ করে গজেনের ওপর আদেশ ছিল নিয়মমাফিক খাঁড়াটাতে রেড়ির তেল মাখিয়ে রাখতে। মেজদা চলে যাওয়ার পর দুএকবার গাঁয়ে এসে বাগানের ফলমূল আনবার সময় রানীপিসি কিন্তু ভাবতেও পারেননি যে, একদিন তাঁর বড়দা তাঁকে নিজের বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে, অমলের দুরন্ত- আর অবাধ্যপনার অজুহাতে। এই রকম একবার গাঁয়ে আসার সময় তিনি একাদশীকে খাঁড়াটা দিয়ে বলেছিলেন, “দ্যাখ, তোরা দুটি মেয়েমানুষ একা থাকিস, বলা তো যায় না, কোন মিনসের কি মতিগতি, রাতবিরেতে হানা দেবে ঘরে, রাখ তুই এই খাঁড়াখান, কাজে লাগতে পারে, দিবি কসিয়ে এক ঘা।” গজেনের বাড়িতে তো ব্যাটাছেলের কোনো অভাব নেই। ওর কাছে তাই খাঁড়াটার বিশেষ কোন তাৎপর্য ছিল না।

রানীপিসির মেজদা আর একটা জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে যাননি। একটা কাঁচ বাঁধানো ফোটো। ফোটোয় ছিলেন রানীপিসি, তাঁর পাঁচ ভাইবোন, তাঁর মা আর তাঁর দুই মামা। ইজেরপরা, আদুড়

গা রানীপিসির বয়স তখন মেরেকেটে চার কি পাঁচ। একটা দড়ির খাটিয়ায় শোয়া রানীপিসির মা। নিমতলাঘাটে যাবার অব্যবহিত পূর্বে স্টুডিও থেকে লোক আনিয়ে তোলা ছবি। ফটোর কোণায় কোণায় বাদামি রঙের ছোপছাপ লাগলেও ফোটোর সবাইকে শনাক্ত করতে এখনও তেমন বেগ পেতে হয় না। আর যদি কাউকে চেনা না যায় সেটা ফোটোটার আজকের হালের জন্যে নয়। এতদিনে ছবির সেই লোকগুলোও তো, হয় বয়সের ভারে ঝুলে ফুলে গেছে, নয়তো গালটাল তুবড়ে এমন দেখতে হয়ে গেছে। চেহারা চিঁড়েচ্যাপটা। ফোটোটা আসলে থাকার কথা রানীপিসির শ্যামবাজারের মামার বাড়িতে। সেখান থেকে সেটা আবার কি করে পৈতৃক বাড়িতে এসে পৌঁছে ছিল তা কেউ জানত না। আর অনেকদিন এই বাড়িতে কেউ ঠিকমতো বসবাস না করলেও ফোটোখানা যেমন শোওয়ার ঘরের দরজার ওপর টাঙানো থাকত, তেমনই থেকে গিয়েছিল।

মায়ের ফোটোটার পাশে নিজের বিয়ের ফোটোটাকে টাঙিয়ে দিতে বললেন রানীপিসি গজেনকে। চেয়ারে বসা রানীপিসি, গা ভর্তি গয়না, আর চেয়ারের পেছনে রানীপিসির দুই কাঁধে হাতের ভর রেখে দাঁড়ানো তাঁর স্বামী, গলায় মোটা সোনার চেন, পাঞ্জাবির বুকে, হাতায় সোনার বোতাম। রানীপিসির রং কুচকুচে কালো আর চেহারা হোঁদল কুঁৎকুঁতে হওয়া সত্ত্বেও এই সোনার বহরের দাপটেই তাঁর বড়দা একজন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পাত্র জোগাড় করতে পেরেছিলেন। ফোটোটায় এখনও প্রমাণ মেলে, বিয়েতে কি কি সব গয়না যৌতুক দেওয়া হয়েছিল। আজ আর তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। স্বামীর সংসারের অভাব মেটাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে সেসব খুইয়ে বসেছিলেন রানীপিসি বিধবা হবার অনেক আগেই।

গজেনরা রানীপিসিদের শোওয়ার ঘরে গরু, রান্নাঘরে মুরগি আর বসার ঘরে ছাগল রাখার জন্যে রানীপিসি তো ক্ষেপে লাল। সে কি ধমক খেলো গজেন সাঁত। আমতা আমতা করেও রেহাই পায়নি।

সব নিজের কানে শুনেছে বিশু। সারাদিন ধরে ফিনাইল-গোলা জল ঢেলে মেঝে ধুয়েও গোয়ালের বোটকা গন্ধ দূর করা যায়নি। অগত্যা রানীপিসি সাঁতেদের বলেছিলেন, “যদ্দিন না ধূপধুনো দিয়ে বোটকা গন্ধ দূর হয়, তদ্দিন তোরা রাত্তিরে আমাদের এই ঘরে শুবি, আর আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে তোদের ঘরে গিয়ে শোব।” সাঁতেদের সবার মুখের চেহারাটা তখন হয়েছিল একেবারে বাঁধিয়ে রাখার মতো।

আর দ্বিতীয়তঃ, বেকায়দায় পড়লেন জমিদারবাবু। মা বিবিমার সিন্নির পাঁচ ভাগের চার ভাগ ছিল সুদিনবাবুদের। রানীপিসির প্রমিতামহ যখন স্বপ্নে পেয়ে বিবিমাতলার সংলগ্ন পুকুর থেকে পাঁচটা গোলাকার নুড়ি তুলে এনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তখন সেখানে জমিদারবাবুর ঠাকুরদাও উপস্থিত ছিলেন বলে, তাঁকেও মা বিবিমার একটা অংশের ভাগও পাইয়ে দিয়েছিলেন। সুদিনবাবুর ছেলেমেয়েরা কেউ এ গাঁয়ে থাকত না বলে, পুরো পাঁচটা অংশই এতদিন একা জমিদারবাবু ভোগ এসেছেন। মা বিবিমার যে কোনো ব্যাপারে জমিদারবাবু একাই সব সিদ্ধান্ত নিতেন, কি করা হবে, কি না করা হবে। আর অশেষ ভোগান্তি হত মা বিবিমার পূজারি ছবি মিঞার। মা বিবিমার মন্দিরের আয়টা যাতে আরও বাড়ে তার জন্যে ছবিকে যখন তখন লোক পাঠিয়ে ধরে এনে বাপান্ত করে ছাড়তেন। ধমক দিয়ে বলতেন, “তোর কুঁড়েমির জন্যে মন্দিরের লোকসান হচ্ছে, তুই গা ঝাড়া দে ছবি, আয় বাড়া, নইলে দেব মন্দিরটা বিক্রি করে, তখন তুই কোথায় যাবি, কোন চুলোয় থাকবি, ভেবে দেখেছিস?” ছবি মিঞার মাথায় জমিদারবাবুর রকমসকম কিছুই ঢুকত না, এই হুমকি ভুয়ো না সত্যি, বৌ, মেয়ে নিয়ে যে বাস্তুহারা হবে শুধু এই ভয়েই সে ঠকঠক করে কাঁপত। ধমকানির মাত্রা বাড়তে বাড়তে একদিন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ছবি মিঞা সাহস করে রেলে চেপে কলকাতায় রানীপিসিদের বাড়ি গিয়ে এই ব্যাপারে একটা নালিশও জানিয়ে এসেছিল। তাই হঠাৎ করে ছেলেপুলে নিয়ে রানীপিসির গাঁয়ের বাপের বাড়িতে ফিরে আসাটা জমিদারবাবুও খুব একটা ভাল চোখে দেখেননি।

মিশুকে, নম্র আর পরোপকার স্বভাবের দরুণ এমনিতেই এ গাঁয়ে রানীপিসির আগে থেকেই খুব সুনাম ছিল। ছবি মিঞাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মা বিবিমার সিন্নিটিন্নির ব্যাপারে আর প্রতি হপ্তায় ধন্না দিতে হবে না জমিদারবাবুর কাছে। গত বর্ষায় ছবি মিঞার ঘরের খোড়ো চাল ধ্বসে গেছে। কোটাঘরে থাকার প্রলোভন দেখিয়ে একদিন জমিদারবাবু ছবি মিঞাকে দিয়ে একটা গর্হিত কাজ করাতে চেয়েছিলেন। সেদিন ছবি মিঞা কোন সাহসে যে নারাজ হয়েছিল, তা সে আজও বুঝে উঠতে পারেনি। তারই ফলে, ছবির ঘর ঝড়ে ভেঙে গেছে জেনেও জমিদারবাবু কোন মদতই দেননি।

জমিদারবাবুর মতো অর্থবল না থাকলেও রানীপিসি ছবির থাকার ঘরের দুর্দশা দেখে স্থির থাকতে পারেননি। বলেছিলেন, "এ কি ছবিদা, তোমাদের ঘরের এ কি ছিরি? এই ঘরে তোমরা থাক কি করে? মাথার ওপর চাল নেই, ঘরের কোন দেয়াল নেই, শুধু থ্যাঁতা-বেড়া দিয়ে ঘেরা। আমাদের বাড়ির ভেতর মানুষ সমান উলু গজিয়েছে, বিশেকে বলেছি সেগুলো কেটে দিতে। তাই দিয়ে তোমাদের ঘর যত তাড়াতাড়ি পারি নিজে দাঁড়িয়ে ছাইয়ে দেবো। খড়ের চেয়েও মজবুত হবে। তুমি কেমন ধারা মানুষ বল তো? এত কষ্টে আছ, অথচ আমাকে একটা খবরও পাঠাওনি। এ কি সব অলুক্ষুণে কথা। তুমি মা বিবিমার সেবায় আছ, আর তোমার সেবা এ গাঁয়ের কেউ করবে না।"

রানীপিসির কথাগুলো শুনে ছবি মিঞা কোনো উত্তর দিতে পারেনি সেদিন। জন্ম থেকে যে রানীকে সে দেখে এসেছে, শ্যামবাজারে মামার বাড়িতে যার ধূমধাম করে বিয়েতে ছবি মিঞার নেমন্তন্ন হয়েছিল, সেই রানী এখন বিধবা হয়ে গাঁয়ে ফিরে এসে তাকে যে কথা শোনাল, তাতে তার মনটা উদাস হওয়াই স্বাভাবিক। চোখের কোণে দেখা গেল কয়েক ফোঁটা জল টলমল করছে। শুকনো গাল বেয়ে জলের ধারা নামার আগেই ছবি কাঁধের গামছাটা দিয়ে সেটা মুছে ফেলার চেষ্টা করেও যেন মুছে ফেলতে পারল না। গুমরে গুমরে কাঁদতে ইচ্ছে করে তার। রানীর সামনে কাঁদতে আজ আর তো তার কোন দ্বিধা নেই।

(১২)

জমিদারবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রানীপিসির বাড়ি যাওয়ার জন্যে ঘুরপথে না গিয়ে বিশু পালপাড়ার ভেতর দিয়ে যাবার পথটাই বেছে নিলে। তাছাড়া কাছেই মা বিবিমাতলা। ছবি মিঞাকেও এই ফাঁকে জমিদারবাবুর মিটিং ডাকার খবরটা জানিয়ে দেওয়া যাবে। যদিও বিশু জানত পালপাড়ায় অনেকগুলো কুকুর আছে, অন্য পাড়ার কেউ এখানে এলে কুকুরগুলো দল বেঁধে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায়। আর সাইকেলআরোহী হলে দ্বিগুণ বিপদ। কুকুরগুলো হয়ত তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিজেদের এলাকা সামলাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। এও বিশুর অজানা নয় যে, পালপাড়ার শিবুপালের মুখোমুখি হলে অনেক খোঁটা শুনতে হবে। তবু না গিয়ে উপায় নেই। রানীপিসির জন্যেই আজ পালপাড়ায় আসা। রাস্তার ওপরেই শিবুপালের বাড়ি। বাড়ির সামনে ফুলের গাছে ঝারি দিয়ে জল দিচ্ছিল শিবু। থোকা থোকা চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে গাছে, পাশেই রজনীগন্ধার সারি। আর আছে নানান রঙের গাঁদা ফুলের বাহার। কুমোর হলে কি হবে, শিবুপালের পছন্দের তারিফ না করে পারেনা বিশু। জমিদারবাবুর মতো অত কাঠখোট্টা সে নয়। বিশুকে দেখে শিবুপাল বার বার যেমন বলে এবারও প্রসঙ্গ তোলে,

- এই বিশে, তুই একাই দেখছি আমাদের ব্যবসা সব লাটে তুলে দিবি। তা যদি না হত, তাহলে তুই পেতলের ঘড়া না নিয়ে মাটির ঘড়াই নিতিস।

- পেতলের না হলে কবে যে দেউলে হয়ে যেতাম, সে খেয়াল আছে? জল তুলতে গিয়ে ঘড়া কতবার হাত হড়কে পড়ে যায়, তা জান? দিনে বোধহয় পাঁচ ছ'টা করে ঘড়া কিনতে হত।

- তাই তো বলি, যত তাড়াতাড়ি তোর ঘড়া ভাঙবে, তত তড়িঘড়ি আমাদের ঘড়া ঘড়া লাভ।

বিশু হেসে ফেলে বলে, “ওরেব্বাবা, কবিতা বানিয়ে ফেললে দেখচি। আজ কিন্তু তোমার কাছে আমি কিছুই কিনব না বলে আসিনি। আমাকে একটা ভাল দেখে ভাত রাঁধার বড় হাঁড়ি বেছে দাও তো।

- এই তো কদিন হল গাঁয়ে এলি, ইরিমধ্যে হাঁড়ি আলাদা? - অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে শিবুপাল।

- আর একটা জলের কলসি । মোট কত দাম পড়বে?

- তোর সঙ্গে দরাদরি করব না। যা ন্যায্য দাম তাই নেব।

- রানীপিসি বেধবা মানুষ। দামটা তাই একটু বুঝেশুনে ক'য়ো।

শিবুপাল বলে, “কি বললি, রানীদির জন্যে? সেকথা তুই আগে বলবি তো। যা, এমনি নিয়ে যা। তোকে কোনো পয়সাকড়ি দিতে হবে না।”

বিশু অবাক হয়ে উল্টে প্রশ্ন করে, “কেন মাগনায় কেন? আমি তো পয়সা সঙ্গে করে এনেছি।

- দ্যাখ্, এই সামান্য ব্যাপারে অত খুঁতখুঁত করতে নেই। সেই সেবারে মায়ের দয়ায় গাঁ উজাড় হওয়ার দাখিল, তোর আর মনে থাকবে কি করে বল, তুই তো তখন এখানে ছিলি না। সবাই শয্যাশায়ী, শুশ্রূষা করার জন্যেও কেউ বাকি নেই। রানীদি খবর পেয়েই কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিল। একমাত্র দাইমা কামিনীবুড়ি সুস্থ ছিল, তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে এপাড়া ওপাড়া এর ওর বাড়ি গিয়ে, জাত বিচার না করে, দিন নেই রাত নেই, তোয়াজ করে, সবাইকে ফের একরকম চাঙ্গা করে তুলেছিল। শুধু আমাদের পালপাড়ার নারানটাকে আর বাঁচানো যায়নি। সারা গায়ে জলবসন্ত গুটি বেচারাকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে। রানীদি না থাকলে তোর এই বৌদিকেও হয়তো বাঁচানো যেত না। বুয়েচিস বিশু, বেইমান না হলে সেসব কথা কখনোই ভোলা যায়না। আমার নাম করে রানীদিকে বলিস, শিবে এগুলো প্রণামী দিয়েচে। নিতে যেন কসুর না করেন। বুইলি?

- এই যাঃ, প্রায় ভুলেই গেছলাম জিজ্ঞেস করতে, আচ্ছা, কাতার দড়ি পাই কোথায় বল তো? দু'ছড়া দরকার।

- কাতার দড়ি দিয়ে কি করবি?

- বিঁড়ে বাঁধব।

- বিঁড়ে বাঁধবি? কাতার দড়ি দিয়ে? বিঁড়ে খড় দিয়ে বাঁধ, নইলে শুকনো খড়খড়ে হয়ে যাবে। বলে শিবুপাল। তারপর বাড়ির ভেতরের দিকে তাকিয়ে বলে, কই গো, কোথায় গেলে গো? ঘরের আড়া থেকে দু'কাছি কাতার দড়ি এনে দাও তো। রানীদির দরকার। আমার কাদা পা, আর দাবায় উঠবো না।

কাতার দড়ি নিয়ে আসে শিবুপালের বৌ। বিশুকে দেখে মাথার ঘোমটাটা একটু লম্বা করে টেনে দিয়ে বলে, "কি গো ঠাকুরপো, কেমন আচো, অমোন দাড়ি আখ্‌চো কেন? তোমায় কেমন য্যানো ঠাকুর আমকিস্টোর মতো দেকাচ্চে।

- খাঁটিকথা বলেচো তুমি। বিশু ছিল আগে ছিল জবরদস্ত, পাক্কা খেলোয়াড়, এবার হবে আসল অবতার।

কথাটা বলে শিবু তার বৌয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাসতে শুরু করে দেয়।

শিবুপালের বৌয়ের হাসি হঠাৎ যেন বিশুর প্রাণে রং ধরিয়ে দেয়। চন্দ্রমল্লিকার মতো শুভ্র, পবিত্র রং। কেন যে অন্যের বৌ এত করে মনে ধরে, তার কারণ খোঁজার বৃথাই চেষ্টা করে বিশু। নিজের বৌ হলেও কি তাহলে এমনিই মনে ধরবে? বিশুও কি শিবুপালের বৌয়ের মনে ধরে, জানতে ইচ্ছে করে। শিবুপাল আর তার বৌ, ওদের দুজনের মধ্যে বয়সের কতো ফারাক, তবু যেন ওরা কত সুখী।

শিবুর বৌ আরও কিছু কথা বলে, “আবার এয়ো, ঠাকুরপো, বামুনের পদধূলি দিও। অধমের ঘরে জলগ্রহণ করে ধন্যি কোরো।

বিশুর মনটা হঠাৎ কেমন যেন ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, আর গড়িমসি করা চলে না। দড়ির ছড়া দুটো মালার মতো গলায় ঝুলিয়ে, দুই হাতে হাঁড়ি আর কলসি, আর বগলদাবায় করা ফুটবল নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে দিল বিশু।

(১৩)

পাবুমুদি আর তেলেভাজাওয়ালা গুণোমনির দোকান পেরিয়ে কাছারিবাড়ির নতুন ডাক্তারের ডাক্তারখানার পাশ দিয়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে শ্মশান এলাকায় পৌঁছনোর আগে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বিশুর।

গলায় কাতার দড়ির মালা, হাতে বগলে মাটির কলসি আর ভাতের হাঁড়ি আর চোপসানো হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া ফুটবল। বিশুকে এই অবস্থায় দেখে ডাক্তারবাবু না হেসে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, “এই যে বিশ্বেশরবাবু, দড়ি কলসি নিয়ে এই বেলা থাকতে থাকতেই চললেন কোথায়?”

বিশু সে কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে,

- আমার কথাটা মনে আছে তো ডাক্তারবাবু?

- কি কথা?

- আমায় কিন্তু একটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সত্যিই আমি ভুগছি কি না। লোকের কথা তো আর ফালতু বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।

- লোকের কোথায় কি এসে যায়? আপনি নীরোগ থাকলে আর কি চাই।

- আপনি বলছেন, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তবু আমাকে একটু দেখে দিলে নিশ্চিন্ত হই। পুঁচকে ছোঁড়ারাও আমার পেছনে লাগে মাঝে মাঝে। পাগলা পাগলা বলে ডাকে। সত্যিই কি আমার উন্মাদরোগ হয়েছে, ডাক্তারবাবু?

- আপনার কথা আমি কিছুই ভুলিনি। আমার এক বন্ধুকে আমি সামনের মাসে আসতে বলেছি। উনি মানসিক রোগের চিকিৎসক। এলে আপনাকে খবর দেব। আপনার কথাটাও ওকে সব আগাগোড়া জানিয়ে দিয়েছি। আপনি রোজ রোজ শিবমন্দিরে জল ঢালেন তাই লোকে আপনাকে পাগল ভাবে। এই কাজটা আপনি স্বেচ্ছায় করেন। বিনিময়ে একটা পয়সাও নেন না। দেশটা আমাদের যেত কোথায় বলুন তো স্বেচ্ছাসেবী না থাকলে? এই কাজের বিনিময়ে যদি পয়সা রোজগার করতেন তাহলেও কি লোকে আপনাকে এই আখ্যা দিতে পারত। কই খাটাপায়খানা সাফ করার লোকজনকে তো কেউ এভাবে হেনস্থা করছে না!

- যাক, এবার ভরসা পেলুম। আপনার ঋণ যে কিভাবে শুধব, জানি না।

- ঋণফিন আপনি কিছুই করেননি, বিশ্বেশ্বরবাবু। ও হ্যাঁ, আমার বন্ধু কিন্তু একা আসছেন না, সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন মলিনাদেবীকে।

উৎফুল্ল হয়ে বিশু বলে, “ও তাই নাকি। মলিনা ভাল হয়ে গেছে? আবার আগের মতো হাঁটতে চলতে পারবে? গাছে চড়তে পারবে?

- না। আগের মতো পুরোপুরি না হলেও অনেকটা ভাল। এখন হুইলচেয়ারে বসে নিজেই এদিক ওদিক চলাফেরা করতে পারবেন মলিনাদেবী। আসার দিন আপনার একটু মদত লাগবে কিন্তু। ওঁরা ট্রেনে করে আসবেন বলেছেন।

- কিন্তু গাঁয়ের রাস্তাঘাট যে ভাল নয়। বর্ষায় চারদিকে কাদা প্যাচপ্যাচ করে। আর শুকনো হলে এবড়োখেবড়ো।

- সে কথা আমিও ভেবেছি। বর্ষার কথা বাদ দিন। অন্য সময় রাস্তা সমতল হলে কোন অসুবিধে নেই। দেখাই যাক না রাস্তাঘাটের কি ফয়সালা করা যায়। সবাই মিলে হাত লাগালে...গাঁয়ের চেহারা কি চিরকাল একই থাকবে। গাঁয়ের সর্বত্র রাস্তা পাকা হবে, বিদ্যুৎ আসবে সবার জন্যে...আরও কত কি হবে।

- আচ্ছা চলি তাহলে, ডাক্তারবাবু। এই হাঁড়ি, কলসি, দড়ি রানীপিসির জন্যে। নতুন করে বাপের বাড়িতে এসে সংসার পেতেছেন। আমি ওঁর কাছেই যাচ্ছি। রানীপিসির সঙ্গে আলাপ হয়নি আপনার? ওঁদের উঠোনের উলুঘাস কেটে পোস্কার করে দিতে বলেছেন আমাকে। তাই এই কাস্তেটা নিয়ে নিয়েছি সঙ্গে। এই যা, প্রায় ভুলেই গেছি, জমিদারবাবুর বাড়িতে কাল বিকেলে মিটিং। জমিদারবাবু আপনাকেও ডেকেছেন শুনলুম। যাবেন তো? আর হ্যাঁ, প্রায়ই আমি অনেক কিছু মাঝে মাঝে ভুলে যাই, এটাও একবার দেখে দেবেন। আগে তো এমন ভুলভাল হত না।

বিশু আবার পথ চলতে শুরু করে। এই নতুন ডাক্তারবাবুকে বিশুর ভালই লাগে। এ গাঁয়ে, এই প্রায় সমবয়েসি ডাক্তারবাবুটি ছাড়া, আজ অবধি আর কেউ তাকে বাবু বলে সম্বোধন করেনি। খুশি খুশি মন নিয়ে এগিয়ে যায় বিশু শিস্ দিতে দিতে শ্মশানের দিকে।

(১৪)

শ্মশানের দিকে যাবার পথটা দিনের বেলায়ও বিশাল বট আর অশ্বত্থগাছের ছায়ায় প্রায় অন্ধকারে ঘেরা থাকে। কাছারিবাড়ির সীমানার পরই রাস্তার বাঁদিক বরাবর খাল বয়ে যাচ্ছে। পাড় থেকে অবশ্য খালের জল দেখা যায় না। সাপের ফণার মতো মাথা উঁচু করে হাওয়ায় দোলে বড় বড় কচুরিপানা। কেয়া আর হোগলাবনের ঝোপও আছে। সিঁড়ি বাঁধানো ঘাটে নামতে গেলে একটা পাকা ঘরের পাশ দিয়ে যেতে হয়। ঘর বলতে একটাই কামরা। জানালাবিহীন। দরজা হয়ত এককালে ছিল। এখন শুধু অবশিষ্ট রয়ে গেছে উইপোকায় খাওয়া দরজার ফাঁকটুকু। বট আর

অশ্বত্থগাছের শেকড়গুলো একসাথে ঘরটাকে অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে দিনের পর দিন আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। ওই গাছগুলোকে দেখে বিশুর হিংসে হয়। সে আর হেনা, দুজনে দুজনকে যদি ওই গাছগুলোর মতো একে অপরকে জড়িয়ে ধরতে পারত... ভাবে বিশু। ঘরের ভগ্নদশা দেখেও কেন যে তার কোন মায়া হয় না, কে জানে।

ঘরের ভেতর মেঝেটা কিন্তু এককালে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো ছিল। সেখানেও বাসা বেঁধেছে গাছের শেকড়গুলো। নিচ থেকে চাড় দিয়ে পুরো মেঝেটাকে খাবচা খাবচা আবের মতো ফুলিয়ে ফাটিয়ে দিয়ে মাটি বের করে দিয়েছে। দরজার সামনের দেওয়ালে মানুষের কাঁধ সমান উঁচুতে একটা ফোকর। একসময় সেখানে তেলের পিদিম বসিয়ে হয়তো আলোর ব্যবস্থা করা হতো। এই ঘরটা জমিদারবাবুরা একার প্রচেষ্টায় তৈরি করিয়েছিলেন, না ভাতারমারি গাঁয়ের লোকেরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে, তার হুবহু কোন প্রমাণ না মিললেও, কেন যে এখানে এই ঘরটা তৈরি করানো হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ আজও লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে।

শুধু শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে ঘরটা বানানো হয়নি। যদিও শ্মশানে শবদাহের আগে সবাই এই ঘাটতলায় এসে সৎকারের প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি সারেন। যেসব শব শ্মশানে দাহ করার আগে আবার বেঁচে যায়, তাকে তো আর স্বাভাবিকভাবে সমাজে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। সেই সব হঠাৎ বেঁচে যাওয়া শবেদের কথাও সমাজ একেবারে নগণ্য করে দেখেনি। তাঁদের আবার সত্যি সত্যি মরার দিন অবধি এই ঘাটের ঘরটায় আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে রেখেছিল মানুষের সমাজ। এ গাঁয়ের কাউকে কোনদিন এ ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল কিনা, তা বিশু আজও সন্ধান করে জানতে পারেনি। আর নিজেও তা কোনদিন দেখেনি। দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে তার নোটবুকে যে অনেকগুলো জিজ্ঞাসার চিহ্নসমেত লেখা হয়ে যেত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দরজার ফাঁকটায় মাথা গলিয়ে ঘরের ভেতরে একটু উঁকি দিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে এখন কার বাস। মেঝেয় ইঁদুর আর আড়ায় চামচিকে। কে বলতে পারে, ইঁদুরের সান্নিধ্যের লোভে মাঝে মধ্যে দু একটা সাপও এখানে হাওয়া খেতে আসে কিনা।

বিশু দেখেছে নিজের চোখে। সদ্য প্রেমে পড়া প্রেমিক-প্রেমিকাদের এখানে আসতে আর এই ঘরে ঢুকতে। অবৈধ প্রেম। লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম বিনিময়ের এমনই টান যে, কোন রকম সাপখোপ বা ভূতপ্রেতের ভয়ও তাদের বিচলিত করে না। এইসব টুকরোটাকরা প্রেমের ঘটনার কথা বিশু নোটবুকে লিখে রাখলেও, কোনদিন কারো কোন নামের উল্লেখ করেনি।

ঘাটটার এই ঘরের অনতিদূরে রাস্তার বাঁহাতি জিহ্বাকৃতি একফালি জমি খালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। সেটাই হল এই গাঁয়ের আসল শ্মশান। সিমেন্টের আটখানা থামের ওপর পাকা চালার এই লোক বসবার এই শ্মশানঘরটা না থাকলে, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে গজিয়ে ওঠা আগাছার জঙ্গলে ঠাহরই হত না, এটাই শ্মশান। থামগুলোয় কত লোকে কত কি লিখে রাখে পরলোকগতদের উদ্দেশ্য। বাংলার অজ পাড়াগাঁ হলেও নানান ভাষায় লেখা। কালো কাঠকয়লা দিয়ে কে যেন সাইনবোর্ড লেখার কায়দায় লিখে দিয়েছে ইংরিজিতে > বার্নিং ঘাট <। এই ঘাটে অবশ্য অতীতে কখনো কোনদিন কোন নৌকো ভিড়েছিল কিনা তার কোন দলিলপ্রমাণ না থাকলেও, সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। কারণ, আজ যেখানে শ্মশান, সেটা তো পুরোপুরি এককালে গঙ্গার কবলে ছিল।

বসার জায়গাটার ভেতর দিয়ে খালের দিকে এগোলে জমিটার শীর্ষভাগে চোখে পড়ে ইঁট দিয়ে বাঁধানো পাকা চিতে। যাঁদের হাতে অপর্যাপ্ত কাঠ নেই, তাঁদের কেউই এই পাকা চিতেয় শবদাহ করেন না। মাটিতে লম্বাকৃতি গর্ত খুঁড়ে কাজ চালিয়ে নেন। কোথায়, তার তেমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যেখানে হোক, হলেই হল। তবে একটা শর্ত সবাইকেই মেনে চলতে হয়, দাহ সম্পন্ন

হবার পর গর্তটা আবার বুজিয়ে দেওয়া। ভাঙা মালসা, কলসি যা অবশিষ্ট থাকে আবার ঢাকা পড়ে যায় মাটির নিচে। খালটা আদিগঙ্গারই শেষ রেশ বলে ভস্মিত দেহাবশেষের এখানেই বিসর্জন হয়। ভাতারমারি গাঁ মানেই এখানকার সব জলাশয়ই মা গঙ্গা। তা মেনেই এ গাঁয়ের খাল, বিল, পুকুর, কুয়োর সব জলই গঙ্গাজলের মর্যাদা পায়।

শ্মশানের এই এক চিলতে জমিটাকেও আড়াল করে রেখেছে তিনটে বিশাল গাছ। বট, অশ্বত্থ আর একটা তেঁতুলগাছ। তিনটে গাছের মোটা মোটা গুঁড়িগুলো সবই খালের জলের তলায়। তবু গাছগুলো হেজে পচে যায়নি। মড়া পোড়াবার সময় যখন সেই তিনটে গাছের পাতাগুলো ধোঁয়া আর আগুনের ঝাঁঝে কিলবিল করে কাঁপে, তখন লোকে বলে, দেখছিস, আত্মা দেহ ছেড়ে এবার সত্যিই বিলীন হয়ে যাচ্ছে অসীম অশরীরী অনন্ত আত্মায়। তাই গাছের পাতাগুলো নাড়িয়ে ঝাঁকিয়ে জানান দিচ্ছে।

ছায়ায় ঘেরা শ্মশান এলাকা দিনের বেলাতেও বেশ ফাঁকাফাঁকা, নিরিবিলি। নেহাত প্রয়োজন না পড়লে গাঁয়ের লোকেরা স্বভাবতই শ্মশানের পাশ দিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা এড়িয়ে চলে। রাতে তো কথাই নেই। ঘুরপথে যেতে হয় তাও সই। তবু যারা যায় আসে, বুলি আওড়ায় জোরে জোরে - ভূত আমার পুত, শাঁকচুন্নি আমার ঝি, রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, করবে আমার কি? ভাতারমারি গাঁয়ের অধিকাংশ লোকের র আর ল উচ্চারণে অসুবিধে হলেও কিছু এসে যায় না। রাম লক্ষ্মণের বদলে আম নক্ষোণ বললেও ফলটা একই দাঁড়ায়। মনে বল বাড়ে। ভুতপ্রেতের দৌরাত্ম্য ফলপ্রসূ হওয়ার আগেই তারা নির্বিঘ্নে রাস্তা পেরিয়ে যায়।

আগাছার ঝোপঝাড় কেটে মাটিতে মানুষসমান লম্বালম্বি গর্ত খুঁড়ে শ্মশানযাত্রীরা শুধু মড়া পোড়াবার তাগিদে কোনরকমে চিতে সাজাবার ব্যবস্থা করে। এই জায়গাটাকে অন্যথায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কারোর কোন গা নেই। তাই ঝোপ জঙ্গল কালে কালে এতই বেড়ে ওঠে যে, রাস্তা থেকে

পাকা চিতেটা চোখেই পড়ে না। অবশ্য গাঁয়ের লোকেরা আগেকার দিনে পালা করে এই শ্মশান চত্বরটাকে আগাছামুক্ত করে রাখত। খালে জমা কচুরিপানা নিয়মিত পরিষ্কার করত। দিনের বেলা ট্রেন থেকে নামলেই চোখে পড়ত শ্মশানের পাকা চিতেটা। এখন আর সরাসরি চোখে পড়ে না, শ্মশানে ধোঁয়া উঠছে দেখে তাই আন্দাজ করে নিতে হয়, গাঁয়ের কেউ গত হয়েছেন। রাতের বেলা চিতের আগুনের হল্কা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার চিরে সবাইকে জানিয়ে দেয় আজ ফের শ্মশান জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

এখানে বন্ধুর দেওয়া শিম বরবটির দানাগুলো পুঁতেছিল বলেই বিশু প্রায়ই দেখতে আসে, কদ্দুর বাড়ল গাছগুলো। জলের অভাব হলে খাল থেকে জল তুলে গাছের গোড়ায় ঢালে। যারা মড়া পোড়াতে এসে শ্মশানবৈরাগ্যের ভাব অনুভব করে ক্ষনিকের জন্যে, তাদের মতো বিশুর তেমন কোনো অনুভূতি না হলেও এখানে এসে সে বেশ শান্তি পায়, পাকা চিতের ওপর বসে নিজেকে নিজের মনের মতো করে গল্প শোনায় আর মাঝে মাঝে তৃপ্তিতে ভরে যায় তার মনটা।

আজ রানীপিসির বাড়ি যাওয়ার পথে শ্মশানের এই কুঠিটার কাছে এসে বিশু একটু ভড়কে গেল। রাস্তা থেকে পাকা চিতের দিকে নজর যেতেই দেখল, ঝোপঝাড়ের মাথায় কুয়াশার মতো একরাশ ধোঁয়া থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জনমানবশূন্য শ্মশানের পাকা চিতা কি আপনাআপনি ধরতে শুরু করে গেল। আগুনটা ছড়িয়ে পড়লে বিশুর পোঁতা গাছগুলোও জ্বলে যাবে ভেবে শ্মশানের বিশ্রামঘরের সিমেন্টের বেঞ্চিতে সঙ্গে আনা দড়ি, হাঁড়ি, কলসি আর চোপসানো ফুটবলটা রেখে দৌড়ে গেল জমির শেষপ্রান্তে পাকা চিতের দিকে। পায়ে ফুটে গেল একটা ভাঙা শামুক। অন্য আর একটা গোটা শামুকের খোল হাতে নিয়ে মুখ তুলে চেয়ে যা দেখল, তা যেন ঠিক বিশ্বাসই হতে চাইল না।

(১৫)

শ্মশান ছেড়ে আর একটু দক্ষিণ দিকে এগোলে তেমাথানির মোড়। দোলের দিন সন্ধ্যেবেলা এখানে কৈবর্ত্য পাড়ার সবাই মিলে বাঁশের খুঁটিতে কলার বাসনা দিয়ে নেড়া তৈরি করে পোড়ায়। ছোটবেলায় বিশুর বাবা বিশুকে অনেক মজার মজার গল্প শোনাতেন। এই নেড়া পোড়ানোর ব্যাপারে বলেছিলেন, "জানিস বিশু, মানুষের জীবনে কালের পরিবর্তনে অনেক কিছু পাল্টে গেলেও কিছু কিছু জিনিষ মানুষ আঁকড়ে ধরে রাখে। তখন কিন্তু চেনা মুশকিল, মূলে কি ছিল। অতীতে শুধু আমাদের দেশেই নয়, অনেক দেশেই মানুষ মানুষকে পুড়িয়ে মারত, হয় শাস্তি দেবার জন্যে, নয় দেবতার কাছে আহুতি দেবার জন্যে। তখনকার দিনে একসঙ্গে অনেককে উঁচু মাচায় বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে দিত। আজ মানুষের বদলে ফলমূল দেয়, সেই পোড়াবার রীতিটা কিন্তু বজায় থেকে গেছে। আর শবযাত্রার সময় লোকে এত জোরে কেন হরিধ্বনি দেয় জানিস?" তার ব্যাখ্যা করেও বলেছিলেন, "আগে আমাদের দেশে সতীদাহপ্রথা ছিল, শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় সতীর আর্ত চিৎকার শুনে নরমমনা কেউ এসে যদি বাগড়া দেয়, তার জন্যেই মানুষ তৈরি করেছিল এই দলবেঁধে ঢোল খঞ্জনি বাজিয়ে হরিবোল দেওয়ার পদ্ধতি। হরিবোলের ঠ্যালায় সতীর আর্তনাদ চাপা পড়ে যেত। হরিবোল তো নয়, একেবারে হরিবল্ সব ব্যাপার।"

তেমাথানির মোড় থেকে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে কয়েক পা গেলেই, খালটা যেখানে হঠাৎ বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে রেললাইনের কালভার্টের নিচ দিয়ে বইছে, ঠিক সেখানেই আম, তেঁতুল আর বাবলা গাছের ছায়ার নিচে এ গাঁয়ের গোভাগাড়। খালের জলের এখানে কোন তোড় নেই। কালভার্ট পেরিয়ে পূবদিকে আর একটু গিয়েই খালটা হঠাৎ যেন উবে গেছে। বিশু নিজের চোখে না দেখলেও শুনেছে এই খালটা নাকি আদিগঙ্গা কালিঘাট থেকে শুরু করে নানা গাঁ গঞ্জ ছুঁয়ে মিশে যেতো মাতলা নদীর সঙ্গে। সেখান থেকে ফিরিঙ্গি, মগ জলদস্যুরা নৌকো বেয়ে গাঁয়ে গঞ্জে ঢুকে পড়ে লুঠতরাজ চালাত। তার প্রমাণ আজও পাওয়া যায় মুখে মুখে চলে আসা ছড়ায় গানে।

যানবাহন বলতে যখন পাল্কি আর গরুর গাড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না, তখন এই খালের বেশ রমরমা ছিল। ভাতারমারি গাঁয়ের আশেপাশের গাঁগুলোতে যে সব জায়গার নাম ঘাট দিয়ে, সেখানে তখনকার দিনে নৌকোযাত্রীদের ওঠানামার ব্যবস্থা ছিল।

অনেক সময় দেখা যেত দূর দূর গ্রাম থেকে লোকে তাড়াতাড়ি থাকলে নৌকোয় না গিয়ে খাল বরাবর হেঁটে যাচ্ছে। আজকের দিনে যানজটে যেমন হেঁটে গেলে সময় বাঁচে। সেকালেও সেই সমস্যা ছিল। জোয়ারভাঁটার ওপরেই নির্ভর করতো চলার গতি। ভাতারমারি গাঁয়ের অস্তিত্ব বেশিদিনের নয়। সাগর থেকে পাওয়া। চড়া পড়ে জমি সৃষ্টি হতেই মালিকানা ন্যস্ত হল কিছু কিছু ক্ষমতাশালী লোকের ওপর। তাঁরাই বিধান দিলেন কারা কারা এই জমিগুলোয় বসবাস আর চাষবাসের স্বত্ব বা অধিকার পাবে। মাগনায় নয়। প্রতিবছরে কর দেওয়ার নিয়মও একটা চালু হয়ে গেল। কেউ অন্যের জমির ওপর লোভ দিলে, জবরদখলের অজুহাতে শাস্তির ব্যবস্থাও স্থির হল কি ধরণের হবে। ট্রেন আর বাস চালু হয়ে যাওয়ার পর খালের গুরুত্ব আর আগের মতো তেমন রইল না। লাগোয়া জমির অংশীদাররা যে যার খুশি মতো খালটা বুজিয়ে নিয়ে চাষবাসের জমি বানিয়ে নিল। জমিদারবাবুরা অনুমতি দিয়ে বেশ কিছু মুনাফাও লুটল। ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার পর এলো দেশি সরকার। সরকারি আমলা আর রাজনীতিবিদদের মাথায় এল দেশ সংস্কারের কথা। জল, স্থল সবই সংস্কার করার পালা এল। গ্রামেগঞ্জে পড়ে গেল জরিপের হিড়িক। সরকারের পক্ষ থেকে ভাতারমারি গাঁ জরিপ করতে এসে দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটেঘুঁটে বে-দখল জমিগুলো ধরা পড়ে গেল। সে বাবদেই জমিদারবাবুর কাছারিবাড়ির বিশাল দিঘিটা আর বিশাল থাকল না। শ'খানেক মাটিকাটার মজুর লাগিয়ে সরকার খালটাকে চওড়া করে দিতেই জমিদারবাবুর সেই দিঘির আয়তন আজ ছোট্ট পুকুরে পরিণত হয়ে গেল।

আইনত জমিদারবাবুর প্রতিবাদ করার কোনও উপায় ছিল না। করলে হয়ত তাঁর নামেও রুজু হয়ে যেতে পারত জবরদখলের মামলা। গাঁয়ের সবার কাছে যাতে ছোট না হতে হয়, তাই তিনি উল্টে

এমন একটা বদান্যতার ভাব দেখাতে লাগলেন, যেন তিনি স্বেচ্ছায় দেশের ভালোর জন্যেই নিজের জমির কিছু অংশ সরকারকে দান করে দিচ্ছেন।

কিন্তু যারা একদিন এই জমিদারবাবুর অমায়িকতায় খালের অন্য জায়গায় জমি দখল করেছিল, তাদের অবশ্য সরকার অত সহজে রেহাই দিল না। তাদের নামে মামলা হল, জরিমানাও।

বিশু ব্যাপারখানা দেখে নোট বুকে লিখে রাখল, সব শালারই পরের ধনে পোদ্দারি। রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখিরি অবধি। সারা ভাতারমারি গাঁখানাই তো পরের ধন। এখানে যে যার মতো ছড়ি ঘোরাবার কেরামতি দেখিয়ে আসছে সেই জন্মক্ষণ থেকে। কার অধিকার জলে, কার অধিকার স্থলে? প্রশ্নগুলো মাথায় আসতে বিশু শুধু আপন মনেই হাসে। সব শালাই চোর বাটপার, তা তুমি জমিদার, পুরুত কিংবা দারোগা, যাই হও না কেন। তবে তুমি, শালা, সরাসরি সামনাসামনি কিছু করলে বা বললে, সমস্ত দোষ গিয়ে পড়বে তোমার ঘাড়ে। তাই এ গাঁয়ে রস্কের মতো ডাকাতদেরও আর কোনও রেহাই নেই, ভবিষ্যৎ নেই। কারণ তারা রেখে ঢেকে কিছু করে না, যা করে সামনাসামনি করে।

(১৬)

শামুকের খোলার পিঠের দিকটা শ্মশানের শানে ঘসে ঘসে এমন পাতলা করে, যাতে আলতো একটু চাপ দিয়ে একটা ফুটো করা যায়। রানীপিসির শহুরে ছেলে, অমলকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে বিশু। এই ফুটো করা শামুকটা আকাশে ছুঁড়ে দিলে শব্দ হবে, ঘুঘুপাখির ডাকের মতো, ঘুঘু-ঘুঘু। এমন কলাকৌশল ও শহরে নিশ্চয়ই দেখেনি কখনও।

শ্মশানের ধোঁয়াটা লক্ষ্য করে এগোতেই বিশু গাঁজা, আফিং-খোর হাবুলকে দেখে ফিরতে যাবে, হাবুল হুঙ্কার ছাড়ে, “ব্যোম ভোলে। এ্যাই, বলতে না বলতেই শিবের আবির্ভাব। আয় বাবা, বিশ্বেশ্বর, ব্যোম ভোলে। এলি নাকি গাঁজার টানে? খাবি?”

সিঁটকে চেহারার হাবুলকে দেখলে মনে হয় দেহের হাড়গুলো শুধু এক পরত চামড়া দিয়ে ঢাকা। মাংস বলতে দেহে কিছুই অবশিষ্ট নেই। গাঁয়ের রং কুচকুচে কালো। এতো কালো যে, চোখের নিচে কালি পড়লে তফাৎটা বোঝাই দুষ্কর। আর অন্ধকারে গোটা শরীরটাই অদৃশ্য। ডান পায়ের ডিমের নিচে একটা সাদা ফেট্টি বাঁধা।

বিশু উত্তর দেয়, “ওসব ম’লেও ছোঁব না। তা তোমার পায়ে পট্টি কিসের? নাকি গলার বদলে ভুলে পায়ে পরে ফেলেছ?

- আর বলিস ক্যানো, বাবা বিশ্বেশ্বর। ব্যোম ভোলে, কেটেছে।

- কেটেছে? কি কেটেছে, কে কেটেছে? আমি তো ভাবলুম তুমি হয়ত পায়ে কলম বেঁধেছ।

- কেউটে ফেউটে হবে হয়ত।

হাবুলের মুখে চোখে কেমন যেন তাচ্ছিল্যের ভাব।

- সেকি ! আর তুমি অমন নিশ্চিন্তে বসে আছ? কতক্ষণ হলো কেটেছে?

- এই তো এখানে আসার একটু আগে। ভুল করে কেটে ফেলেছে, আমি সুমুন্দির ব্যাটাকে ক্ষেমাঘেন্না করে দিছি। শ্লা, নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে পড়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আফিংয়ের ঘোরে। একবার ঠিকমত নেশায় পেলে, আবার আসবে আমার কাছে। ভাগ বসাবে আমার আফিংয়ে।

বিশু আর কোন কথা শুনতে চায় না। বলে, “চলো, এক্ষুণি তোমায় নিয়ে যাই নতুন ডাক্তারের কাছে । পাল্টা ওষুধ না দিলে...”

- আরে ছাড়, শ্লা, তোর ডাগ্‌তার কোব্‌রেজ। যমের বাড়ি নে যেতি যমরাজ ঝ্যাখোন পায়ে ধরতি নেগেচেন, ত্যাখোন আর না করার উপায় নেই। তা, তুই এখেনে কি করতি, বললি না তো?

হাবুলকে নিয়ে ডাক্তারখানার দিকে যেতে গিয়ে বিশু মুখোমুখি হয়ে যায় পরপর তিনটে গরুর গাড়ির। পাট বোঝাই করে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে যাচ্ছে। সবই জমিদারবাবুর ফরমাশ মতো। প্রতিবছর আসে। বিশু আগে তা দেখেও যেন দেখেনি। জেল থেকে আসার পর তার টনক নড়েছে। কিছু কিছু জিনিস কেমন চেনা চেনা লাগে। বিশেষ করে কালো রংয়ের দড়ি। জেলে থাকতে দেখেছিল। বংশপরম্পরায় ঠিকাদারি পেয়ে আসছেন জমিদারবাবুরা সেই মোগলবাদশাদের আমল থেকে। ইংরেজদের আমলে তার পরিমাণও দশগুণ বাড়ে। যা দেশ স্বাধীন হবার পরেও বহাল থেকে গেছে। পাট দিয়ে তৈরি হয় দড়ি। এক ধরণের দড়ির রং জলপাই। আর অন্যটা কালো, গাব আর মোমের কষ দেওয়া দড়ি। জলপাই রঙের দড়ি দিয়ে জাল বুনে সরবরাহ করা হয় সেনাবাহিনীতে। আর শক্ত, মজুত কালো দড়িগুলো চালান যায় দেশজুড়ে বিভিন্ন কারাগারে। ফাঁসির দড়ি। যাত্রা দেখে দেখে বিশু জেনেছে, মঙ্গল পাণ্ডে, মহারাজ নন্দকুমার আর ক্ষুদিরামের ফাঁসির কথা। এই রকমের কোন দড়িতেই তাঁদের ফাঁসি হয়েছিল। আরও কত মানুষ মরে। আর সেই মানুষ মরার সুবাদেই ভূরিভূরি অর্থ উপার্জন হয় জমিদারবাবুদের মতো লোকেদের। হিসেবে দেখা গেছে ফাঁসির দড়ি বিক্রি করে যে লাভ, মানুষ বাঁচানোর জন্যে হাসপাতাল খুলে সে লাভ হয় না। তাই জমিদারবাবুরা বরাবরই সার্বজনীন হাসপাতাল খোলার ব্যাপারে অত্যন্ত নিঃস্পৃহ ছিলেন। আত্মীয় হলেও কিশোরীডাক্তারকে কাবু করার জন্যেই একসময় জমিদারবাবু এ গাঁয়ে একজন নতুন পাশকরা ডাক্তার এনে বসান। কিন্তু সেই ডাক্তার যখন জনসাধারণের জন্যে একটা দাতব্য হাসপাতাল খোলার প্রস্তাব রাখেন, তখন তা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন জমিদারবাবু। বলেছিলেন, "আপনার ধান্দাটা কি বলুন তো মশাই? আপনি কি চান এ গাঁয়ে কেউ আর রোগে ভুগে মরবে না। সবাই যদি হাতের কাছে বিনে পয়সার ওষুধ পেয়ে যায় আর সব রোগবিরোগ উধাও হয়, তাহলে দেখবেন ক'দিন বাদেই এ গাঁয়ে আর তিলধারণের জায়গা অবশিষ্ট থাকবে না। চারদিক লোকে গিজগিজ করবে। আপনি মশাই ডাক্তারগিরি করছেন করুন, দেশের সংস্কার বা রাজনীতিতে আপনার নাকটা না গলানোই ভাল।"

ডাক্তারখানার দিকে যেতে যেতে বিশু হাবুলকে জানায় কেন সে বারবার শ্মশানে আসে। প্রায়ই এসে তদারক করে শ্মশান, গোভাগাড় আর রেললাইনের ধারে। ঢালু জায়গাটায় লাগানো শিম, করলা আর বরবটির গাছগুলো বেড়ে কয়েকদিনের মধ্যেই লতিয়ে আকর্ষী দিয়ে অন্য গাছে উঠে পড়েছে। ফুলও ধরতে শুরু করেছে, বিশেষ করে রেললাইনের ধারে।

- ও, এই কতা । আমি তো ভাবলুম, সত্যিই তুই গন্ধ পেয়ে আমার নেশায় ভাগ বসাতে এয়েচিস। তুই যখন ছোট ছিলি, আমার প্রিয় পাত্র ছিলি। মনে আচে তোর কতবার তোকে কাঁধে নিয়ে ঠাকুর দেখতে নিয়ে গেছি মহকুমা শহরে? কাঠিওলা বরফ, হজমি গুলি, তেঁতুলের জলে চোবান ফুচকা, কত রকম স্বাদের চাটনি, কি না খাইয়েছি তোকে।

- আর এখন ?

- শুনতে চাস? তবে শোন, এখন হলি গিয়ে তুই আমার মহাশত্তুর। তুই জোমদেরবাবুরও অধম।

- কেন? আমি আবার কি দোষ করলাম?

- জিজ্ঞিস করতি নজ্জা করে না? নোকে যারা জোমদেরবাবুর নামে নিন্দে করে, আমি তাদের বলি, নেমকহারাম। উনি শুদু নিতিই জানেন না, দিতিও জানেন। ওই দেক্, সুদর্শনকে দে একখান পেতল, আলুমিনির কেরখানা খুইলেচেন, ভেবে দেক্ দিকি, আমাদের মতোন গরিবদের কতা উনি কতখানি চিন্তা করেচেন। মাটির হাঁড়ি ঠুনকো, আলুমিনির হাঁড়ি একবার কিন্‌লি আজীবন কাইটে দিতি পারবি। আর দেক্, নিজে নেশাভাঙ করেন না, কিন্তুক আমাদের তরে আবগারি দোকান খুইলেচেন। আফিং, গাঁজা, চুল্লু, যা চাইবি, তাই জুটবে। মন কারাপ হলিই নোকে বায়স্কোপ দেখতি যায়, মন খোল্‌সা করতি। তাও ওই জোমদেরবাবুর দয়া। এগাঁয়ে সেগাঁয়ে মিলে তিন তিনটে বায়স্কোপ বাইনেছেন। সবাই তো আর বে' থা করতি পারে নে, কিন্তুক গ উঠলি কি করে নোকে, কোথায় যায়? তারজন্যি বাসআস্তার ধারে জোমদেরবাবু নিজির জমিতে ছোট ছোট ঘর বাইনে ভাড়া দেছেন, গজিয়ে উটেচে খানকিপাড়া। ভাঁড়ে মা ভবানী হলিও চিন্তা নাই, আদিস কাব্‌লিওলা তো

আচেই, ধার নে ঢুকে পড়, নইলি আমার মতো নোকির কি দশা হত? তুই বল না ! আর মন্দির? শুদু এ গাঁয়েই নয়, দূর দূর কতো গাঁয়েই বাইনে কি পুণ্যিটাই না কচ্চেন আমাদের জোমদেরবাবু। আর তুই? তুই কিন্তু আমার বড় শত্তুর।

- হাবুলদা, আমি তোমার শত্রু হতে যাব কেন? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি। আর শত্রুই যদি হব, তাহলে তোমায় ডাক্তারের কাছেই বা নিয়ে যাচ্ছি কেন?

- জুতো মেরে গরু দান করে পুণ্যির আদিখ্যেতা আর দেকাসনি আমায়।

- কেন, গরু মেরে জুতো দান করলে তুষ্ট হতে বুঝি?

- চ্যাংড়ামো তোর গেল না দেক্চি। তবে শোন্ ক্যানো তোকে শত্তুর বলচি। আমি তো ঘন ঘন খানকিপাড়ায় সুশীলার কাচে যাই, ও এ্যাকোনো ওর সই মায়ার শোকে কাতর। এখনও কেবলই বলে, কি করতে যে মরতে সার্কাসে নে গেছেলো বিশু, বেঘোরে ম'লো বেচারি।

বাকি পথটা কেউ আর কোন কথা বলে না। বিশু ভাবতেও পারেনি হাবুলের মুখ থেকে এমন একটা অভিযোগ তাকে কখনও শুনতে হবে।

(১৭)

মানুষ আর তাদের পশুদের জন্যে মৃত্যুর পরও যাতে তারা পাশাপাশি, কাছাকাছি থাকে তারই যেন ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল ভাতারমারি গাঁয়ের লোকেরা। তাই বোধহয় শ্মশান আর গোভাগাড় থেকে গেছে পাশাপাশি। ছেলেবেলার মতো এখনো বিশু প্রায়ই আসে এখানে। শুধু এখনকার পোঁতা গাছগুলোর দেখাশোনা করতেই যে আসে তা নয়, আগেও আসত। বৈরাগ্যের জন্যেও নয়। এসে ভাবত, নিজে কেন আর সবার মতো হল না, সবার মনের মতো হলেই কি তার জীবনে আসল শান্তি আসত? আপন কল্পনার জগতে বাস করতে চাইলে লোকে কেন তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে? আমি কি শুধু আমার হতে পারি না? আমার জীবন কেমন হবে, কেমন হলে সবার ভাল, তা আমি

নিজে ঠিক করতে পারব না কেন? কেন অন্যেরা তাঁদের নিজেদের ভাবনা আমার ঘাড়ে চাপাতে চান? এই সব নানান কথা ভাবে বিশু। না, এইসব ভাবনাকে শ্মশানবৈরাগ্য বলা যায় না। অবশ্য বৈরাগ্যের কারণ যে বিশুর একেবারেই ছিল না, তাও নয়। তার গলায় গলায় বন্ধু নারানকে সে এখানেই চিরতরে হারিয়ে ছিল। মায়ের দয়ার প্রকোপে। ওই যে শিবুপাল উল্লেখ করেছিল সেদিন, সবাইকে সেবা করে রানীপিসি চাঙ্গা করে তুলেছিলেন। শুধু নারানকে চিরতরে কোলে টেনে নিয়েছিলেন মা শেতলাদেবী। শ্মশান আর গোভাগাড়ের মাঝে তেঁতুলগাছের নিচে, গাঁয়ের সবাই একমত হয়ে রাজি হয়েছিলেন, নারানকে কবর দিতে। এটা এ গাঁয়েরই রীতি। হিন্দুর সন্তান হলেও সে কবরে কেন গেল, সেটা তার ভাগ্যের ফল। সাপের কামড়ে কিংবা ছোঁয়াচে কোনও ব্যাধিতে কারও মৃত্যু হলে, দাহ করা হয় না তাদের। লক্ষ্মীন্দরকে যেমন ভেলায় করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এখানে কাউকে সেরকম ভাসানোর বাসনা থাকলেও ভাসানো যায় না, কারণ খালটা বহুকাল ধরেই আদি থেকে অন্ত অব্দি বইছে না একটানা। যেখানে জল আছে, তাকে খাল বা নদী আখ্যা দিলেও, তা বইছে না। কচুরিপানায় ভর্তি থমকে থাকা জলে পোকামাকড়দেরই শুধু অবাধ বিচরণ।

শ্মশানঘাটায় সেই জলে শবদাহের প্রাকপ্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মীন্দরের মতো সেখানে কাউকে ভেলায় ভাসানো যায় না। কামিনীবুড়ির কাছেও সেই সব পৌরাণিক, অলৌকিক অনেক গপ্পো শুনতে আসত বিশু ছোটবেলায়। শুনত মুগ্ধ হয়ে। কিন্তু বিশ্বাস করত কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

গোভাগাড়ে একটা কাঁচামিঠে আমের গাছ যেখানে খালের ওপর কাত হয়ে বেড়েছে, সেখানে বসে শিবু সর্দারের ছোটছেলে বলাই হাতছিপ দিয়ে রোজ মাছ ধরে। খাটো করে হাঁটু অবধি পড়া ধুতির কোঁচড়ে ভরে নেয় পিঁপড়ের ডিম। ময়দার সঙ্গে পিঁপড়ের ডিম মেখে তৈরি করে টোপ। কোন চার ছাড়াই যাতে ওই জায়গাটায় মাছ আসে তারও একটা বিশেষ কায়দা বলাই জানে। বাঁ হাতে

ছিপের সুতো আর ডান হাতে কঞ্চির ছিপখানা ধরে বলাই কচুরিপানা সরানো জলটুকুর ওপর কয়েকটা ঘাই মারে। তারপর ময়ূরের পাখনার ডাঁটি দিয়ে তৈরি ফাতনা বাঁধা সুতোটা ছুঁড়ে দেয় জলে। চোখের পলকে টোপ গেলে পিলেপেট বলাইয়ের মতো পেটমোটা পুঁটিমাছের ছাঁক। বড় বড় সরম পুঁটি। বঁড়শিতে ল্যাটা, চেঙ্গো কিংবা শোলজাতীয় কোন মাছ উঠলে সে প্রাণ ভরে অশ্রাব্য গালাগাল দিত। তার গালিগালাজের বহর শুনেই লোকে বুঝে নিত, বলাইয়ের ছিপে এবার কি মাছ উঠেছে। টোপসমেত এই মাছগুলো বঁড়শিটাকে এমনভাবে গিলে নিত যে, পেট পর্যন্ত কেটে সেটাকে আবার বের না করে ব্যবহার করা যেত না বলেই বলাইয়ের এত খিস্তিখেউর। বিশু জানত কোথায় গেলে বলাইয়ের সন্ধান পাবে। তাই সে গোভাগাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে রাস্তা থেকে বলাইয়ের খিস্তি শুনে বলাইয়ের নাম ধরে ডাকে।

- বলু, ওরে ও বলু, ইদিকে আয়। তোকে দে' আমার একটা কাজ আছে। কি মাছ ধরলি আজ?

বলাই উত্তর দেয়, এই গোটা দশেক পুঁটি আর দুটো ট্যাংরা।

- নিজে খাবি, না বেচবি?

- এই ক'খান মাছ বেচে বাজার যাওয়ার ধকলই উশুল হবেনি। আমায় দে' কি কাজ হবে বললে নাতো?

- সঙ্গে আয়, বলচি। উলুর কথা।

"ও আমার কাজ নয়, ও মেয়েদের কাজ" জানিয়ে দিয়েও বলাই চেষ্টা করে উলু দিতে ।

- না রে, ওই উলু দেবার কথা আমি বলছি না। উলুঘাসের কথা বলছি, রানীপিসির বাড়িতে, আমায় কাটতে বলেছেন, তাই তোর মদত না পেলে চলে না।

- চল যাই। চেঙ্গো মাছে একবার টোপ খেলে আর অন্য মাছ ধরতি পারা যাবেনি। মাছগুনোর কি হবে? আগে বাড়িতে দিয়ে আসি?

- না, বাড়ি গেলে জানি আর ফিরবি না, উধাও হয়ে যাবি। আমি তোকে হাড়ে হাড়ে চিনি। মাছগুলো রানীপিসিকে দিবি, ভেজে দেবে'খন।

- তুমি যখন বলচ, তা'লে তাই করি। বিশুদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

- কি কথা ?

- তুমি না বলেছিলে, ছেলেদের জড়ো করে খালের কচুরিপানা পোস্কার করবে, তার কি হোল?

- হবে, হবে। শালতি তৈরি হবার আগেই করতে হবে। আজ চল, উলু কাটার কাজে একটু হাত লাগিয়ে দে।

(১৮)

বলাইকে সঙ্গে নিয়ে বিশু রানীপিসির বাড়িতে গিয়ে হাঁড়ি কলসি আর কাতার দড়ির গুছিগুলো দিয়ে বলল, "শিবুপাল বলছিল, দড়ি দিয়ে বিঁড়ে বানালে ভালো হবে না। শুকনো খড়খড়ে হবে। খড়ের বিঁড়ে আলতো নরম। আর হ্যাঁ, রানীপিসি, কাল বিকেল পাঁচটায় সতুকাকুর বাড়িতে মিটিং ডেকেছেন। তোমাকে আর একাদশীকেও যেতে বলেছেন।

রানীপিসি সে কথার সরাসরি কোনো উত্তর দেন না। বলাইকে দেখে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।

- কি রে বলাই, তোর বাবা বাড়ি আছে? না, ডাব বিক্কিরি করতে হাটে গেছে?

- কি জানি। কোথায় যেন যাবে বলছেলো। ক্যানো?

- তোদের বাড়িতে তো একটা খেপ্‌লা জাল ছিল। আছে এখনও? নাকি ইঁদুরে কেটে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে?

- না, না, আছে। ছিঁড়ে গেছল, কিন্তু বাবা তো আবার সেরেচে। কেন, জালের কথা ক্যানো?

- ঠিক করেছি, পুকুরটা কাটানোর আগে মাছগুলো সব ধরিয়ে নেব। ওরে অমল, কোথায় গেলি, দেখ্‌ কারা এসেছে। বিশু, ফুটবলটা কার? এ মা, এ যে দেখছি, একেবারে চুপসে গেছে।

বিশু ততক্ষণে বলাইকে নিয়ে উলু কাটার জোগাড়যন্ত্র করছে। বললে, “ওটা সতুকাকুর ছেলে মণ্টের বল। আমাকে সারিয়ে আনতে বলেছে। এ্যাই বলাই, তোকে উলু কাটতে হবে না, তুই শুধু একটা লাঠি নিয়ে আমার কাছাকাছি দাঁড়া, সজাগ দৃষ্টি রাখিস।”

কিসের ওপর লাঠি হাতে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে তা ঠিক বোঝে না বলাই। কেন, তাই জিজ্ঞেস করে।

- শীতের দিনে উলুঘাসের ভেতরটা বেশ গরম থাকে বলে সাপখোপের উৎপাত। তুই তো শুনেছি, সাপ মারতে ওস্তাদ, তাই তোকে সঙ্গে নিয়েছি।

- দাঁড়াও একটু, বিশুদা, আগে মাছগুনো আনীপিসিকে দিয়ে দি, নইলে পচে ঢোল হয়ে যাবে, পেরায় ভুলেই গেচলাম।

- নে নে, জলদি কর, আলো চলে গেলে আজ আর কাটা যাবে না।

(১৯)

ন’ বছর বয়সে পৈতের সময় বড়মামার তন্ত্রধারক পুরোহিত অমলের কানে মন্ত্র দিয়ে ছিলেন, - মা দিবা নিদ্রা। আর বলেছিলেন, রাত্তিরে কক্ষনো দই খাবি না।

দ্বিতীয় উপদেশটা মানার কোন বাধা ছিল না, কারণ অমলের মা, রানী, (লোকে তাঁকে যে যেমন পারে তাই বলে আত্মীয় পাতিয়ে নেয়, দিদি থেকে দিদিমা, মাসি থেকে পিসি কিংবা জাতগোত্র ধরে। কেউ কেউ ডাকে বামনী বলে। কিছুই বাদ পড়ে না। আর যারা বয়সে বড় তাঁরা কেবল রানী বলে সম্বোধন করেন) দম্বল দিয়ে দই পাতেন রাতের বেলা। উষ্ণ গরম দুধ জমে দই তৈরি হতে হতেই আবার ভোর হয়ে আসে, শুরু হয় নতুন দিন। সেই কারণে রাতে দই না খাওয়ার উপদেশ লঙ্ঘন করার প্রশ্ন কখনোই ওঠেনি।

কলকাতায় বড়মামার বাড়িতে থাকলে এটাও মানা যেত কিনা, তা হলফ করে অমল আজ বলতে পারে না। কারণ বাড়ির কাছেই ছিল নানা ধরণের খাবারের দোকান। পয়সা ফেললে কোনোকিছুরই মন্দা নেই। অমলের কেবলই মনে পড়ত লেজকাটা গরুটার কথা, ঘায়ে বসা মাছিদের উদ্দেশ্যে বলেছিল যেন, নেই, তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে? নিজেকে মাছি বলে মনে না হলেও, এবং রাতে দই খাবার হাজার ইচ্ছে থাকলেও, গাঁয়ের বাড়িতে তা পূরণ হত না, কারণ গরুর ল্যাজটা হল গিয়ে তার মায়ের দেরি করে সন্ধ্যের পর দইপাতা। রাতে তাই দই কই?

আর প্রথম উপদেশটা মানাও দুষ্কর হত, বিশেষ করে শীতকালে। রবিবারের দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর, রোদের স্নিগ্ধ আমেজে লেপমুড়ি দিয়ে শুলেই ঘুমে জড়িয়ে যেত চোখ দুটো।

জানলা থেকে প্রায় হাত তিরিশেক মতো দূরে একটা গোলাকার পুকুর। অমলদের পাঁচিল দেওয়া বাড়ি থেকে পুকুরে যেতে হলে খিড়কি দরজা দিয়ে যেতে হয়।

পুকুরের তিন পাশে হরেক রকমের আমগাছ। তাছাড়া আছে লিচু, কাঁঠাল, জলপাই, জামরুল, গোলাপজাম, আঁশফল, ফলসা, সজনে, নজনে, চালতা, কামরাঙা, তেঁতুল আর নোনাগাছ ভরা বাগানের সঙ্গে ঘন বাঁশবন।

শোওয়ার ঘরে দক্ষিণের জানলার কাছে তক্তপোশে কাৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল অমল। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখল বাঁশবনে বাঁশের পাতাগুলো হাওয়ায় ঘূর্ণির মতো ঘুরতে ঘুরতে ঝরে পড়ছে একে একে।

অকস্মাৎ অমলের চোখে পড়ে, তারের জাল দেওয়া জানলার গরাদের বহির্ভাগে একটা মাকড়সা জাল বুনতে শুরু করেছে। এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় জাল বোনা সহজ কাজ নয় । মাকড়সাটা বারবার হড়কে পড়ে যাচ্ছিল, নিজের দেহটা তার নিজের রক্ষাবন্ধনী সুতোয় বাঁধা থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র সে নয়। শুরু করে দেয় আবার গোড়া থেকে। জাল বোনার কেরামতি

দেখে নয়, শুধু মাকড়সাটার পিছলে পড়ে যাওয়া দেখে অমলের বেশ মজা লাগে, মনোযোগ দিয়ে পরখ করতে চায়, এর পর কি ঘটবে। তাতে তার কাঁচা ঘুমটা চোটে গেলেও জানবার আকুল আগ্রহ তাকে পেয়ে বসে। কি করে এই একটা ছোট্ট মাকড়সার পক্ষে এমন একটা প্রাকৃতিক আশ্চর্য সৃষ্টি করা সম্ভব। তার এই ছোট্ট দেহের অভ্যন্তরের ছ'টা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে নির্গত লালার সুতো বাইরে বেরিয়ে পেঁচিয়ে এক পলতে সুতোর আকার নেয়। সে সুতো এতো সূক্ষ্ম হলেও পলকা নয়, তাছাড়া এতই স্বচ্ছ যে, একটা মাছির পক্ষে তা ঠাহর করা সবসময় সম্ভব হয় না, যদিও তাদের দৃষ্টিশক্তি মানুষের চেয়ে হাজার গুণ বেশি। জালে জড়িয়ে পড়ে। বায়ুদূষণমুক্ত এই জাল শিশিরকণায় সিক্ত না হলে সূর্যালোকেও চোখে পড়ে না।

শেষ করতে কতটা সময় নেবে জানি না। সন্ধ্যে হওয়ার আগেই শেষ হওয়া চাই, আর ঘরের আলো দেখে বাইরে থেকে পিলপিল করে উড়ে আসা পতঙ্গেরা জানালার গারদের ফাঁক দিয়ে ঢুকতে গিয়ে জড়িয়ে পড়বে জালে। মাকড়সাগুলোকে কে শিখিয়েছিল পতঙ্গদের এই ওড়ার পথে ফাঁদ পাততে? অমল ভাবে, মাঝে মাঝে মানুষরাও কেন জন্তুজানোয়ারদের মতো হয় না। মানুষ তো কাজের বেলায় কেবলই মুখ বেজার করে। কিন্তু জন্তুদের মধ্যে কেউ কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, এমন খবর শোনা যায় কি? হয়তো তাদের ভেতরেও মানুষদের মতই কয়েকটি উদাহরণ পেলেও পাওয়া যেতে পারে। নিতান্ত গাছপালাদের মতো হলেও মানুষ বর্তে যেত, জাতিভেদ, বর্ণভেদ থাকলেও নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি করত না। কুঁড়ের বাদশা আর বোকার ডিম বলে গালিগালাজও শুনতে হত না। না কি, কেউ কোনোদিন একটা বোকা গাছ চোখে দেখেছে?

অমল ভাবে, মাকড়সাটা যদি সারা জানালাটা জুড়ে জাল পাতে, তাহলে বড়ই উপকার হয়। কারণ গাঁয়ের এ চত্বরে শীতকালেও তো মশামাছির উপদ্রব একটুও কমে না। সারারাত জুড়ে মশার পোঁ পোঁ আর কামড়ের হাত থেকে মশানিকাশি ফ্লিট জাতীয় রাসায়নিক স্প্রে ব্যবহার না করেই, রেহাই পাবে।

বাঁশবনের ডোবাগুলোয় সারাবছরই জল থাকে। তাই গাঁয়ের এ অঞ্চলে মশার আমদানিও একটু বেশি। সন্ধ্যে নামতে না নামতেই মশারি ভিন্ন ঘরে বসা দায়। ধুনুচির নারকেল ছোবড়ায় আগুন ধরিয়ে, সাঁজালি দিলে, ধোঁয়া আর কড়া ধুনোর আতিশয্যে দম আটকে যাওয়ার জোগাড় হয়, কিন্তু মশার কামড় থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। মশারি ছাড়া। 'বানা রে, বানা, জম্পেস করে বানা, মশারির চেয়েও ঘন করে জাল বানা', মনে মনে বলে অমল মাকড়সার উদ্দেশ্যে।

বোনার সময় অমলের মাকড়সা নিজেও জানে না পরে কি খাবার আজ তার বরাতে জুটবে। ভাল করে লক্ষ্য করতে অমল বুঝতে পারলো, মাদী মাকড়সাটার পেট হয়েছে। মাদী মদ্দ চেনার কৌশল তাকে বিশুদা হাতে ধরে শিখিয়েছিল। বলেছিল, এসব কুকুরদের মতো নয় যে, লেজ তুলে দেখলেই বুঝতে পারবি, কোনটা মাদী আর কোনটা মদ্দা। মাকড়সাদের পাশাপাশি দেখলেই বোঝা যায়, আকার দেখে, কে মাদী আর কে মদ্দা। মদ্দাগুলো মাদীদের চে' চিমড়েপানা। বিশুদা আরও বলেছিল, অমল, মাকড়সাদের জালবোনার উদেশ্য এক হলেও, পদ্ধতি এক নয়। যস্মিন দেশে যদাচারের মতো। ঘরবাড়ির মাকড়সা আর বনের মাকড়সার এক রকম নয়। ধানক্ষেতের মাকড়সার জালও আলাদা। তাই তাদের কাজে কোন একঘেঁয়েমি নেই। ভাবতে ভাবতে অমল কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। চোখ বুজিয়ে ভাবতে শুরু করে, কেন লোকে বারবার ফেলে আসা অতীতকে আঁকড়ে ধরতে চায়। যে বৃষ্টি গতকাল হয়ে গেছে, চাইলেও সে বৃষ্টিতে তো আজকে গা ভেজানো যায় না, তবু কেন? শহরে থাকতে সে যা কিছু অবহেলা পেয়েছে, গাঁয়ের নির্ভেজাল আন্তরিকতা পেয়ে সে নিজেকে মনে মনে এখন কেউ একটা ভাবতে শুরু করেছে। আর কয়েকদিন বাদে অমল গাঁয়ের স্কুলে ভর্তি হবে। বিশু নিজে স্কুলে যেতে চায়নি, তবু রানীপিসির মুখে সেকথা শুনে, অমলকে ভরসা দিয়ে বলেছিল, "তুই লেখাপড়া শিখে ফাটিয়ে দিবি, আর তোর পড়ার সময় আমি তোর কাছে বসে শুনে শুনে অনেক কিছুই শিখে নেব, তুই হবি আমার গুরু, দক্ষিণে ফক্ষিণে কিন্তু ওসব তোকে দিতে পারব না।" অমল কান চুলকে জানিয়েছিল, "ফ্যাট্, কি

যে বল বিশুদা, তুমি না কত বড়, কত জান। আমি তোমার মাস্টারমশাই হব? সবটাতে তোমার এমন ফুটকাটা স্বভাব কেন বল তো?”

পুকুরের পাড়ে পাঁচটা নারকেল গাছ। পাতা ছাড়াবার সময় হয়ে এসে গেছে। নবীনচাষাকে সঙ্গে করে গতকাল ছবি মিঞা এসেছিল অমলের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। ইদানিং একটু বয়স হলেও আগের মতোই নবীনচাষা এখনও আসে নারকোল গাছের পাতা ছাড়াতে। এ কাজটা ও অন্যকে শেখাবার অনেক চেষ্টাও সে করেছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। এমন কি নিজের ছেলেকেও শেখাতে পারেনি। ওর ছেলে তো এখন লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছে। নিজের বাপের পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। গাঁ ছেড়ে তাই শহরের জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছে, ক্যাবলা। ওর স্বপ্ন, কলেজে পড়ার সাথে সাথে নামকরা কোন দলে ফুটবল খেলবে। কেউই আর এই অজপাড়াগাঁয়ে জেঁকে বসতে চায় না। চাষবাসের কাজে যা উপায় হয়, তাতে দু’বেলা একজনের পেট চালানোও দুরূহ। তাই সুযোগ সন্ধান পেলেই লোকে এখান থেকে হাওয়া হয়ে যায়। শহরে গিয়ে লেগে যায় কোনও না কোনও কারখানায় কুলির কাজে। রাতারাতি যে তাদের আখের খুলে যায়, তা বলা যায় না। আর নিরুপায় হয়ে যারা গাঁয়ে থেকে যেতে বাধ্য, তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে কোনরকমে দিন গুজরান করতে।

অথচ এই গাঁ একদিন কি ফলবন্তিই না ছিল। বিশেষ করে ইংরেজরা এখানে নীলের চাষে বেশ সফলতা লাভ করেছিল। নীলবিদ্রোহের ফলে সে চাষ বন্ধ করে দেওয়ার পর এ গাঁয়ে কেউ আর তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। নীলকর সাহেবদের পরিত্যক্ত নীল চাষের হৌসগুলো আর পোড়ো কুঠি এখনও সাক্ষী দিচ্ছে সেই সব কালো দিনগুলোর। নীলচাষের জমিতে গাঁয়ের চাষিরা আবার আগের মতো ধান, শণ, পাট ও অন্যান্য ফসল চাষে মন দিয়েছিল। ধান ওঠার পর ক্ষেতে ক্ষেতে ফলে উঠত তেউড়ে কড়াই, ফুটি, শশা, সর্ষে আরও কত কি। এ গাঁয়ের বিশেষ সুখ্যাতি অবশ্য ছড়িয়ে পড়ে উন্নতমানের পানের জন্যে। উঁচু জমিতে ঘর ঘর পানের বরজ। শহরে থাকতে অমল নতুন কিছু একটা দেখলে কেবলই প্রশ্ন করত এটা কি, ওটা কি, এগুলো কোথা থেকে আসে? বড়রা

তাকে পাত্তা দিত না। ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলত, ওসব আজেবাজে প্রশ্ন না করে তোর স্কুলের পড়ায় মন দে, সেখানে তো অষ্টরম্ভা। মায়ের সঙ্গে সোনার দোকানে গেলে, অমল মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকত স্যাকরামশাইএর সোনা, রুপোর গয়না নিক্তিতে ওজন করার সাজসরঞ্জামগুলোর দিকে। কয়েকটা অধুনা অচল ইংরেজি শাসন আমলের রূপোর মুদ্রা আর লাল রঙের কালো বুটি দেওয়া কুঁচের দানা। এই দানাগুলো কোথায় পাওয়া যায়, প্রায়ই অমল জিজ্ঞেস করত। স্যাকরারাও কোনও যথার্থ উত্তর দিতে পারত না।

মাকড়সার জালবোনা শেষ হয়ে গেছে। অমল মাকড়সাটার কথা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গিয়েছিল বলে খেয়ালই করেনি, জালবোনার পর মাকড়সাটা কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে। মাকড়সা প্রসঙ্গে বিশুদার আর একটা মজার কথা মনে পড়ে তার। বিশুদা বলেছিল, "আমরা সবাই কেউ না কেউ মাকড়সাদের মতো, নানারকম জালের কসরৎ দেখিয়ে পোকামাকড় ধরার চেষ্টা করি। এ গাঁয়ের জমিদারবাবুদের মতো যাঁরা আছেন তাঁদের লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবি, কত বড় মাকড়সা তাঁরা, আস্ত এক একটা মাদী মাকড়সা, আমাদের মতো গাঁয়ের সব ছোটোখাটো পোকামাকড়দের ধরে জালে আটকে সর্বদাই নাকানিচোবানি খাওয়াবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পেটের দায়ে নয়, স্বভাবে। মানুষের আদিম রিপু।"

একটা প্রজাপতি জালে এসে পড়ল। পড়েই ভাবল, এ কি হল হুট করে আমার? ওড়াটা বন্ধ হল কেন? নড়তে গিয়ে দেখল, পাগুলো আঠার মতো কিসে যেন আটকে আটকে যাচ্ছে। অমল দেখল, ওপরের বাঁদিকের কোণায় বসে থাকা মাকড়সাটা এবার ক্ষিপ্রগতিতে নেমে এসে জড়াতে শুরু করে দিলে প্রজাপতিটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে। গুটির মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া প্রজাপতিটা তখনও তড়বড় করে নড়ছে আর ভাবছে, এই তো সামান্য একটা সূক্ষ্ম জাল, কোনরকমে ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারলেই অবাধ ওড়ার স্বাধীনতা। কিন্তু সেই জালটুকু ছেঁড়া অত সহজ নয়। অমলও একদিন মামার বাড়িতে থাকাকালীন অবস্থায় ভেবেছিল, মামার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু নিজে সে পারেনি।

ব্যতিক্রম হলেন রানীপিসি আর এ গাঁয়ের নতুন ডাক্তার, তন্ময়বাবু। শহর জীবনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ডাক্তারবাবুর এই গাঁয়ে এসে আশ্রয় নেওয়াটাকে লোকে প্রথম প্রথম কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখলেও পরে নিজেদের অজান্তেই মেনে নিয়েছে। আর রানীপিসি এসেছেন বাধ্য হয়ে।

এঁরা দুজনেই কিন্তু এক জায়গার জাল ছিঁড়ে ফেলে অন্যত্র ছিটকে যেতে পেরেছেন।

বিশুর সান্নিধ্যে এসে শহরের একঘেঁয়ে জীবন থেকে যেন মুক্তি পেল অমল। গাঁয়ে এসে অমলের সব চেয়ে আগে যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে তার সমবয়েসি ছেলে বা মেয়েরা হুদো নেংটো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেয়েদের কোমরে কালো রঙের ঘুনসি। তাতে ঝোলানো থাকে হয় একটা তামার ফুটো পয়সা, নয় মাছধরা জালের লোহার কাঠি। মাকে জিজ্ঞেস করে উত্তরও পেয়েছিল। কিন্তু শুনে আগেকার সেই হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙা প্রশ্নের উত্তরের মতোই ধাঁধাঁয় থেকে যায় অমল। “মা, আমি কি করে হলাম?” “মেয়েদের মাসে মাসে দেহে জোয়ার আসে, তাই কোমরে পুরনো ন্যাকড়া বেঁধে মেয়েদের ঘুরতে হয়। ঘুনসি পরার অভ্যেস না থাকলে বেশ অস্বস্তি হয় তাই ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের ঘুনসি পরিয়ে দেওয়ার রেয়াজ এখানে”, এবারের প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দিয়েছিলেন অমলের মা।

যে সব প্রশ্নের উত্তর অমল অন্যদের কাছে পায়নি, পেয়ে যেত বিশুদার কাছে। গাঁয়ের সব ছেলেদের মধ্যে বিশুও আলাদা করে তাকে বেছে নিয়েছিল, প্রায়ই সঙ্গে করে নিয়ে যেত জঙ্গলে। চিনিয়ে দিত গাছগাছালি। কোন লতাপাতার কি গুণ শেখাবার চেষ্টা করতো যত্ন করে। খালি পায়ে আগানেবাগানে গিয়ে অমল প্রাণভরে উপলব্ধি করতে শিখল, পায়ের নিচে নরম মাটির স্বাদ। শহরে ঘাসে ভরা মাঠ বলতে সে জেনেছিল শুধু গড়ের মাঠ। শহরে খালি পায়ে হাঁটা মানেই লোকের কুনজরে পড়া, কেউ ভাবে, জুতো কেনার পয়সা নেই কিংবা আচারব্যবহারে গেঁয়ো। গাঁয়ে খালিপায়ে হাঁটলে কেউ তা নিয়ে অত মাথা ঘামায় না। বিশেষকরে বর্ষাকালে জুতো তো

একেবারেই বেমানান। শহরের গাড়িঘোড়া আর কলকারখানার শব্দে থেকে থেকে অমলের প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। তার মামার বাড়ি ছিল এক জংশন স্টেশনের রেললাইনের কাছে। রাতভোর তাকে কেবল শুনতে হতো মালগাড়ির আওয়াজ। সেসব আওয়াজ অমল গাঁয়ে এসে আর শুনতে পায় না। এখানে রেলগাড়ির আওয়াজ যে একেবারেই নেই, তা নয়, কিন্তু সেটা যেন ঘড়ির কাজ করে। শুধু দিনের বেলায়। আগের স্টেশন থেকে কু দিয়ে গাড়ি ছাড়লেই লোকে বুঝতে পারে ক'টা বাজল, আর ক' মিনিট বাদে গাড়িটা ভাতারমারি স্টেশনে এসে পৌঁছবে।

কাঁটার ভয়ে অতি সন্তর্পণে দু'হাতে পাতা সরিয়ে আনারস বনের ভেতর যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে অমলের পায়ে, হাঁটুতে অজস্র কাঁটা বিঁধে যায়। কোনরকম ভৎর্সনা না করে ধৈর্য্য ধরে বিশুই তখন ওকে শিখিয়েছিল কিভাবে সহজে কাঁটা এড়ানো যায়। আর প্রকৃতি কেন যে আনারস পাতায় কাঁটার সৃষ্টি করেছে, তারও একটা উপযুক্ত ব্যাখ্যা করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, "দেখ অমল, সব কিছুরই একটা মানে আছে। প্রকৃতি কোনও জিনিসই ফালতু তৈরি করেনি। এই যে লঙ্কায় ঝাল আছে, তারও একটা উদ্দেশ্য আছে। দাঁড়া, প্রথমে দেখাই, আনারসের কাঁটা কিভাবে এড়ানো যায়। ভাল করে লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে ঝাড়ে ঢুকছি।" পরনের ধূতিটা হাঁটুর ওপর অবধি মালকোঁচা করে বাঁধা, দ্রুত বেগে যাওয়া সত্ত্বেও একটা কাঁটাও বিশুর পায়ে ফুটল না। প্রথমে অমল ভেবেছিল, এ নিশ্চয়ই বিশুদার অন্যান্য কৌশলের মতো আর একটা কোনও বিশেষ কৌশল। কিংবা এও হতে পারে যে, তার পায়ে কোনও সাড় নেই। কাঁটা ফুটুক বা আগুন লাগুক, কিছুতেই বিশুর যেন কোনও রকম যন্ত্রণাবোধ নেই। প্রথম প্রথম অমল ভেবেছিল, হয়ত এ গাঁয়ের লোকেরা রোদে পুড়ে, জলে ভিজে এমনি করেই শক্তপোক্ত হয়ে যায়। শহুরে লোকেদের ধরণধারণ সম্পূর্ণ আলাদা। কথায় কথায় লেগে আছে সর্দিকাশি। তা তুমি যতই গলায় মাফলার জড়াও, গায়ে যতই র‍্যাপার চড়াও, কিছুতেই কিছু হয় না।

- বিশুদা, এ আমার কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না। তুমি হুড়মুড় করে আনারসের ঝাড়ে ঢুকলে অথচ তোমার গায়ে একটা কাঁটাও ফুটল না, এ কেমন করে হয়? জাদুটাদু জান নাকি? কই লঙ্কায় ঝাল কেন তা তো বললে না।

- ঝাল শুধু আমাদের লাগে। স্তন্যপায়ী জন্তুদের লাগে। পাখিদের লাগে না। তাই টিয়াপাখিরা এসে লঙ্কাঝাড় উজাড় করে দেয়। এটা প্রকৃতির খেয়াল। পাখিরা লঙ্কার দানা হজম করে না, তাই সেই সব লঙ্কার দানা অন্য কোথাও অনেক দূরে গিয়ে আবার চারা হয়ে গজায়। স্তন্যপায়ীরা লঙ্কার বংশবৃদ্ধিতে কোন কাজে আসে না, তারা দানাগুলো হজম করে ফেলে বলে প্রকৃতি এমন ঝাল করে দিয়েছে যে তারা তাই লঙ্কা এড়িয়ে যায়। বুঝলি হাঁদা ?

একদিন কোথা থেকে একটা মাকাল ফল এনে বিশু অমলকে জিজ্ঞেস করেছিল, "জানিস, এটা কি?" বাইরে থেকে বেদানার মতো দেখতে বলে অমল বলেছিল, "বেদানা, আবার কি!" অমলের উত্তর শুনে বিশু তো হেসে কুটোপুটি খাবার জোগাড়। যে জানা ও শেখার ইচ্ছেগুলো অমল শহরে থাকাকালীন পূরণ করতে পারেনি, তা এখন বিশুর কাছ থেকে জানা ও শিখে নেবার ইচ্ছেটা অনেক প্রবল বলেই হয়ত সে বিশুর এই হাসিকে কোন তাচ্ছিল্যের হাসি বলে মনে করে না।

বিশু আরও বলেছিল, "বাইরে থেকে বেদানার মতো দেখতে বলে উত্তর দিয়ে দিলি। একবার ছাড়িয়ে দেখ, ভেতরটা কেমন, তালেই টের পাবি। একেবারে বেড়ালের গুয়ের মতো দেখতে, আর কি দুর্গন্ধ। এই জন্যেই এর নাম মাকাল। বাইরে অনেক চাকচিক্য, অন্দরে ভুষিমাল।"

সোনার গয়নার দোকানে যে কুঁচ ফলের দানা দেখে অমল মুগ্ধ হত, জিজ্ঞেস করেও কোথায় পাওয়া যায়, তার উত্তর পায়নি, সেই কুঁচ ফলের একমুঠো দানা এনে একদিন বিশু অমলকে অবাক করে দিয়ে বলেছিল, এগুলোও মাকালের মতই দেখতে সুন্দর, কিন্তু মারাত্মক বিষ[১], ভুলেটুলে আবার চিবিয়ে খেয়ে ফেলিস না যেন।

- শুধু পাতা দেখে কিন্তু অনেক গাছ ঠিকমত চেনার উপায় নেই। যেমন ধর, তেঁতুল, লজ্জাবতী লতা আর কুঁচফলের গাছ, এদের পাতাগুলো২ এক রকম দেখতে। তবে কি জানিস, এরা রাতের বেলায় আমাদের মতো, আমরা যেমন চোখ বুজিয়ে ঘুমোই, তেমনি ঘুমোয়। ওদের চোখ নেই বলে ওরা পাতাগুলো জুড়ে দেয়। দিনের বেলা আবার খুলে যায় পাতাগুলো আগের মতো।

শহরের লোকেরা বাজারে গিয়ে সবই কিনতে পায়। শাক, সব্জি, ফলমূল। কিন্তু গাঁয়ের লোকেদের মতো প্রকৃতির সঙ্গে তাদের কোন প্রাণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। গাঁয়ের লোকেরা দিনের পর দিন রোদে পুড়ে, জলে ভিজে যে ফসল ফলায়, যে ফসল বাড়তে দেখে পুলকিত হয়, যে ফসল বাজারে বিক্রি করে অন্যদের ভাগ দিতে আনন্দ পায়, সে রকম আনন্দ শহরের লোকেরা পায় বলে মনে হয় না অমলের। তাদের পয়সা থাকলেও, বাজারে গিয়ে কেবলই তারা মুখ ব্যাজার করে, ফসল টাটকা নয় বলে, সস্তা নয় বলে।

(২০)

তখনও বেশ কুয়াশায় ভরে আছে চারিদিক। অন্ধকার মুড়ি দেওয়া আকাশটা যেন ঠিকমত ফরসা হওয়ার ভরসা পাচ্ছে না। এমনই একটি দিনে ছবি মিঞা হাঁক দেয় নবীনচাষার বাড়িতে এসে।

- নোবনে, ওরে ও নোবনে, এ্যাকবারটি বাইরে আ' দিকি। ওট, তোর সনে খুব এ্যাকটা জরুরি কতা আচে। কি যে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্চিস এ্যাকোনো!

হুড়মুড় করে নবীন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দাওয়ায় একটা কাঠের পিঁড়ি পেতে ছবিকে বসতে দেয়। তারপর দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়ে, ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে শুধোয়, "কিরে ছবি, এই সাতসকালে? পথভুলে ইদিকে কি করতি?"

- পথভুলে নয় গো, পথভুলে নয়। এ মাসে না বিবিমার বড় সিন্নি? তাই যাচ্চি কৈবেত্তোপাড়ার দিকি। আনীবামনিদির সনে পরামর্শ করতি হবে। পথে তোর বাড়ি। তাই ভাবলুম, একবার দেকা করে যাই। তা এ্যাকোন কেমন আচিস বল। বুকির ব্যতাটা এ্যাকোনো আচে, না গেচে?

- কতাটা একেবারেই মনে ছেলোনি। ফের মনে কইরে দিলি তো?

পাঁজরের কাছে হাত ঠেকিয়ে পরখ করে নবীনচাষা। তারপর বলে, "আগির চাইতি ঢের ভাল। বল, কি খাবি? কাল আত্তিরে এলোকেশী গরম গরম মুড়ি ভেজে দেচেলো, মচমচে মুড়ি। দেব নাকি সানকিতে ঢেলে?"

- খাব কি রে ? আমার না এ্যাকোন ওজা। দিনির বেলা নিরুম্বু উপোষ।

মনে করিয়ে দেয় ছবি মিঞা।

- ক্ষেমা করে দে, মনে ছেলোনি। আমাদের বাপু তোদের মতন ওসব ওজা-ফোজার বালাই নাই। উপোষটুপোষ এয়োতি আর বেধবামাগিদের কাজ।

- মাগির কতায় মনে পইড়ে দিলি। ভালো নাগে তোর? - জিজ্ঞেস করে ছবি মিঞা ।

ছবির প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে পাল্টা জিজ্ঞেস করে নবীনচাষা, "কি ভালো নাগার কতা কইতিছিস তুই, খোলসা কোরে বল।"

- একাদশী।

ছোট্ট করে উত্তর দেয় ছবি।

- আরে ধ্যুর, ক্ষেপেচিস, আমি না মদ্দা, আমি মরতে একাদশী করতি যাব ক্যানো র‍্যা?

- তুই মাদী হলে কি আর এ কতা তুলতুম।

- তার মানে?

- আমি কি ওই একাদশীর পোসঙ্গো তুলতি এয়েচি। কামিনীবুড়ির নাতনি রে বোকা, সেই একাদশীর কতা কইতিছি। সোয়ামীর ঘরও করতি পারলো নি। একা একাই যৈবোনডা একবেরে বয়ে গেল।

- তো মোর বাপের কি? ক্যাতো যৈবোন আসে আবার ক্যাতো ফুইরে যায়।

- তা ঠিক কয়েচিস, কিন্তুক সময় থাকতি ফসল তুলতি না পারলি, সে যৈবোন ক্যামনে এল, ক্যামনে গেল, ঠাওরই হয় না।

- ওসব আমার জেনে নাভ? এই সাতসকালে কি ঝে গপ্পোতাপ্পি মারতে শুরু করে দিলি!

- কদ্দিন ধরে অউলার মা বলতেছেল, এ তুমি কিসির পানা ঠাকুরপোর সাঙাৎ বল দিকি, ওর একখান হিল্লে করার চ্যাষ্টা করার গা করলে নি। কদ্দিন আর একা একা কাটাবে। একটা ঘটকেলি করলি কি ক্ষেতি হতো, বলতি পারো? ব্যস, মাতায় এসে গেল একাদশীর কতা।

- তা আমায় কি করতি বলিস?

- ত্যামোন কিচুই না। তোর সায় পেলিই হল, কতাটা একবার পেড়ে দেকতি পারি। হাঘরের মতো কতজনায় ছুঁকছুঁক করতেছে, বুইলি না। আনীবামনিদি মারফৎ সম্বন্ধী করতে পারলি, কামিনীবুড়িও না করতি পারবেনি। একাদশীকে তুই নিকে কর, অন্য আর কাউকে তা'লে মতির পারা বেঘোরে মরতি হবেনি।

অনেকক্ষণ নবীনচাষা কিছু বলে না। তামাক সেজে ভুড়ুক ভুড়ুক করে হুঁকোয় কয়েকবার টান দিয়ে বলে, "তুই বলতিছিস, নিকি করতি? তা'লে আর কেউ বেঘোরে মতির পানা মরবেনি। কিন্তুক নোকে দুঃচ্ছাই করতি থাকবে। একাদশী আমার পোলার বয়সী। এক্‌বেরে বেমানান।

- নিকি নয়, নিকে। নিকি তো উকুনের ডিম, বুদ্ধু কোথাকার! পুরুষ আর পেরকিতির মিলনে, বয়সের কোন বাধা নেই রে গাধা। ভগবান নিজে এসে কি এসবের বিধেন দেছেন? তোরা নিজেরাই তো নিয়ম বাইনে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেচিস।

- তা যা বলেচিস। এ ভগবানের হাত নয়। কিন্তুক আজ ঝে আমার চোখে চালসে ধরেচে, দাঁতও সব নড়বড় করতেচে। আজ আচি, কাল নেই অবস্তা। ক্যানো যে ফালতু ওসবের নোভ দেকাচ্চিস আমায়, কিচুই বুইতে পারিনা। আর আমার ঘরদোর জমিজমার দশা কি হবে?

নবীনচাষাকে সান্ত্বনা দেয় ছবি মিঞা, "নোভ দেকাতি যাবো ক্যানো রে নোবনে ভাই? ঝ্যাতোই চোকে ছানি পড়ুক, ঝ্যাতোই তোর দন্ত নড়বড়ে হোক, তোর হাতে একখান সড়া ধইরে দিলি, কি আর তোকে চেনা যায়? তরতর করে তুই নারকেল গাছ, তালগাছ বেয়ে বেড়াস। কই ত্যাখোন দেখলি কি কেউ বুইতে পারে, তোর দন্ত নড়ে, মাতা ঘোরে, হাতে পায়ে কম্পন দেয়? আর একাদশীর মোতোন কাউকি কোলের কাছে পেলিই দেখবি... ঘরদোর, জমিজমা ত্যাখোন দেকবি মাতায় উটে গেচে। ওসব বেচে দে নোবনে। সব বেচে দে কামিনীবুড়ির বাড়িতে এক্কেবেরে ঘরজামাই হয়ে যা।"

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে ছবি একটু থামে। নবীনচাষা উৎসুক চোখে তাকিয়ে যেন আরও কিছু শোনার জন্যে তাগাদা দেয়।

- কি রে, বল, থামলি কেন ?

- জোমদেরবাবুর বরবাদ দেওয়া, এঁটো, সকড়ি, উচ্ছিষ্ট ঘোড়াটার শোকে তোর এই আধমরা জেবনডা দেখবি আবার নগবগিয়ে ডগমগ হয়ে উঠতেচে, সবই দেকবি আবার আনকোরা মনে হবে তোর। দাবায় বসে ত্যাখোন ঝিমুবার কিংবা তামুক খাবারও টাইম পাবিনি।

নবীনচাষা বেশ মন দিয়ে ছবির কথা শোনে। তারপর একসময় অস্ফুটস্বরে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে।

- জোমদেরবাবুর কতা উঠতি একটা কতা মনে পড়তেছে, তোকেও তো বেশ ফাঁদে ফেলতি চ্যায়ছেলো। খড়বাগানে মতির লাশ। তোর বউ সেখানে পাতা কুড়োয়। ব্যস, ফট করে তোকে

খুনের মামলায় জইড়ে দেবার চ্যাস্টার কিছু বাকি আখেনি। বলেছেলেন, তুই নাকি কারো সঙ্গি যোগসাজশ না করে একাই মতির গলায় হেঁসোর পোঁচ মেরে দিছিস।

- সে আর মনে নেই কি বলিস? সেদিন খ্যাল হয়েছেলো, জোমদেরবাবুর মাতার মদ্দি একখ্যান কড়া যন্তোর আচে, একখান সোজাপেরেক ঢুইকে দিলি চড়চড় করি বাঁকা ইস্কুরুপ হয়ে বেইরে আসে। স্যায়না জোমদেরবাবুর ফন্দি কিন্তুক ভেস্তে গেছেলো। এ গাঁয়ের নোকজন সব্বাই তো আর একশেঁড়ে নয়, হলি কিন্তুক ব্যাপারখান এক্‌সা হতি পারত। তার উবরে আমি কি ত্যাখোন ডেঙ্গুজ্বরে আর জয়বাংলায় কাহিল ছেলামনি? নোকেও তো একাট্টা হয়ে দিব্যি দে, ওই এক কতাই বলেছেলো।

জমিদারবাবু কেন যে হঠাৎ ছবিকে মতির খুনের মামলায় জড়িয়ে দিয়ে কব্জা করতে চেয়েছিলেন, তা আজও ছবির মাথায় ঢোকেনি। দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে, তিন পাড়ার মূর্তিগুলো গড়া সবে সম্পন্ন হয়েছে, জমিদারবাবু নিজে বিবিমাতলায় গিয়ে ছবির কাছে যে প্রস্তাবটা রেখেছিলেন, সেই অনুযায়ী ছবি যদি অন্য সব পাড়ার দুর্গামূর্তিগুলো গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিত, তাহলে কি ফল হত, তা ভাবতে গেলে আজও ছবির গায়ে কাঁটা দেয়। মূর্তি ভাঙ্গার দায়ে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেললে, হিন্দুরা তাকে বিবিমার পূজারি বলেও ছেড়ে কথা কইত না। ছবি, ছবির বউ আর তাদের নাবালিকা মেয়ে অউলাকে পিটিয়ে তুলোধোনা করে ছাড়ত। ছবিরা এই ভাতারমারি গাঁয়ে একমাত্র মুসলমান বাসিন্দা। বিবিমার পূজারি হলেও সামাজিক হিসেবে দেখতে গেলে এ গাঁয়ে তাদের স্থান সবার নিচে। জমিদারবাবু তখন নির্ঘাত এমন ভাব দেখাতেন যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না। তিনি নিশ্চয়ই এই সুযোগে পাশের মুসলমান অধ্যুষিত গাঁয়ে লোক দিয়ে খবরও পাঠাতেন, তারা যেন দলবল নিয়ে এ গাঁয়ে এসে ছবিদের বাঁচায়। জমিদারবাবুর সেই ফন্দি সেদিন ধোপে টেঁকেনি। কারণ সেদিন তিনি অনেক প্রলোভন ও ভয় দেখিয়েও ছবিকে দিয়ে সে কাজের জন্যে রাজি করাতে পারেননি।

বিবিমার পূজার কারণে দায়ে পড়ে ছবিকে জমিদারবাবুর নির্দেশ মেনে চলতে হত বলে, তার মনে ভয় ছিল। জমিদারবাবু সুযোগ পেলে হয়ত সবটাতেই বাধা দিতে পেছপা হবেন না। উঠতে বসতে ছবিকে নাজেহাল করে ছাড়বেন। ছবি একা একা বিবিমাতলায় বসে আকাশপাতাল ভাবে, কারুর সঙ্গে কথা বলে না, খাওয়া দাওয়া প্রায় লাটে ওঠে যাবার জোগাড় হয় তার। এদিকে ঝড়ে ঘরের চালটাও ভেঙে গেছে, সেটা মেরামত করানোরও সঙ্গতি নেই। ঠিক এমনই বিপদের দিনে বিধবা রানীবামনী তাঁর তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে গাঁয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসায় ছবি যেন হাতে স্বর্গ পেল। জমিদারবাবুর পূর্বপুরুষরা স্বপ্নে পেয়ে পুকুর থেকে পাঁচটা নুড়ি তুলে যে জায়গাটায় বিবিমাতলার মন্দির স্থাপন করেছিলেন, সেই জমিটুকুর মালিক ছিলেন আসলে রানীবামনীর প্রপিতামহ। বিবিমার যে কোনো ব্যাপারে রানীবামনীরাও তাই ছিলেন বেশ একটা বড়সড় অংশীদার।

মতির মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে জমিদারবাবুর কেন এত মাথাব্যথা, তারও একটা কারণ ছিল। গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মজাখাল সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে সব কুলিমজুর এ গাঁয়ে এসেছিল ঝুড়ি, কোদাল, গাঁইতি নিয়ে, তাদের ভেতর দুজনকে বেছে নিয়ে জমিদারবাবু নিজের বাড়ির চৌহদ্দির পাতকুয়াটা আরও গভীর করে কাটাবার জন্যে বহাল করেছিলেন। প্রথমজন কুয়োর ভেতর গাঁটওয়ালা বাঁশ বেয়ে কিছুদূর নামতেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল। কুয়োয় জল ছিল না। অন্যজন বাইরে থেকে পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে অনেক ডাকাডাকি করল। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে সে নিজে নেমে ব্যাপারটা কি সঠিক জানার চেষ্টা করতে গিয়ে একই বিপদে পড়ল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মজুরদের কোন ট্যাঁফো নেই দেখে, জমিদারবাবু নিজে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন কুয়ো কাটার দুটো মজুরই গায়েব হয়ে গেছে। কিভাবে এই পরিস্থিতির সামাল দেওয়া যায় কিছু ভেবে না পেয়ে তড়িঘড়ি খবর পাঠালেন মহকুমা শহরের দমকলবাহিনিতে। পাঁচ ঘণ্টা বাদে দমকলের লোক এসে দড়ি, আঁকশি দিয়ে প্রাণহীন দুই শ্রমিকের দেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়ে দিল। কিভাবে কোথায়

তাদের আপনজন যে উধাও হয়ে গেলো পরিচয়হীন এই দুই শ্রমিকের পরিবারের কেউ জানতেও পারল না। পুলিশকে ঘুষঘাস খাইয়ে জমিদারবাবু সে যাত্রা রেহাই পেলেন। কিন্তু এবার ফ্যাসাদ হোল মতির লাশটাকে নিয়ে। তাঁদেরই বাগানে একটা আমগাছের তলায় পড়েছিল সেই লাশ।

মতি থাকত আসলে অন্য গ্রামে। একাদশীর সঙ্গে বিয়ে হলেও, বরপণ আর একাদশীর রূপের জন্যই সে একাদশীর সঙ্গে ঘর করতে রাজি হয়নি। বিয়ের পর মতি সেই যে একাদশীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল আর নিতে আসেনি। সেই থেকে একাদশী আর তার ঠাকুরমা, এই দুটি প্রাণী, বড় বাগানঘেরা পোতার ওপর দু'চালা মেটে ঘরে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করত। আগে যেমন প্রতিমাসে বারকয়েক ছেলে বিয়োনোর সময় প্রসূতিদের সাহায্য করার ডাক আসত, এখন সে হিড়িকেও ভাটার টান পড়েছে।

ঘন ঘন বংশবৃদ্ধিতে গাঁয়ের লোকেদেরও আর আগের মতো তেমন যেন উৎসাহ নেই। আর যদিও কোথাও কোথাও কোন গাফিলতিতে সেই সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন সবাই এখন চেষ্টা করে তা রোধ করার। আগে দাইগিরিতে কামিনীবুড়ির যে রমরমা ছিল, যার জন্যে ভাতারমারি গাঁয়ের সবাই তার দ্বারস্থ হত, এমন কি স্বয়ং জমিদারবাবুও। এখনও লোকে তার কাছে আসে, তবে অন্য উদ্দেশ্যে। আধুনিক ডাক্তারদের মতো ছুরিকাঁচির ব্যবহার জানত না কামিনীবুড়ি। সে নাড়ি কাটত বাঁশের চোঁচ দিয়ে। ক্ষুরের চেয়েও ধারালো, অথচ বীজাণুমুক্ত। জমিদার সত্যবানবাবুর তৃতীয়পক্ষের সন্তান বিয়োনোর সময় প্রত্যেকবারই ডাক পড়তো কামিনীবুড়ির। জমিদারবাবুর স্ত্রী যাতে নির্বিঘ্নে সন্তান বিয়োতে পারে, তারজন্যে মোট এগারবার কামিনীবুড়ি আর এলোকেশীর মা সমস্ত তোড়জোড় করেছিল। এই একটি ব্যাপারে ভাতারমারি গাঁয়ের সব পরিবারই কামিনীবুড়ির কাছে ঋণী?

তবে এখন আর সে দিনকাল নেই। সবকিছুরই ধরণধারণ পাল্টাতে শুরু করেছে। অন্য কাজে গাঁয়ের লোক এখনও হামেশাই আসে কামিনীবুড়ির কাছে। কামিনীবুড়ির অলৌকিক শক্তির কথা কারুর অজানা ছিল না। ঝাড়ফুঁক, তুকতাকের কত কি না জানতো বুড়ি। টোটকাটুটকি তো আছেই। কার ঘাড়ে খটকা লাগল, কার পা মচকে গেল, না চাইতেই কে পোয়াতি হল, তাকে পেটপোড়া দিয়ে খোল্‌সা করে দেওয়া, এইরকম সব ব্যাপারেই বুড়ির দারুণ হাতযশ। ছোটখাট অসুখে লোকে ডাক্তার বদ্যির কাছে যেতেও নারাজ। নেহাৎ দায়ে না পড়লে, চশমখোর কিশোরী ডাক্তারের কাছে তো নয়ই।

এখন বয়সের ভারে কামিনীবুড়ি ঠিকমতো চলতে হাঁটতে পারে না, চোখে ছানি পড়ে প্রায় অন্ধ, কানেও ভাল শোনে না। দিনের বেলা আবছা একটু আধটু ঠাহর পেলেও, রাতে সব ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। এ গাঁয়ে যখন প্রথম রেল এল তখন কামিনীবুড়ির যৌবন ঢলোঢলো। ইঞ্জিনের ড্রাইভারদের ভাবত সাক্ষাৎ দেবতা। নিজের হাতের রান্না করা খাবার খাইয়ে তুষ্ট করতে চাইত তাদের। আর বিনিময়ে পেয়ে যেত কয়েক ঝুড়ি কয়লা। তার প্রতিদানে ড্রাইভাররা স্টেশন ছেড়ে যাবার পর, শ্মশান আর গোভাগাড় পেরিয়ে, খালের কালভার্টের কাছাকাছি হলেই, নিয়মিত ইঞ্জিন থেকে বেলচে বেলচে কয়লা ছুঁড়ে ফেলে দিত কামিনীবুড়ির জন্যে। আকন্দগাছের ঝোপের ভেতর খুঁজে খুঁজে সেই কয়লাগুলো ঝাঁকা বোঝাই করে বাড়ি ফিরত কামিনীবুড়ি।

ভাতারমারি গাঁয়ে তাই সর্বপ্রথম কামিনীবুড়ির বাড়িতেই চালু হয়েছিল কয়লার উনুন। ফলে ভাগ্যে মিলেছিল জমিদারবাবুর আক্রোশ। শুধু দাইমা বলে, কামিনীপোতার ভিটে থেকে তাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার ইচ্ছে থাকলেও পারেননি।

একাদশীর মাকেও, মানে নিজের মেয়েকে, কামিনীবুড়ি হাতে ধরে দাইয়ের কাজটা শিখিয়েছিল। বেশ কয়েক বছর হোল, একাদশীর মা আর বাবা দুজনেই একসঙ্গে দেহ রেখেছে। ওলাওঠার

কোপে। এমনকি কিশোরী ডাক্তারও তাদের বাঁচাতে পারেননি। তখন থেকে একাদশীই বুড়ির একমাত্র সম্বল। দাইগিরিও এতদিনে পাকাপোক্তভাবে শিখে নিয়েছে। বিয়ের পর মতির সঙ্গে চলে গেলে কামিনীবুড়ি একা হয়ে যেত। রস্কে ডাকাত আর তার ভাগ্নে নেতাইয়ের ভয়ে বাইরে থেকে কোন চোর ছ্যাঁচোড় এ গাঁয়ে ঢুকতে ভয় পেত। কামিনীবুড়ি গরিব মেয়েমানুষ হলেও, ডাকাতের ভয় ছিল না। রস্কে ডাকাত সময় পেলে কামিনীপোতায় এসে চা খেত, বুড়ি আর তার নাতনির সঙ্গে ঠাট্টামস্করা করত। ডাকাত যার সহায় তার আবার ডাকাতের ভয় কিসের? কিন্তু জমিদারবাবুদের ভয় করত বুড়ি। আজও যে কামিনীপোতা কামিনীবুড়ির দখলে, সেটাই চিরকাল জমিদারবাবুর চোখের বিষ।

“পরের পোলাপান বিয়োতির সাহায্য করলি কি হবে, নিজির পোলাপান তো কিচু হলোনি রে। বে’র পর মতি সেই যে পাইলে গেছেলো আর এলোনি, আর এলি তো এলি, অমন নুইকে চুইরে কেনো?” বলে ছবি মিঞা ।

তারপর কি ভেবে ছবি নিজের মনে হাসে। নবীনচাষা হাসির কারণ জানতে চাইলে বলে, “না, এই ভাবতেছিলুম আর কি, দারোগাবাবু মনে করেছেলেন, একাদশী কোনো একখান গলায় কাছি ছাড়া গাভির তরো একা। যে ধরবে সেই মালিক। ঝ্যামোন জোমদেরবাবুর ঘোড়াটাকে ধরে তুই ভেবেছিলি... বে-ওয়ারিশ।”

ছবিকে বাঁহাতে জোরে ঠেলা দিয়ে নবীনচাষা বলে, “খপোরদার বলচি, ফের ঝ্যাদি ঘোড়ার খোঁটা দিবি তো মস্তো কেলেঙ্কারি বেঁধে যাবে কিন্তুক।”

- আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, ঘাট মানলুম, আর বলবোনি। কি রে তুই তা’লে আজি তো? পরে বেঁকে বসবিনি তো? কতাটা পাড়ি তা’লে? একাদশীর মতন একখান বউ কপালে জুটলি দেকবি তোর

এই ন্যাতানো জেবনখান যৈবনের আতিশয্যে এক্‌বেরে হাপুডুপু খেতি শুরু করেচে। ত্যাখন আমাদের কতা তোর মনেই থাকবেনি, এই বলে দিলুম দেকে নিস, হ্যাঁ।

জ্বরের ঘোরে শয্যাশায়ী হয়েও গাঁয়ের লোকের মুখে ছবি পরে শুনেছিল, মতির লাশ শুঁকে নিয়ে পুলিশের কুত্তাও হদিশ পাচ্ছিল না কোন দিকে যাবে। বারবার একটা ডোবার কাছে এসে খেই হারিয়ে ফেলছিল। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর দারোগাবাবু জমিদারবাবুকে বললেন, "স্যার, এ বড় জটিল ব্যাপার, কি করি বলুন তো? এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। যাকে তাকে একটা ধরে পুরে দেব নাকি, স্যার?"

জমিদারবাবু হ্যাঁ-ও বললেন না, না-ও বললেন না।

লোকেরা দারোগাবাবুর এই মন্তব্য শুনে গুটি গুটি কেটে পড়ল একে একে। একমাত্র একাদশী এতক্ষণ কেমন যেন বিষণ্নমনে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে মতির লাশ দেখছিল। হঠাৎ শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। যারা অবশিষ্ট ছিল, তারাই একাদশীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, 'বেঁচে থাকতে যে মিনসে তোকে নেয়নি, তার জন্যে এখন মিছে এতো চোখের জল ফেলিস কেন?'

দারোগাবাবু একাদশীর কান্না দেখে জমিদারবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "স্যার, এই মেয়েমানুষটা কে?"

এই মেয়েমানুষটা কে, তা জমিদার সত্যবানবাবুর না জানার কথা নয়। বিশেষ করে তাদের জমির ওপর যখন তাঁর নজর। কিন্তু দারোগাবাবুর প্রশ্নের কোন সরাসরি উত্তর দিলেন না। একাদশীর দিকে তাকিয়ে শুধু বলেন, "খুনের হদিশ না হওয়া পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসবে না। এসব কি কেলেঙ্কারি হচ্ছে আজকাল আমার গাঁয়ে? এ ধরণের খুনখারাপি এখানে আগে তো আর কখনও হয়নি। হাজার হোক লোকটা এ গাঁয়েরই জামাই তো।"

দারোগাবাবু এক ফাঁকে পুলিশদের একজনকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, কুকুরটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে থানায় ফিরে যেতে। জমিদারবাবুর শেষ কথাটা কানে যেতে আবার জিজ্ঞেস করেন, "কে জামাই, কোথায় থাকে? শালাকে জ্যান্ত পুরে দেব গারদে, বাপের জন্মে ভুলেও আর কোনো অকাজকুকাজ করবে না।"

দারোগাবাবুর মন্তব্যে আপাতত কিছু না বলে জমিদারবাবু একাদশীকে বললেন, "একা থেকে থেকে তোর অভ্যেস হয়ে গেছে। তুই তোর কাজ নিয়ে, ঠাকুমার দেখাশোনার ভার নিয়ে থাকিস, তোর জীবন তো একঘেঁয়ে নয়। জানি, মা হওয়ায় সাধটুকু তোর আর মিটবে না।"

অন্য পুলিশরা কুকুরসমেত জিপে উঠে দারোগাবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছে দেখে দারোগাবাবু বলেন, "আমি বাসে করেই ফিরব। পরে আসছি, আগে কিছু লেখাজোখার কাজ এখানেই সেরে নিই। সাইকেলভ্যান এসে গেছে, লাশটা এখনই জেলাশহরে ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিই। আপনারা আগে থানায় চলে যান।"

এবার জমিদারবাবু দারোগাবাবুকে বললেন, "কাকে আপনি যেন গারদে পোরার কথা বলছিলেন, তা আর সম্ভব নয়। ওই জামাইটাই তো খুন হয়েছে।"

- তাই নাকি? কোন বাড়ির জামাই? কেউ এসে কিছু বলল না কেন?

- বলার আর কি আছে?

- ঘরের জামাই খুন হল, অথচ কেউ তার কোনো খোঁজখবর নিতে চাইছে না। ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে না? আপনি কি বলেন?

জমিদারবাবু বিলক্ষণ জানতেন, কেন মতি এ গাঁয়ে এল। তিনি নিজে লোক পাঠিয়ে প্ররোচনা না দিলে কি মতি কখনো আর এ গাঁয়ে আসত? এত বছর তো আসেনি। জমিদারবাবু ভেবেছিলেন, একাদশী লুকিয়ে চুরিয়ে নাঙ করছে শুনে, রাগে, ঈর্ষায় মতি এসে অমতেও জোর করে

একাদশীকে নিয়ে যাবে নিজের কাছে। সাত-পাকে-বাঁধা, অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করা বউ। স্বামী হিসেবে মতির সে অধিকার ছিল। নিজের বিয়ে করা বউকে জোরজার করে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কেউ বাধাও দিত না। উল্টে গাঁয়ের লোকজন একাদশীকে যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ দিত, স্বেচ্ছায় যেতে না চাইলে। কামিনীবুড়ি একা হয়ে যেত একাদশী চলে গেলে। কামিনীবুড়ির কাছে জমির কোন দলিলপত্র নেই। আর থাকলেও দলিলপত্রের জগাখিচুড়ি মারপ্যাঁচ বুড়ির মাথায় ঢোকে না। বুড়ির এখন প্রায় মরার সময়। মরলে, পোতাটা নিজের কব্জায় আনাটা তখন জমিদার সত্যবানবাবুর পক্ষে নস্যি। ওই জমিটা খড়বাগানের লাগোয়া হওয়াতে নিজের জমির মোট পরিমাণ আরও বাড়বে। গাঁয়ের দক্ষিণপূর্ব সীমানার সম্পূর্ণটাই তখন এসে যাবে জমিদারবাবুর কবলে। এমনটাই আশা করেছিলেন জমিদারবাবু। ছবিকে দিয়ে দুর্গামূর্তি যেমন ভাঙানো যায়নি, এবারেও মতিকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে অন্যের জমিদখলের ফন্দিটাও ভেস্তে গেল। জমিদারবাবু তাই মনে মনে মতির বেঘোরে মৃত্যুর জন্যে মতির বাপকেও গালিগালাজ দিতে বাকি রাখলেন না।

দারোগাবাবু কয়েকটা ফর্ম ভর্তি করে, সই দিয়ে ভ্যান চালককে নির্দেশ দেন, “এইটা থানায় নিয়ে গিয়ে একটা রবার স্ট্যাম্প লাগিয়ে নিস, নইলে জেলাশহরে খুনের মড়া নিয়ে বিপদে পড়বি। ভুলিস না কিন্তু।” তারপর জমিদারবাবুর দিকে ফিরে আবার প্রসঙ্গ তোলেন,

- আপনাদের এ গাঁয়ে দেখছি, আক্‌ছার লোক বেঘোরে মরছে। আপনার বাড়ির কুয়োয় যে দুজন ম’ল, ওটাকে একটা দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে সেদিন কোন অসুবিধে হয়নি। দমকলের লোকেরাও সেবার সাক্ষী দিয়েছিল। কিন্তু এবার আপনার বাগানের ভেতর এই লাশ, এটাকে তো আর দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা বলে চালানো যাবে না। তাছাড়া শবপরীক্ষকও রায় দিয়ে গেছেন, শবের মাথায় গভীর ক্ষত দেখে, এটা খুন না হয়ে যায় না। কিভাবে খুন হল, কে খুন করল, তার ফয়সালা না করতে পারলে খুনি বিনাসাজায় বহাল তবিয়তে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবে। এটা আজকের যুগে ভাবাই যায় না।

- ঠিক বলেছেন, তাতে গাঁয়ের দুর্নাম আরও বাড়বে। আর এই গাঁয়ে কিছু হলেই, লোকে সর্বদাই আমার নামটা জড়িয়ে দিয়ে বেশ মজা পায়। বিশেষ করে মন্দ কিছু ঘটলে। আর ভাল কিছু হলে সবাই মুখবুজে চুপ করে থাকে। সেই কারণে আমিও এই খুনের ব্যাপারে কি কিনারা হল, তা জানতে বিশেষ আগ্রহী।

- হাতেনাতে তো কাউকে ধরাই গেল না। নিজের যদি আমার কুকুরের মতো ঘ্রাণশক্তি থাকত, তাহলে হয়ত এতক্ষণে একটা ফয়সালা করে ফেলতে পারতাম। আর আপনি যাকে সন্দেহ করেছিলেন, তাকেও ধরা গেল না। কারণ সেই লোকটা বেশ কয়েকদিন ধরেই জয়বাংলা আর ডেঙ্গুতে ভুগছে। তার নামে নালিশ করলে আদালতে ধোপে টিঁকবে না। এ গাঁয়ের কেউ তার বিরুদ্ধে সাক্ষীও দেবে না। হ্যাঁ, কোন বাড়ির জামাই সেটা তো বললেন না। সেই বাড়ির কারুর এতে হাত আছে কিনা একটু পরখ করলে কেমন হয়? অনুসন্ধানের ভেতর আমি কোনো রকম ফাঁকফোকর রাখতে চাই না। অন্যথায় আপনারাই তো আবার দোষারোপ করবেন, আমার কাজে গাফিলতি হয়েছে বলে।

- সেই বাড়িটাতে থাকে দুজন মেয়েমানুষ। একজন মরোমরো থুত্থুড়ে বুড়ি, আর অন্যজনকে তো এখানেই দেখলেন। ওই যে মেয়েমানুষটা, লাশটা চলে যাওয়া অবধি এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন ও বিধবা হয়ে গেল।

- কোথায় বাড়ি ওই মাগিগুলোর? এখান থেকে কত দূরে?

- আমার এই বাগানটার লাগোয়া জমিতেই ওদের ঘর। বেশি দূর নয়। ডোবাটায় আর দুই জমির সীমানার খানায় জল না থাকলে দু মিনিটের পথ ...

- স্যার, যদি দয়া করে একটু আমার সঙ্গে যান তো এখনই একবার ঢুঁ মেরে আসি। পুলিশের ছুঁকছুঁকুনি আর কি! গাঁয়ের লোকেদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, এরা যেন কিছু একটা লুকোতে চাইছে।

- অনুসন্ধানে যেতে চাইছেন যান, কিন্তু আমায় নিয়ে আবার টানাটানি কেন?

- না, না, টানাটানি করব কেন? সেবারের ঘটনাটা ধামাচাপা দিতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। কারণ আপনার সেই কুয়ো কাটতে আসা লোক দুটোর পরিবার পরিজনদের সঠিক কোন হদিশই পাওয়া যায়নি। আত্মীয়স্বজন এসে কোন কিছু দাবিও করেনি। তাই কম পয়সাতেই সেবার সব সামাল দেওয়া গেছিল। কিন্তু এবার? মৃতজন এ গাঁয়ের জামাই হলে কি হবে, অন্য কোথাকার ছেলে তো বটেই। তারা কি আর এত সহজে ছেড়ে কথা কইবে? কম পয়সায় কি আর তাদের মুখ আটকানো যাবে?

- ওসব টাকাপয়সার ব্যাপারে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। যা লাগবে, দিয়ে দেব। আমি কি কোনদিন কখনও না বলেছি। তবে আমার দাবি, আপনি এই মামলাটার রহস্য যে করেই হোক সমাধান করুন। আর খরচের টাকাটা গাঁ থেকেই আবার কিছু না কিছু একটা ফন্দি এঁটে তুলে নিতে আমার কোন অসুবিধে হবে না। একবার গাঁয়ে একটা যাত্রা, তরজা বা গানের জলসার আসর বসিয়ে দিলে হুড়হুড় করে টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর টাকা কোত্থেকে আসবে, কিভাবে আসবে, তা নিয়ে আপনি অত ভাবছেন কেন, বুঝিনা? আপনার প্রাপ্য টাকাটা হাতে পেলেই তো হল।

- সবে তো খুনের মামলা রুজু করার জন্যে পুলিশি তদন্ত শুরু হতে চলেছে। মোট কত লাগবে, সে পরে এসে একদিন আপনাকে বিশদ জানিয়ে দেব। তবু একবার সঙ্গে চলুন। তাহলেই দেখবেন আপনি কতটা ঝাড়া হাত পা হয়ে গেছেন। খুব একটা সময় লাগবে না। তাছাড়া আপনি সঙ্গে থাকলে আমিও একটু ভরসা পাই। চলুন, একবার ঘুরেই আসি।

গাঁয়ের খানাখন্দর পুরো শুকিয়ে যায়নি বলে জমিদারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে দারোগাবাবু বাগানের মধ্যে দিয়ে সরাসরি কামিনীপোতায় পৌঁছতে পারলেন না। যেতে হল ঘুরপথে। আর যাওয়ার সময় তাঁরা লক্ষ্য করলেন, তাঁরা একা নন। একটু দূরে দূরে থেকে গাঁয়ের কয়েকজন কৌতূহলি লোক তাঁদের

সঙ্গ নিচ্ছে। আর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কিসব যেন বলাবলি করছে। বিশুকেও দেখা গেল ওই দলে, চটপট করে নোটবুকে কিসব লিখে নিচ্ছে খবরের কাগজের রিপোর্টারদের মতো।

ছবি মিঞা পরে অন্যের মুখে সব ঘটনার কথা শুনেছিল। স্বয়ং জমিদারবাবু তাকে খুনের দায়ে জড়াতে চেয়েছিলেন, এই কথাটা সে জীবনেও ভুলবে না। পুলিশের কুকুর দিয়ে সরাসরি কোন ফয়সালা করতে না পেরে দারোগাবাবু কামিনীবুড়ির বাড়িতে খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখলেন, দাওয়ার সামনে উঠোনে তুলসীতলার কাছে পা ছড়িয়ে বসে আছে একাদশী, আলুথালু বেশ, এলো করা চুল, কোলের ওপর একখানা খাঁড়া। সত্যবানবাবুর সঙ্গে দারোগাবাবুকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেখে পাশে চেনবাঁধা কুকুরটা পেল্লায় তড়পাতে শুরু করে দেয়। এই কুকুরটার ভয়েই শহুরে পুলিশকুকুর কাজে ফাঁকি দিয়েছিল কিনা, তা জানা যায়নি। উঠোনের মাঝখানে নিচু করে টাঙানো কাপড় শুকোনোর দড়িতে শুকোচ্ছে একটা থান, একটা শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ। দড়িটা এতো নিচু করে টাঙানো যে, এ গাঁয়ের প্রতাপশালী জমিদারবাবু আর নতুন দারোগাবাবু হাত দিয়ে শুকোতে দেওয়া জিনিষগুলো সরিয়েও উঁচুমাথায় এগোতে পারলেন না। দড়ির কাছে এসে তাঁদেরও মাথা নিচু করতে হল। তাঁদের উঠোন দিয়ে আসতে দেখেও কিন্তু একাদশী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় না। আর কোনকিছুতেই যেন গ্রাহ্য নেই তার। একইভাবে বসে মনে মনে বিড়বিড় করে কি যেন সব বলে চলে। তার একবর্ণও অন্যদের বোধগম্য হয় না। দারোগাবাবু একাদশীর কোল থেকে খাঁড়াটা তুলে নেবার চেষ্টা করতেই একাদশী হাঁকরে ওঠে, “খপোরদার, এ খাঁড়ায় কেউ হাত দিয়োনি বলচি, কুইপে একবেরে দু টুকরো করে দেব।”

ইতিমধ্যে আরও কিছু লোকজন বাড়ির আশেপাশে জড়ো হয়েছে। সবার মনে কিসের যেন একটা আশঙ্কা, ওই খাঁড়া দিয়ে কি তাহলে একাদশী দারোগাবাবু কিংবা জমিদারবাবুকে তাড়া করবে? শুরু হয়ে যাবে রক্তারক্তি, কাটাকাটি?

দারোগাবাবু নিজেই ব্যাপারটা সামাল দিয়ে বলেন, “খাঁড়া হাতে করিস কি? আমায় ধরে বলি দিবি নাকি? আমি আমার কর্তব্য করতে এসেছি, বলি হতে আসিনি। মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ, তোর বর খুন হয়েছে বলে, তুই কি নিজের হাতেই খুনের মোকাবিলা করবি। আমরা আছি তাহলে কি করতে? দে, খাঁড়াটা আমার হাতে তুলে দে। আইন কি তুই নিজের হাতে তুলে নিবি?”

একাদশী কোন উত্তর না দিয়ে, খাঁড়া হাতে উঠে দাঁড়ায়। শাড়ির আঁচল কোমরে গোঁজে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে দড়াম করে খিল এঁটে দেয়। দাওয়ার খোঁটায় বাঁধা তাগড়া কুকুরটা একটানা ঘেউ ঘেউ করতে থাকে দারোগাবাবুর দিকে তাক করে। লেজহীন এই কুকুরটা নাকি বাঘের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে বাঘের থাবায় লেজ খুইয়েছিল। লোকে তাই তার নাম রেখেছিল বাঘা।

দারোগাবাবু এবার একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে, জমিদারবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, “জানেন সত্যবানবাবু, আমি পেশায় দারোগা হতে পারি, কিন্তু মনুষ্যত্বটা এখনও সম্পূর্ণ হারাইনি। আমার আপনজন কেউ খুন হলে, আমিও হয়ত এই একই রকম ব্যবহার করতাম। আপনার কি মত?”

- খুনখারাপি আমার ধাতে নেই - ছোট্ট করে উত্তর দেন জমিদারবাবু।

একাদশী যে ঘরে গিয়ে খিল দিল, সেই ঘরের ডানদিকে আর একটা ঘর। সেখানে কামিনীবুড়ি থাকে। এত লোকের সমাগমের কিছুই বুড়ি টের পায় না। এই দুই ঘরের সামনে দাওয়া, দাওয়ার মাঝখানে তিন ধাপের মাটি কোপানো সিঁড়ি। সামনে গোবর দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিকানো উঠোন। উঠোনের তিন দিক মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঘরের বিপরীত দিকের পাঁচিলে একটা ছোট্ট টিনের দরজা।

দারোগাবাবু সেই দরজা দিয়ে আবার বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় দেখলেন, গাঁয়ের কিছু লোক কোদাল হাতে একাদশীর যেখানে ঘর, বাগানের ভেতর দিয়ে সেই ঘরটার পেছন দিকে যাওয়ার

চেষ্টা করছে। কৌতূহলী হয়ে উঠলেন দারোগা বাবু। সন্ধ্যের মুখে কোদাল নিয়ে বাগানে কি প্রয়োজন, তা খুঁটিয়ে না দেখা অবধি তিনি যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না।

লোকগুলোর পিছু পিছু যেতে দেখে জমিদারবাবু বাধা দেবার চেষ্টা করেন, "আরে মশাই, ওদিকে যাবেন না, কোথায় কি সব মাড়িয়ে বসবেন, তাছাড়া ওখানে থিকথিক করছে রক্তচোষা জোঁক।"

কোনও অজুহাতেই দারোগাবাবুকে আটকানো গেল না। তিনি ঘরের পেছনে গিয়ে নিজের চোখে দেখলেন, বাগানের দিক থেকে এসে কেউ একাদশীর ঘরে সিঁদ কেটেছিল। পাড়া প্রতিবেশীরা খবর পেয়ে সেই সিঁদের গর্তটা বোজাতে এসেছে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে।

দারোগাবাবু দেখেশুনে হুকুম দিলেন, গর্ত বোজানোর কাজ স্থগিত রাখতে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তাই আইনত একাদশীকে নিজে গ্রেপ্তার করে তৎক্ষণাৎ থানায় নিয়ে যেতে পারলেন না। পরদিন সকাল সকাল পুলিশ পাঠিয়ে বাকি তদারকির কথাটাও জানিয়ে দিলেন লোকেদের। পুলিশ না আসা পর্যন্ত সিঁদের গর্তটা যেমন আছে, তেমনই থাকবে।

এতক্ষণ ছবি চুপ করে দেখছিল, নবীনচাষার তামাক টানা। দুজনের মৌনতা এবার ছিন্ন হল একটা দাঁড়কাকের কর্কশ ডাকে । নবীনচাষা বলল, "আ ম'লো যা, ভোর বেলায় কাকের ডাক, কে জানে, আজ কেমন যাবে?"

- কাকটা কেন ডাকছে জানিস?

- কেন ? বল ।

- মাদী কাক খুঁজছে, একা একা থাকা একঘেঁ' বলে, আর তুই মানুষ হয়ে কি করে তা সহ্য করিস বুইতে পারি না কিচুতেই।

ছবিকে আর বাকিটা বলতে দেয়না নবীনচাষা। বলে, “ঘুরে ফিরে তুই ছিনে জোঁকের মত ওই একই কথা বলতে শুরু করিস আর তোর রসিকতা করার এটা কি উপযুক্ত সময়? এসেচিস ঘটকালি করতি, তা এতো ধানাইপানাই ক্যানো র‍্যা?”

ছবি কথা ঘুরিয়ে নেয়। আবার বলতে শুরু করে একাদশীর কথা।

- জানিস, ভাগ্যিস আনীবামনিদির ওই খাঁড়াখ্যান একাদশীর ঘরে গচ্ছিত ছেলো। কোন শালারই তাই ঢক হয়নি, একাদশীর ধার মাড়াতি। নিজের ইজ্জৎ অক্ষা কি আর শুদু মুকের কতায় হয় র‍্যা আজগাল? আচ্ছা তুই বল, কেউ যদি আতবিরেতে সিঁদ কেটে টুঁ শব্দটি না করে একাদশীর ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে, তো বেচারি কি করি জানবে যে, সে নোকটা তারই নিকে করা সোয়ামি, মতি। ভেবে দেক, কোপটা ঠিকমতো পড়লি ধড়মুণ্ডু দুখান হয়ে যেতি পারত। কোপ নেগে মাতার পেছনে এক খাবলা মাংস ঝুলে গেছল। ঘরে সেঁধোতে পারেনি মতি। আঘাত নাগলেও ক্যানো কোনো টুঁ শব্দও করেনি, সেইটিই ভাবতি অবাক নাগতেচে। সিঁদের গত্তোর ভোতোর থিঙ্গে বেইরে পলাতি পলাতি জোমদেরবাবুর বাগানের ভোতোরে গে মাতার চোটের আঘাতেই বোধায় কেইলে গেচলো। কে জানে মতি কিসে মল, আঘাতে হাটফেল করে, না বাগানে যাওয়ার পথে সাপের কামড়ে।

- সব জানি, নতুন করি বলতি হবেনি। আরে বাবা, তোর বউ ঝ্যাদি রোজ রোজ জোমদেরবাবুর বাগানি পাতা না ঝেঁটাতি যেত, তা’লি তো ওই পাতার ঢিবির ভোতোরে মতির নাশের পচ না ধরলি কোন হদিশই হোতোনি। একাদশী কাঁদতি কাঁদতি বলতেছেলো, এলি তো এলি, সিঁদ কাটতি গেলি ক্যানো? আমি কি তোকে তেয়াগ দিছি? তুই তো নিজির থিঙ্গেই আমায় নিতি চাসনি, কেলো আর মুটকি বলে। মিনসির এ্যাতোই ঝ্যাদি গ উটলো তো নুইকে চুইরে ক্যানো?

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে নবীনচাষা একটু বিরতি নেয়। হুঁকোয় দুয়েকটা কড়া করে টান দিয়ে, নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, "কিন্তুক একটা খটকা আমার মনে থাকতেছে, মতিকে মারতি গেলো কিসির জন্যি একাদশী? মনের ভোতোরে মা হবার কি কোন নালোসই ছেলনি তার?

- একাদশীরে দোষ দি' কিগেরে বল, সে আর কামিনীবুড়ি, ঘরে একা একা মেয়েমানুষ। মাঝ-আত্তিরে তোর ঘরে কেউ সিঁদ দিলি, তুই কি করতিস, বল? - জিজ্ঞেস করে ছবি ।

- কি আর করতুম, চেঁইচে পাড়া মাৎ করতুম। তাই বলি অমোন জ্যান্ত মানুষডাকে... কাশির দমকে বাধা পড়ে নবীনচাষার কথা বলায়।

- মুখিই ঝ্যাতো তো তোর হম্বিতম্বি... চেঁইচে যেমনি সেবার ঘোড়াটাকে ঢিট করে দিছিলি?

ছবির যুক্তি শুনে একটু ভড়কে গেলেও অত সহজে ছাড়ার পাত্র নয় নবীনচাষা। বলে, "খালি খালি মান্ষীর সঙ্গি ঘোড়ার তুলনা দিস ক্যানো বলতি পারিস, এ্যাঁ?"

পরদিন সকালবেলা পুলিশের লোক এসে একাদশীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাজতে আটক রাখতে পারেনি। পুলিশ হাজতে তখন আরও তিনজন কয়েদি ছিল। ফোঁস করে উঠেছিল একাদশী তা দেখে। বলেছিল, "এ কি নচ্ছার কতা, আটক করতি হয় কর, আপত্তি নাই, তাই বলে ওই মিনসেগুলোর সনে একসাথে? এ হবেনি। মরদগুলোকে দেখলিই, আমার রন্নপাশনের ভাত উটে আসতি চায়, গা ঘিন ঘিন করতি থাকে। যা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দাঁতে ছ্যাদলা..."

দারোগাবাবু রাশভারি হলেও এ এলাকায় নতুন। একাদশীর মতো এমন তিরিক্ষি মেজাজের মেয়েমানুষ এর আগে অন্য কোথাও দেখেছেন বলে মনে হয় না। তাই একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। অন্যত্র কয়েদি বলতে শুধুই পুরুষমানুষ। সবাইকে এক ঘরে পুরে দিলে কেউ ট্যাঁফোঁ করার ফুরসৎই পেত না। হিম্মৎ তো দূরের কথা। এ কি ফ্যাসাদ এই গেঁয়ো মেয়েমানুষটাকে নিয়ে। খুনের মামলা বলে কথা। ছেড়েও দেওয়া যায় না। দারোগাবাবু নিজের চোখেই দেখেছেন এই

খাঁড়াটা হাতে নিয়ে একাদশী উঠোনে বসেছিল। কোন সন্দেহ নেই এই খাঁড়ার কোপেই... ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই শুরু হবে মামলা। জমিদারবাবুও ইশারায় জানিয়েছেন, জব্বর করে কেস ঠুকে এই মাগিটাকে গাঁ ছাড়া করাতে পারলে বিশেষ একটা ইনামের ব্যবস্থা করে দেবেন। মাগি তো নয় সাক্ষাৎ ডাইনি। দাইগিরি করুক আর যাই করুক সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। জমিদারবাবু স্বয়ং যখন রায় দিয়েছেন, তখন আমি আর তার ব্যতিক্রম কিছু করি কেন, ভাবেন দারোগাবাবু।

এলোকেশী থানার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। থানার ঘুলঘুলি দিয়ে তেরছাভাবে রোদ এসে পড়েছে একাদশীর গায়ে মুখে। দারোগাবাবু এবার সেই আলোতে এলোকেশীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, "মেয়েদের জন্যে আলাদা কোন ঘর নেই তো আমি কি করব? থানাটা কি আমার প্ল্যানে তৈরি হয়েছে? মান্ধাতার আমলের থানা। কি গেরো, এখন কি যে করি?"

একাদশী মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, "গেরো আবার কিসির? আখবার জ্যাগাই ঝ্যাদি নাই, তো ধরি বেঁধি আনতি গেলেন ক্যানো?"

- সাধ করে কি আর এনেছি। আইন! আইনে যা লেখা আছে আমাদের তা মেনে চলতেই হয়।

একাদশীকে নিয়ে দারোগা বাবুর সাপের ছুঁচো গেলার দশা। গেলাও যাচ্ছে না, উগরোনোও যাচ্ছে না।

একাদশীর বুঝতে দেরি হয় না যে, দারোগাবাবু দোটানায় পড়েছেন। এই মওকায় একাদশী খিঁচিয়ে উঠে জানায়, "গালে হাত দে এত ভাববার কি আচে, আমি কি পাইলে যাচ্চি, ছেড়ে দ্যান, ঘরে যাই। ডাকলি ফের এসে হাজিরা দেবো'খন।"

দারোগাবাবু আর একবার এলোকেশীকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করেন। রঙটা কালো কুচকুচে হলে কি এসে যায়, নিটোল শরীর, ত্বকে এতটুকুও বয়সের মলিনতা নেই, মখমলের মতন মসৃণ। কেন যে এলোকেশীর বর ওকে নিতে চায়নি, সেই কথা ভাবতে গিয়ে দারোগাবাবু কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। মুখে একাদশীর উদ্দেশ্য বললেন, “না, ঘরে তোকে যেতে দেওয়া যাবে না। আমাদের হেপাজতেই তোকে এখানে থাকতে হবে। তোর জন্যে তাহলে আলাদা ব্যবস্থাই করতে হবে। গাঁয়েই তোকে ঘরবন্দি করে রাখা যেত, কিন্তু আমাদের হাতে অত পুলিশ নেই। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, আয়, আমার কাছে এই চেয়ারটায় এসে বোস, আহাহা খালি মাটিতে বসছিস কেন?”

- অমোন শখের চ্যার টিবিল আমার ঘরে নাই, মেজেয় বসা অভ্যেস।

- তাহলে তুই আমার কোয়ার্টারেই আয়। দিনের বেলা এখানে সারাদিন বসে থাকলে আপত্তি নেই, কিন্তু রাতের বেলা...

- ক্যানো, আপনের কোয়ার্টারে ক্যানো? আপনের ইস্তিরির পেট হয়েচে নাকি?

- পেট মানে?

- তা নইলি তো আমায় কেউ ডাকে না।

- না, না। ওসব কিছু নয়। বাড়িতে আমি একা।

- অ, বুয়েচি, আপনেরও দেকি ওই মিনষেদের মতো ঠাট। না, না, কয়েদ করতি হয়, এখেনে করুন। আলাদা। নয়ত ছেড়ে দ্যান, ঘরের বিবি ঘরে যাক। আমায় নইলে বুড়ি ঠাগমার পরাণ বাঁচেনা। আর ওই খাঁড়াখান আমায় ফিইরে দ্যান।

- মেয়েমানুষের ঘরে খাঁড়া আসে কোত্থেকে? ওটা দিয়েই তো কোপ মেরেছিলিস?

- খাঁড়া দে কোপ মারবোনি তো, কি দে’? তুলতুলে চামর দে’ মারব নাকি? গত্তের মুকে নোয়ার সিন্দুকখান ছেলো, তাই মিনসের কপাল ভাল, নইলি কি আর পলাতি পারত। এক কোপে মুণ্ডু

কোতোল হয়ে যেত। আনীমাসি খাঁড়াখান আমায় দে বলেছেলো, তোরা একা মেয়েমানুষ ঘরে থাকিস, বলা তো যায় না, কোন মিন্‌ষের কখন কি মতলব। খাঁড়া হাতে থাকলি বুকির বল বাড়ে, সহজে কেউ তোদের ধার মাড়াবে না। খাঁড়াখান আনীমাসির কিনা তা নিজির মুকেই জিজ্ঞিস করি দেকতি পারেন আনীমাসিকে।

তারপর হঠাৎ কি ভেবে দারোগাবাবু বললেন, “ঠিক আছে, আমি নিজে গিয়ে আজই তোকে তোর গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব। দেখিস, বোকামো করে মামলা শুরু হবার আগে কোথাও আবার পালিয়ে টালিয়ে যাসনি যেন।”

- পলাতি যাবো ক্যানো শুনি? নিজির গেরাম ছেড়ে কোন চুলোয় পলাবো?
- আমি রোজ গিয়ে তোর খবর নেব। তোকে নিয়ে কি আমার কম ভাবনা? মতির লোকজনরা এসে যদি বদলা নিতে চায়... তোর নিরাপত্তার জন্যেই আমার যত মাথা ব্যথা।

দারোগাবাবু কি যে বলেন, তার কোনো মানেই বুঝতে পারে না একাদশী।

- খাঁড়াখান হাতে থাকলি আবার ভয় কিসির? এ্যাদ্দিন তো কোনো ভয় ছেলোনি। তার উপ্‌রে একখান হাঁক পাড়লি গাঁশুদ্দু নোক দৌড়ে আসবে।

খাঁড়া হাতে একাদশী গাঁয়ের মুখে ঢুকেই চিৎকার করে নাম ধরে ধরে একে ওকে ডাকতে শুরু করে দেয়। শুনে সবাই একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে একাদশীর সঙ্গে সঙ্গে চলে। সবার সামনে ড্যাং ড্যাং করে এগিয়ে চলেছে একাদশী। আজানুলম্বিত একরাশ কোঁকড়ান কালো চুল বাতাসে উড়ছে এদিক ওদিক। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, যেন স্বয়ং মা কালী রণক্ষেত্র থেকে ফিরছেন, অসুর নিধন করে। ডান কাঁধে হেলান দেওয়া ভারী খাঁড়াটা নিয়ে।

ভুঁড়ি সামলে, একাদশীর হনহন করে চলার তালে তাল দিতে গিয়ে, হিমসিম খাচ্ছেন দারোগাবাবু। অপ্রস্তুতের একশেষ হয়ে যাচ্ছেন তিনি। কেবলই মাধ্যাকর্ষণের টানে কোমরবন্ধনী আঁটা প্যান্টটা মাটির দিকে ঝুলে পড়ছে বলে তাঁর অস্বস্তিও বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। একাদশীকে কেন যে হাজতে আটকে রাখা গেল না, তা লোকেদের বারবার বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন দারোগাবাবু। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যায় কেউ কোন কানই দিতে চাইছে না বুঝে দারোগাবাবু একরকম হাল ছেড়ে দিয়েই একাদশীর কানে ফিস ফিস করে বলেন, “যা তাহলে, তুই এদের সঙ্গেই বাকিটা পথ চলে যা, আমি আর সঙ্গে যাব না। আমি কিন্তু রোজ এসে তোকে দেখে যাব। থানার সব কাজের পর।”

এলোকেশী মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, “ওজ ওজ আসতি হবে ক্যানো শুনি! আমার কি আর কোন কাজ নাই নাকি, এ্যাঁ? চুপিঘাপটি মেরে না এলিই হল। নয়ত আবার একটা খুন করে বসব।”

এলোকেশীর দাপট দেখে উপস্থিত লোকেরা বেশ মজা অনুভব করে। যেমন মজা পেয়েছিল পুলিশ-কুকুরের বারবার খেই হারানো দেখে। মতির লাশের কাছ থেকে শুঁকতে শুঁকতে একটা জলার কাছে গিয়েই হারিয়ে যাচ্ছিল হদিশ। গাঁয়ের লোকেদের সিঁদের গর্ত বোজাবার সময় দেখে না ফেললে দারোগাবাবুর আন্দাজই হতো না যে, মতির মৃত্যুর পেছনে এলোকেশীর কোন হাত থেকে থাকতে পারে। একাদশীর কি অপরাধ, আদৌ সে এর জন্যে দায়ী কিনা তার বিচার হবে আদালতে।

ভিড়ের হাতে একাদশীকে ছেড়ে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন দারোগাবাবু। ভিড়টা কিছুটা দূরে চলে যেতেই, তিনি প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড়ে, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মন্তব্য করেন, “বাব্বা, কি দজ্জাল মাগি রে বাবা, কোয়ার্টারে নিয়ে গেলে রাতদুপুরে কি যে করে বসত কে জানে, মতিটা সত্যিই মরে বেঁচেছে।”

লোকের ভিড়ে বিশুকেও দেখা গেল। তরতর করে সে কি সব লিখে নিচ্ছে তার নোটবুকে।

নবীনচাষা ছবিকে আবার জিজ্ঞেস করে, "তুই বলছিস তা'লে, আর একবার নিকে করতি? এই বুড়ো বয়সে? নোকে কি বলবে বল তো?"

- নোকের কতায় কি আসে যায় রে? একাদশী, তোর জেবনের ভোলই পাল্টে দেবে। ত্যাখন হিংসীর জ্বেলায় জোমদেরবাবুও জ্বলতি পুড়তি নাগবে, দেকে নিস। ম্যুনিসিপ্যালটির কমিশনার বীরুবাবুকে দেকে তোর শিক্ষে হোলোনি? ফুলির মতন অমন সুন্দুরী বউ, অপ্সরার মতো হলি কি হয়, জম্মো বাঁজা। দিন কে দিন বীরুবাবু কেমোন শুইকে যেতি নাগলেন। কিন্তুক বউটা গত হতিই আর তর সইলোনি। আবার নিকে করি ঘরে নে এলেন, একটা মোটা, হাঁদা, কেলে মাগিকে। পটাপট বিইয়ে দিলে কাচ্চাবাচ্চা। বীরুবাবুর হালচাল এ্যাকন দেক, আলাদা, কেমন চঙমঙে। রাস্তা হাঁটে টাট্টু ঘোড়ার মতো। থুড়ি, আবার তোকে ঘোড়ার কতা বলে ফেলেচি, আগ করিস নি।

- আর থানার দারোগাবাবু? কতায় আচে, বাগে ছুঁলিই আঠেরো ঘা। এক মাগির জন্যি দুই মরদের নড়াই বাঁধলি, কে সামাল দেবে?

- অতশত তোকে ভাবতি হবে নি। একাদশী এয়োতি হলি, কোন দারোগাবাবুই এ গাঁয়ের ধার মাড়াবেননি, দেকে নিস, বলে দিলুম। আর পোয়াতি হলি তো কতাই নাই। বে'র সম্মন্দি করতি হলি খালি জাতবেরেতের কতা ওঠে বটে, অজাতকুজাতে বে'র বেবোস্থাও নাই, কিন্তুক ধর্ষণির বেলা? নোকের ত্যাখোন বাচ্‌বেচারের কোন বালাই নাই। দারোগাবাবু কোন জাত কি জানি?

কথাগুলো বলে ছবি মিঞা এবার জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় নবীনচাষার দিকে।

আড়কাঠা থেকে কাচা ফতুয়াটা পেড়ে গায়ে দিয়ে নবীনচাষা বলে, "চ', আমিও তা'লে তোর সাথি যাই, আনিদির সঙ্গি আমারও কিছু কতা আচে। আত্মঘাতী চপলার আত্মার কিভাবে একটা বিহিত

করা যায়, তার জন্যি আনিদিকে জিজ্ঞেস করি গে’। উনি আজি হলিই, ওনার সঙ্গি একসাথে পেতগয়ার গে’ পিণ্ডি দিতি হবে। খরচপাতি কি নাগবে তারও একটা হিসিবহাসাব করতি হবে। পেতাত্মাকে য্যাখোন গুইরাম ওঝা একবার কতা দেছে, সে কতার খেলাপ করলি চলবেনি।”

“তা যা বলেছিস, ভূতপেতের সঙ্গি এ্যার্কি করতি নাই, করলি হাড়ে হাড়ে নাজেহাল হতি হয়। ওরা শালা দারোগাবাবুদেরও বাড়া”, বলে, ছবি পিঁড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

তারপর দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। বিয়ের প্রসঙ্গ আর দারোগাবাবুর সঙ্গে ভুতপ্রেতের তুলনা দিয়ে ছবির বলা কথাগুলো চিন্তা করতে করতে নবীনচাষার মুখ কেমন যেন একটা খুশির আমেজে ঝলমল করতে থাকে।

(২১)

গোঁসাই বাড়ির বুড়ির মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে মাথা মুড়িয়ে চান্দ্রায়ণ ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করার সময় দেখা গেল, বুড়ির নাতি, ফেলির গলার সোনার মোটা চেনটা উধাও। অনেক ধমকধামক দিয়ে যখন কিছুতেই কিছু হদিশ পাওয়া গেল না, কি করে চেনটা খোয়া গেছে, তখন সবাই বললে গুইরামকে ওঝা খবর দিতে। ও হাতচালা করে গণনা করে বলে দিতে পারবে, পাঁচ ভরি সোনার হারটা হারিয়ে গেছে, না কেউ চুরি, ছিনতাই করেছে। গুইরাম এসে বললে, “কার এখানে তুলারাশি? ছোট ছেলে হলে ভাল হয়।”

গতকাল গোঁসাই বাড়ির লোকেরা বিশুকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছিল। আর কে যেন বলে, ‘আমি নিজের চোখে দেখেছি, ফেলি ওর কাছ থেকে একটা ডাঁসা পেয়ারা নিয়েছিল। এক ফাঁকে হয়ত হারটা ফেলির গলা থেকে... দ্যাঃ, এ হতেই পারে না, বিশু অমন কাজ করার লোকই নয়... বলা যায় না, অভাবে স্বভাব নষ্ট হতে কতক্ষণ?’ অনেকে অনেক রকম জল্পনা কল্পনা করে। কিন্তু হাতেনাতে যখন ধরা যায় নি, তখন পুরো ব্যাপারটা গুণিনের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল।

চৌকো মাটির উঠোনের এক কোণে গুইরাম গোলাকৃতি ঘর কেটে তার ভেতর যাদের যাদের সন্দেহ হয় তাদের নাম লিখে, গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখল, তারপর অন্য কোণায় গিয়ে একটা লম্বালম্বি দাগ কেটে প্রশ্ন করল, “পাওয়া গেল, কার তুলারাশি?”

রানীপিসি বলেন, “আরে, আমার অল্লার তো তূলা রাশি, ডাক না ওকে, এই তো এখানে ছিল, কোথায় পালাল আবার? অমলকে পাওয়া গেল, বিশুর সঙ্গে একটা লিচুগাছের ডালে ঠকঠকি বাঁধতে উঠেছিল, বউল আসছে, এখন থেকে ঠকঠকির ব্যবস্থা না করলে, জাল না টাঙালে, সব লিচু বাদুড় আর পাখিতে মিলে সেঁটে দেবে। বিশুও সঙ্গে আসে, গণনা দেখতে। লোকে যে ওকে সন্দেহ করছে তা অবশ্য সে টের পায় না।

গুইরাম অমলের চোখ বেঁধে তার ডানহাতের তালুতে ফুঁ দিতে দিতে কি সব মন্ত্র পড়ল, তারপর তালুটা মাটির ওপর রেখে হাতটাকে একটা কিসের পাতা দিয়ে ঢেকে দিল। সেই পাতার ওপর বসিয়ে দিল একটা খাঁটি রূপোর মুদ্রা। ব্যস, চলতে লাগল অমলের হাত তরতর করে উঠোনের এ কোণের উল্টোদিকে। সবাই উৎসুক হয়ে আছে, কার নামে গিয়ে পড়বে অমলের হাত। উবু হয়ে বসা অমলও গুটি গুটি এগোতে থাকে হাতের সঙ্গে। বিশুর নাম উঠল না। একবার যার নাম উঠল, সে কবে পটল তুলেছে। গুইরাম বললে, এমন তো হয় না। গণনায় নিশ্চয়ই কোন বাধা পড়েছে। হার ভূতে নিয়ে গেল, তা কি করে হবে। আগেভাগে নাম না জানতে পারলে চালপোড়া খাওয়ানো যাবে না। আর যে নিয়েছে, সেও চালপোড়া খেতে চাইবে না, গলগল করে মুখ দিয়ে রক্ত বেরোবে বলে। কিন্তু সে তো পরের কথা। আগে যে করে হোক নামটা বের করতেই হবে। সবার নাম দেওয়া হয়েছে তো? মৃত ব্যক্তিদের নাম নয়, যারা জীবিত।

তখন একজন বলে, ‘আরে, একজনের নাম তো দেওয়াই হয়নি। পাশের বাড়ির ওই লোকটার নাম। কোথায় যেন জাহাজে কাজ করে, ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। কয়েকদিন থাকবে বলে এসেও

হুট করে আজ দুপুরের ট্রেনে ফেরৎ চলে গেছে।' সেই লোকটার নামও যোগ করে দেওয়া হল। আর এইবার অমলের হাত গিয়ে পড়ল সেই নামের ওপর। একবার হাত চাললে ভুলও হতে পারে, তাই গুইরাম জানায়, আরও দুবার চেলে দেখবে। তারপর কিন্তু শেষ। নইলে অমলের অনেক ধকল হবে। নাম তো পাওয়া গেল। কিন্তু হারটা পাওয়া গেল না। চালপোড়া খাইয়ে, মুখে রক্ত উঠিয়ে শাস্তি দেবার কোনো ব্যবস্থাও করা গেল না। পাড়াশুদ্ধু তখন একজোট হয়ে সেই লোকটার বাড়ির লোকজনদের খিস্তিখেউর করতে শুরু করে দিল। হার চুরি বা খোয়া যাওয়ার কথাটা গোঁসাইবুড়ির কানে হয়ত আর যায়নি। নাতনির গত জন্মদিনে তিনি হারটা উপহার দিয়েছিলেন। শ্বাস উঠে গেছে, আর বেশি দেরি নেই। পাড়ার বয়স্ক ছেলেরা সময় বুঝে চিতের কাঠের জন্যে কুড়ুল হাতে নিয়ে চলে গেল নবীনচাষার বাড়ি। আমড়াগাছটা কাটতে।

(২২)

মিটিং বসার নির্দিষ্ট সময়ের আগে থেকেই যারা জমিদারবাবুর বাড়িতে এসেছে, তাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু মিটিংয়ের কোন আলোচনা শোনা নয়। জমিদারবাড়ির মতো খাবার তো তাদের কখনো জোটে না, তাই তারা এসেছে খাওয়ার লোভে।

গাঁয়ের অন্যান্য পাড়ার লোকেরাও এসে বসেছে ঠাকুরদালানের নিচে, উঠোনে। সবার মুখেই এক প্রশ্ন। হঠাৎ করে জমিদারবাবু মিটিং ডাকলেন কেন? বিশেষ কোনো ফন্দি আছে কি? কয়েক বছর ধরেই তো জমিদারবাবু গাঁয়ের কারোর কোনও পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন না। এ রকম মিটিংফিটিংও ডাকতেন না। যুগের এ কি পরিবর্তন এল এবার। একে একে অনেকেই আসতে শুরু করেছে। মায়ের সঙ্গে অমলও। মিটিং বসার আগেই চট্ করে একবার জমিদারবাবুর বাড়ির অন্দরমহলে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে দেখাও করে এসেছে। মান্যগণ্যদের স্থান হয়েছে সতরঞ্চি পাতা ঠাকুরদালানের ওপর।

ঠুকঠুক করে আশশেওড়া গাছের বাঁকা লাঠিতে ভর দিয়ে গোঁসাই বাড়ির সত্যদাসও উঠোনে এসে ঢুকল। নাকের পাতা ফুলিয়ে ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করে পাশের একজনকে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে, "খ্যাঁটের বেবোস্তা কি, তোরা কেউ জানিস?" এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দেখে বিরক্ত প্রকাশ করে বলে, "বোক্তিতা শুনি কি কাজ? তাতে তো পেট ভরবে নি।"

খাইয়ে হিসেবে সত্যদাসের এ গাঁয়ে দারুণ নাম। তাকে কখনো আলাদা করে নেমন্তন্ন করার প্রয়োজন হত না। চিনির আভাস পেয়ে পিঁপড়েরা যেমন পিলপিল করে ছুটে আসে, সত্যদাসও তেমনি। কোথায় কে ভোজন দিচ্ছে, সেটা কানে গেলেই হল। তার শুধু একরাশ ভাত পেলেই হল। সে জানে, তার এই খাওয়ার বহর দেখে কেউ কেউ তাকে পছন্দ করে না, কিন্তু তাতে তার কি এসে যায়? পেট পুরে তার খেতে পেলেই হল। অন্দরমহল থেকে রান্নার গন্ধ বেরোয় ভুরভুর করে। তা শুঁকেই যেন অন্যদের পেট আদ্দেক ভরে যায়। কেবল সত্যদাস ছাড়া। ও, না আঁচালে খাবার কথা বিশ্বাসই করে না।

জমিদারবাবু ভেবেছিলেন, মিটিংয়ে হয়ত মেরেকেটে জনা দশেক আসবেন। কিন্তু এ যে গ্রাম ঝেঁটিয়ে লোক এসে জড়ো হয়েছে। ঠাকুরদালানের থামের আড়ালে গামছা কাঁধে চাকরকে দেখতে পেয়ে আদেশ দিলেন, "ভেতরে গিয়ে বল গে', আরও তিরিশ জনের মতো লুচি ভাজতে।"

লুচির কথাটা সত্যদাসের কানে গেল। যদিও সে সবসময় না শোনার ভান করে, তবু এ কথাটা সে স্পষ্ট শুনতে পেল। পাশে বসা একজনকে জিজ্ঞেস করে, "কি বললেন র্যা, জোমদেরবাবু, নুচি ভাজতি? ক্যানো, ভাতফাত তবে হবেনি বুঝি?"

"তোদের বাড়ি আজ বুড়ি ম'ল, আর তুই এখেনে খেতে এয়েচিস যে বড়?", একজন প্রশ্ন করে ।

- বুড়ি ম'ল। জোমদেরবাবুর বাড়িতে এই শেষ খাওয়াটাও খেয়ে যেতি পারলনি, বাকি রয়ে গেল। ছোকরারা কাঠ কাটতি গ্যাচে। আমাকে মুখাগ্নি করতি হবেনি, তাই এয়েচি। খ্যাঁটনের পর শ্মশানে গেলিই হবেখ'ন।

পোদপাড়ার মদন কাওরা সত্যদাসকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জমিদারবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলে, "বড়বাবু, এর একটা বিহিত না করলেই নয়।"

জমিদারবাবু তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। বলেন, "আরে কোন সালিশির ব্যাপারে আমি কোন মিটিংফিটিং ডাকিনি। তোরা একটু শান্ত হয়ে বস। আগে চা, শরবৎ টরবৎ খা। তারপর সব খুলে বলছি।"

মদন কাওরা তবু নাছোড়বান্দা। বলে, "পরে নয় এক্ষুণি একটা হিল্লে আপনাকে করতেই হবে। আপনি না করলি, কে করবে? আমাদের পুকুরগুলোয় কাল থিঙ্গে কারা আড়াআড়ি দড়ি টাইঙ্গে দেছে। আর দড়িতে ঝুইলে দেছে গেঁড়ি শামুকের মাংস।"

"তাতে কার কি?", বিরক্তি প্রকাশ করেন জমিদারবাবু ।

- আপনি আগ করতেছে ক্যানো, বড়বাবু। আজ সকালে উঠি দেকতি পেলাম, ওই একখান দড়িতে বিশখান ব্যাং ঝুলতেছে। আমি তকে তকে বসে ছেলাম। দুটো নোক যেই দড়ি খান থিঙ্গে ব্যাং নামাতি যাবে, অমনি আমি ক্যাঁক করে ধরে বললাম, চালাকি পেয়েচ, আমাদের পুকুরে ব্যাং ধরতি এয়েচ। তো ওরা বললে, আপনি নাকি অনুমতি দেছেন।
- হ্যাঁ, আমার কাছে কয়েকজন এসেছিল। আমি বলেছি, আমার কোন আপত্তি নেই। কয়েকটা ব্যাং ধরবে তো কি? বর্ষায় সারাদিন গ্যাঙর গ্যাঙর করে মাথা ধরিয়ে দেয়।

- কিন্তুক, বড়বাবু, ব্যাং ফুইরে গেলি তো আমাদের সব্বোনাশ। বাইরে খাদ্য না পেয়ে আমাদের বাস্তুভিটেয় সাপখোপের উপদ্রপ বাড়তি শুরু করবে। মশার জ্বালাতেও জ্বলতি হবে।

- তুই সাপের চিন্তায় মরছিস? বিদেশে ব্যাং পাচার করে আমাদের সরকারের কত লাভ হয়, তার খবর রাখিস? আরে, তুই অত ব্যাংয়ের কথা ভাবিস না, কাল দেখবি, ওরা আবার হাজার হাজার পয়দা করে ফেলেছে।

- সাপের মুখির গ্রাস কেড়ে নিলি, কি জানি মা মনসার কোপে পড়তি হবে কিনা। আজ নোকে ব্যাং ধরতি আসচে, কাল আসবে শখ করে পাখি মারতি, ছররা দে'।

- পাখি মারতে কেউ আসবে না। তুই দেখছি, জন্তু জানোয়ারদের ভাবনায় কাতর। তোর হয়েছেটা কি বল তো? সামনে বারে মা মনসার ভাল করে পূজো দিস, তাহলেই হবে।

উঠোনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছবি মিঞা আর রানীপিসি নিজেদের ভেতর কিসব বলাবলি করছিল। জমিদারবাবু ওদের দেখে এগিয়ে আসেন। বলেন, "তোরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভেতরে আয় নইলে আলোচনা শুরু করা যাবে না।"

রানীপিসি উত্তর দেন, যাচ্ছি, "তুমি যাও সতুদা। আমি ছবির ঘর ছেয়ে দেবার ব্যাপারে একটু কথাবার্তা কইছি।"

- শুনলাম তুই উলু দিয়ে ওর ঘর ছাইয়ে দিবি। ভাল, বেশ ভাল, উলু কিন্তু কোনো গরুতে খাবে না। খেলেই জিব চেলা হয়ে যাবে, ক্ষুরের মতো ধার।

রানীপিসি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেন, কেন জমিদারবাবু এ কথা বলছেন। জমিদারবাবু উত্তর দেন, "ও, তুই জানিস না বুঝি? ছবি দুর্গা ঠাকুরের কাঠামোর খড় অঙ্কের পণ্ডিত গরুকে খেতে দিয়েছিল। ওর ঘরের চালায় খড় নেই দেখে আমি তো ভেবেছিলুম, ছবি ঘরের চালা ভেঙেও গরুর সেবা করছে। তা আমাকে বলিসনি কেন রে, ছবি, আবাদে আমাদের কত খড়

এমনিতেই জলে ভিজে পচে যাচ্ছে। আলাদা করে তোর জন্যে আনিয়ে আমিই তোর ঘর ছাইয়ে দিতাম।”

কিশোরীডাক্তার পানের বাটা খুলে সবে ছাঁচিপান চুন, খয়েরের সঙ্গে দোক্তা আর জর্দা দিয়ে সাজার তোড়জোড় করছেন, গরু শব্দটা তাঁর কানে যেতেই কথায় যোগ না দিয়ে পারলেন না। বললেন, “তাই সেদিন নবীনচাষার চিকিৎসে করতে গিয়ে ছবির গরুটাকে দেখেছিলুম, বেশ নাদুসনুদুস। জিজ্ঞেসও করেছিলুম, এই আক্রার বাজারে এতো খড় পাস কোথা থেকে? তা বেশ, রোজ এত ভিটামিন পেলে গরু কেন মানুষও নাদুসনুদুস হয়ে যাবে।”

জমিদারবাবু এবার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেন। বলেন, “যার জন্যে সবাইকে ডাকা, সেটা পরিষ্কার করে খুলে বলি। চলুন, উঠোনে না থেকে সবাই চালার ভেতরে যাই। বৃষ্টিফিষ্টি এলে মুশকিল হবে।”

মেয়েরা একসঙ্গে একপাশে গিয়ে বসেন। বিশুর পাশে অমল।

জমিদারবাবু নতুন ডাক্তার তন্ময়বাবুর দিকে তাকিয়ে শুরু করেন, “আমি কোন স্বাভাবিক বক্তৃতা দেবার জন্যে আপনাদের ডাকিনি। বিশেষ কারণেই ডেকেছি। এবং আপনার বহুদিনের প্রস্তাবের কথাটাও মাথায় ছিল, আমাদের গ্রামে পরিষ্কার খাবার জলের ব্যবস্থা করা। আর আমাদের গ্রামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা। জানি, ব্যাপারটা কিশোরীর মনোমত হবে না, তবু আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের গাঁয়ে দুজন পাশ করা ডাক্তার, তাছাড়া রয়েছে হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, ঘরোয়া টোটকাটুটকি। এঁদের সবাইকে যদি এক জায়গায় জড়ো করা যায়, তাহলে কেমন হয়। যে যার মনোমত চিকিৎসা করাবে। পয়সাও লাগবে না। আমরা চাঁদা তুলে সব চালিয়ে নেব।”

প্রস্তাবটা শুনে কিশোরী ডাক্তার কিছু বলতে যাবেন, সবার হাততালিতে তাঁকে চুপ করে থাকতে হয়। হাততালি থামলে, একটা পানের খিলি মুখে দিয়ে বলেন, “আমার আপত্তি থাকবে কেন? তবু আমার একটা কিন্তু আছে। দাতব্য চিকিৎসালয়টা হবে কোথায়? কার জমিতে? আর চালাবার

টাকাপয়সাই বা আসবে কোথা থেকে? আমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে হলে আমার যাতায়াতের একটু অসুবিধে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোমরের বাতের ব্যথাটাও বাড়তে শুরু করেছে।"

জমিদারবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "চাঁদা ভাল না উঠলেও, আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে কোন ভাবনাচিন্তার কারণ নেই। ইদানিং আমরা রেলের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে একটা সাফল্য অর্জন করেছি। রেল আমাদের গ্রামে স্টেশনচত্বর ছাড়াও আরও চার জায়গায় হাজার ফুটের নলকূপ বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এতে আমাদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা ঘুচে যাবে। আর সরকার থেকে নতুন করে আরও কিছু অনুদান আসছে, তাতে গ্রামোন্নয়নের সুরাহাও হবে। জল নিকাশি খানাগুলো গভীর করে কাটা হবে, কাঁচা রাস্তাগুলো পাকা করা হবে। বর্ষায় তাহলে চারদিক আর আগের মতো কাদা প্যাচপ্যাচ করবে না।"

চাকর একটা হ্যাজাক এনে টুলের ওপর রেখে দেয়। কে একজন অবাক হয়ে বলে, "সে কি, আপনের বাড়িতে তো ইলেকটিরির আলো ছেলো।"

- তোদের নেই, খাসা আছিস। তোদের আলো অন্ধকারের বালাই নেই। মাসে মাসে বিল দিই, কিন্তু আদ্দেক সময় অন্ধকারে বসে থাকতে হয়, পাখা চলে না, হাত পাখার হাওয়া খেতে হয়।

বিশু কান থেকে পেন্সিলটা হাতে নিয়ে নোটবুকে কি সব লেখে। অমল উঁকি মেরে দেখছে দেখে পিঠ ফিরে বসে। বাবার কথা মনে পড়ে যায় বিশুর। বাবাকে বিশু ছোটবেলায় প্রায়ই জিজ্ঞেস করত, বাবা, আমাদের এ গাঁ-টা আসলে কার? কোথা থেকে এল? কে এর মালিক?

বাবা বুঝিয়ে বলতেন, "চাণক্যের ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের গ্রামকে আদর্শ গ্রাম বলা যায় কি না জানি না। তবে এটা জানি, সব গ্রামেরই জন্ম জলে। জল থেকে পাওয়া ডাঙা। যে প্রথম দাবিদার বলে নিজেকে দাখিল করে, তা তার হয়ে যায়। জমিজমা নিয়ে এই যে এত মামলা মোকদ্দমা হয়, আসলে কিন্তু সবই ভুয়ো। মানুষ নিজেকে সবকিছুর মালিক বলে মনে করে বলেই আমাদের এত

সমস্যা। যারা জমিদার, তাদের কাজ কিন্তু জমির মালিক হওয়া নয়, তাদের কাজ ছিল রাজার হয়ে খাজনা আদায় করা।”

বিশু অতশত না বুঝলেও শেষে এমন একটা প্রশ্ন করে যে, তার বাবাও তার সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। বিশুর জিজ্ঞাস্য ছিল, “তাহলে তো যারা খাজনা দেয়, জমির মালিক তারাও নয়, আমার নিজের হলে অন্যেরা তার জন্যে পয়সা পাবে কেন?”

বিশুর বাবা শুধু বলেছিলেন, “আদিকাল থেকে এই প্রথা চলে আসছে, নাগরিকদের কাছ থেকে রাজা দাদন না পেলে, দেশের সংস্কার করবে কি করে? এক এক সময়ে এই দাদনের নাম এক এক রকম, কেউ বলে কর, কেউ বলে তোলা বা খাজনা, আর কোন দোষ করলে, আইন অমান্য করলে, প্রজাদের দিতে হত জরিমানা।”

জমিদারবাবুর এই ধরণের কথা এ গাঁয়ের লোকেরা আগে কখনো শোনেনি, তাই হঠাৎ এই ভোল পাল্টানো জমিদারবাবুকে দেখে তারা বেশ অবাক হয়। নাকি, এর ভেতরে কোন গভীর ষড়যন্ত্র আছে?

তবে গাঁয়ের লোকেরা এতদিনে ঠেকে শিখেছে। তারা জেনে গেছে যে, সময়ের চাকা আর পেছন দিকে ঘোরানো যাবে না। তা সে জমিদারবাবুরা যতই চেষ্টা করুন না কেন। বংশপরম্পরায় যে ক্ষমতা এত দিন তাঁদের কুক্ষিগত ছিল, তা শিথিল হয়ে আসছে। এখন তাঁদের অনেকেই চেষ্টা করছেন সংহতির নামে অন্য পন্থা ধরতে।

গাঁয়ের পাঁচটা দুর্গাপূজাকে আর পাল্টানো যাবে না। দুটো আলাদা ফুটবলের ক্লাবকেও না। তবু জমিদারবাবু চেষ্টার ত্রুটি রাখেন না। বলেন -

- আজ আমাদের গাঁয়ে এতগুলো ফুটবল দল। কিন্তু পাশের গাঁ-গুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম। তার একটাই কারণ। এখানে প্রত্যেক দলেই ভাল ভাল খেলোয়াড় থাকলেও, কোন দলই একটা দল হিসেবে সম্পূর্ণ নয়। আমরা যদি সব দলগুলো থেকে খেলোয়াড় বাছাই করে গ্রামের নামে একটা দল গড়ি, আর সেই দল যদি আমাদের গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে কেমন হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা অনেক খেলায় জিততে পারব। আমাদের গাঁয়ের অনেক সুনাম হবে।

জমিদারবাবুর একটানা কথা শুনে লোকেরা উসখুস করতে শুরু করে। বিশেষ করে সত্যদাস। খাওয়াদাওয়া এবার শুরু না হলেই নয়, এখান থেকে বেরিয়ে সোজা শ্মশানঘাটে যেতে হবে। গোঁসাইবুড়িকে ওরা হয়ত এতক্ষণে নিয়ে গেছে ওখানে।

জমিদারবাবু নিজে কোন রাজনীতির পথে যেতে চান না, চাইলেই এ গাঁয়ে যে তিনি সোজা পথে ভোটে জিতবেন না, তাও তিনি জানেন। হাঁটার ধরণ যেমন পথের দশার ওপর নির্ভরশীল, ঠিক তেমনই এ গাঁয়ের লোকেদের মর্জির ওপরই নির্ভর করছে তাঁর ভবিষ্যৎ।

এবার জমিদারবাবু মহিলাদের দিকে তাকিয়ে জানালেন, মহিলাদের পুরুষদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেতে হবে না। তাঁদের জন্যে বাড়ির ভেতরে জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহিলারা সবাই উঠতে যাবেন, দেখা গেল সদর দরজা দিয়ে দুজন সঙ্গী নিয়ে দারোগাবাবু ভেতরে ঢুকছেন। অমল হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, “মাকড়সা, মাকড়সা, কেঁদো কেঁদো, মাদীমাকড়সা।”

মাটিতে যাঁরা বাবু হয়ে বসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একবার বাঁ পা, একবার ডান পা তুলে পরখ করে কোথায় মাকড়সা। মহিলাদের মধ্যে হইচই পড়ে যায়, কিন্তু মাকড়সা খুঁজে পায় না। তবু সবার মনে লেগে থাকে মাকড়সার বিভীষিকা।

বিশু একবার অমলের দিকে তাকায়, আর একবার দারোগাবাবুর দিকে। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে, কেন অমল ফট করে মাকড়সার কথা তুলল। কাকে দেখে অমলের মাকড়সার কথা মনে পড়ল, তা কিন্তু আদৌ বোঝা না গেলেও একটা কথা স্পষ্ট হল - মাকড়সাকে সবার ভয়।

দারোগাবাবু জমিদারবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেন, "জানতুম না, আপনার বাড়িতে উৎসব, অনুষ্ঠান চলছে, জানলে আজ আসতুম না। একাদশী শুনলুম আপনার কাছে এসেছে, তাই..."

জমিদারবাবু জিজ্ঞেস করেন, "কেন ? ওকে ধরতে এসেছেন?"

- না, মানে ধরতে ঠিক নয়, মাঝে মাঝে খবর নিতে আসি তো, ফেরার হয়ে গেল কিনা দেখতে... তাই ভাবলুম, এক ঢিলে দু পাখি মারা হবে। ওই কেসের ব্যাপারটায় আপনার কাছ থেকে কত পাওনা হবে, তাও একবার আপনার সঙ্গে খোলাখুলি বোঝাপড়া করতে এসেছি। আমি তো আর একা নই, অনেকের মুখ বন্ধ করতে হলে কিন্তু এবার একটু বেশিই পড়ে যাবে।

(২৩)

খালের কচুরিপানা অবশ্য বিশুদের আর পরিষ্কার করার দরকার হয়নি। যদিও শুকনো কলার বাসনা জুড়ে দড়ির মতো করে পানা পরিষ্কার করার সবরকম ব্যবস্থাদি চলেছিল। ইত্যবসরে সরকার থেকে এই খালটা সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়ায় বিশুদের কাজটাও বেশ হাল্কা হয়ে গেল। এখন শুধু কাওরাদের ওপরেই ভরসা। সবাই কেমন যেন উৎকে আছে, কবে যে শালতিটা তৈরি হবে। রোজ গিয়ে বিশু দেখে আসে, কাজটা কতদূর এগোলো। আর বেশি দেরি নেই, এই হল বলে, শালতিটা পেলে বিশু রেলস্টেশনের খালের পাকা সেতুর কাছে জলে নামাবে। শালতিতে পাঁচ জনের জায়গা হলে, বিশু লগি বেয়ে এগিয়ে যাবে সদাব্রততলার দিকে। পায়ে হেঁটে খালের পাড় ধরেও সেখানে যাওয়া যায়। কিন্তু খালের জলে শালতি বেয়ে যাওয়ার মজাই আলাদা। খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে খাল দেখা আর খালের মাঝখান থেকে শালতিতে বসে খালের পাড় দেখা, এক কথা

নয়। খালের দুই পাড়ের দৃশ্য নতুন না হলেও কেমন যেন নতুন নতুন বলে মনে হয়। খালে আর এখন আগের মতো কচুরিপানা জমে নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই শাপলা গাছে ছেয়ে গেছে। থিকথিকে সাদা সাদা ফুল ফুটতে শুরু করেছে। বিশু ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করে,

- কিরে, তোরা কেউ শালুক ফুলের মুড়ি খেয়েছিস কখনো? খাসনি? ঠিক আছে, শাপলা ফুল পেকে কালো কালো দানা গজালে, পেড়ে দেব তোদের, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলিস, বালির তাওয়ায় ভেজে দিতে। খেতে না শালা, খই মুড়ির চেয়েও খাসা।

ওসব আর শহরে কোথায় পাবে অমল?

"দেখে নে অমল, আমাদের গাঁয়ে কত কি আছে", বলে বিশু আর ভাবে, কি ভাগ্য তার যে এখন আর কোনো বড় শহরে গিয়ে থাকতে হয় না। বড় শহরের হাজতে থাকতে কেবলই তার দম বন্ধ হয়ে আসত। সেখানকার বাতাসে যেন কোনো প্রাণ নেই। আমেজ করে শ্বাস নিতে কষ্ট হত। হাজতের পাঁচিলের ওপারে যে দশতলা বাড়িটা, সেটা দেখে তার কখনো হিংসে হয়নি। বরং সেই বাড়ির বাসিন্দাদের কথা ভেবে তার কেমন যেন মায়া হত। টাকাপয়সা হয়ত ওঁদের অনেক আছে, কিন্তু তা দিয়ে তো আর ভাতারমারি গাঁয়ের মতো বিশুদ্ধ বাতাস আর পাখির ডাক কেনা যায় না। ওঁরা তো দিনরাত শোনেন শুধু গাড়িঘোড়ার বিকট শব্দ আর কাকের বিশ্রী কা কা ডাক।

শালতি বেয়ে যাবার সময় বিশু ছেলেমেয়েদের বারবার করে বারণ করে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়াতে। তাতে হয়ত ভারসাম্য হারিয়ে যাবে, শালতি টলমল করতে শুরু করলে আর সামলানো যাবে না। বিশেষ করে যারা তখনও সাঁতার শেখেনি তাদের নিয়ে বিপদে পড়তে হবে। "আর একটা কথা তোরা সবসময় মনে রাখবি, খালের ওপর হুমড়ে পড়া গাছপালার ডালগুলোর দিকে নজর রাখিস, ঝুলে থাকা বিষধর সাপটাপ যেন ডাল ভেবে ধরার চেষ্টা করতে যাস না।"

প্রথম দিনে সারা গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা উৎসুক হয়ে রেলস্টেশনের পাকা সেতুর কাছে জড়ো হয়েছে। বিশু জিজ্ঞেস করে কে কে সাঁতার জানে, সেই মতো সে দলগুলো ভাগ করে নেয়, যাতে প্রত্যেক দলে একজন সাঁতার না জানার সঙ্গে একজন সাঁতারু থাকে। ভিড়ের মধ্যে বিশু দেখতে পেলো, অউলাকে সঙ্গে নিয়ে জমিদারবাবুর ছেলে মন্টেও এসে হাজির হয়েছে।

মন্টেকে বিশু বলে, “কি রে তুই? তুইও শালতি চড়বি নাকি? তুই তো সাঁতারই জানিস না, তোকে নিয়ে গেলে যদি জলে পড়ে যাস, তখন আমি তোর বাবার কাছে কি কৈফিয়ত দেব বলতে পারিস। না, না, তোকে নেবার ভরসা পাচ্ছি না।”

মন্টে পাল্টা জবাব দেয়, “ওই অমল, ও ও তো সাঁতার জানে না, ওকে নিচ্ছ যে বড়? তাছাড়া, আমার একটা বিশেষ দাবি আছে।”

- কি দাবি? জলে ডুবে মরার?

- ওই শালতিটা তো আমাদের তালগাছ দিয়ে তৈরি, তাহলে আমি চড়তে পারব না কেন?

- ফচ্‌কেমো করিস না। আয়, আর আমি যা যা বলব, তার অন্যথা করলে, সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে দেব শালতি থেকে, বলে রাখলাম কিন্তু।

সেদিন সারাবেলা বিশু ছেলেমেয়েদের নিয়ে শালতি চড়ে বেড়ালো। সন্ধ্যের দিকে শালতিটা জল থেকে তুলে নিয়ে বিশু অমলকে বলে, “জানিস অমল, শালতিটা তোদের বাড়িতে রেখে আসি, এটা দিয়ে পুকুরের জলটাও কিছুটা ছেঁচে দেওয়া যাবে।” যাবার পথে হরের মাঠে কয়েকটা ছাগল চরতে দেখে হঠাৎ বিশুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাবার ইচ্ছে হয়।

- কিরে অমল, বাঁটে মুখ দিয়ে খেয়েছিস কখনো? টাটকা গরম, তাজা দুধ?

- মামার বাড়িতে দুধ আসত, তবে হরিণঘাটার দুধ। ছাগল ধরলে তো ছটফটাবে।

- আয়, তোকে কায়দাটা দেখাই।

বিশু কয়েকটা কচুর পাতা ছিঁড়ে আনে ডোবা থেকে। তারপর সেই পাতা দিয়ে একটা ছাগলের কান দুটো ঢেকে দেয়। ছাগলটা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বিশু তখন অমলকে বলে, “যা, অল্লা, নিচু হয়ে বাঁটে মুখ দিয়ে চুকচুক করে টান। এমন টাটকা দুধ কি আর হরিণঘাটায় পাবি? খেয়ে নে, যত পারিস।

(২৪)

কুচো আর আধলা পানায় ছেয়ে আছে রানীপিসিদের পুকুরটা। বড় আর গভীর করে কাটাতে হলে আগে সব পানা সাফ করা দরকার। তারপর জাল ফেলে মাছগুলোকে ধরে নেওয়া। জল ছেঁচে, পাঁক পরিষ্কার করার পর একটু শুকনো শুকনো হলেই শুরু হবে কাটানো।

খাল কাটতে যারা এসেছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলে ঠিকঠাকও হয়ে আছে। এক রবিবারে এসে ওরা কেটে দেবে। ফুরনে, মাথা পিছু দু’টাকা, জলখাবার আর বিড়ি, যত ইচ্ছে খাও আর ফোঁকো। শিবু সদ্দার জাল ফেলে অনেক মাছ ধরেছে। পোনামাছের মধ্যে ছিল কালবোস আর রুইকাতলা। তাছাড়াও উঠেছে কিছু ল্যাঠামাছ আর গোটা চারেক বেলেমাছ। আরও অন্য কুচো মাছের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। পুকুরের পাড়ে পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক এসেছে দেখতে। গজেন সাঁতেরাও এসেছে। যেন মেলা বসে গেছে। কয়েকটা মেয়ে দলভাগ হয়ে মাটিতে আঁক কেটে এক্কাদোক্কা কিংবা চু-কিত-কিত খেলতে শুরু করেছে। ছেলেরা তোড়জোড় করছিল ডাংগুলি খেলার। কিন্তু মাছধরা দেখার মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের আকর্ষণ আছে বলে, কিছুক্ষণের জন্যে খেলা স্থগিত রেখে পুকুরের পাড়ে জমা হয়েছে ছেলেগুলো। বলাই পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে একনাগাড়ে খুঁজেও কিছু ধরতে পারছে না বলে, আপনমনে গালি দিয়ে চলেছে। বলাইয়ের বৈশিষ্ট্য হল হাতছিপ ফেলে মাছধরা। অন্য কোন পদ্ধতিতে সে নাকাল হয়ে যাচ্ছে আর পাঁকের আস্তরণের ভেতর বলাইয়ের আসল রংটাই চেনা যাচ্ছে না। হঠাৎ পাঁকের এক জায়গায় পলো গিঁথে সরু মুখটার ভেতরে হাত

ঢুকিয়ে বলাই ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দেয়। হাতে তার কিলবিলে কি যেন একটা ঠেকেছে। বিষধর সাপটাপ নয় তো? কে জানে, সাবধানের মার নেই, তাই বলাই গায়ের গামছাটা দিয়ে পলোর মুখটা চেপে, বাবাকে ডাকে। শিবু সদ্দার খ্যাপলা জাল দিয়ে পলোসমেত পাড়ে তুলে এনে দেখে, পলোর ভেতর হাতখানেক লম্বা কেঁদো একটা মাগুরমাছ।

মাগুরমাছ উঠেছে দেখে সবাই উল্লসিত হয়ে উঠলেও, রানীপিসি ব্যাপারটাকে অত সহজভাবে নিলেন না। গজেন সাঁতের চোখ পাকিয়ে উদ্দেশ্যে বললেন, “এই গজা, পুকুরে মাগুরমাছ ফেলেছিস কেন? এতো পাঁক জমেছে পুকুরে, ধরা তো যাবেই না, তার ওপর এই পুকুরে সবাই নাইতে আসে, ট্যাংরা, শিঙ বা মাগুরমাছ ছাড়ার কথা তুই ভাবলি কি করে? আর গত বছরে এসে আমি যে দু কুনকে সিলভার কার্পের পোনা ছেড়েছিলুম, সেগুলো সব কোথায় হাওয়া হয়ে গেল? নাকি, তোরা আমাদের অবর্তমানে নিজেরাই সব ধরে খেয়ে ফেলেছিস?”

- কি কার্প বললি রানী ? কে জানে, জম্মে আমি ওসবের নামই শুনিনি। আমি কালে ভদ্রে হাত ছিপ দিয়ে তোদের পুকুর থেকে দু-একটা পুঁটি, ল্যাঠা ধরি। ওসব ট্যাংরা ফ্যাংরাও কোনোদিন পাইনি।

অজুহাত দিতে চায় গজেন সাঁত, কিন্তু উপযুক্ত কোন কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে থাকে আর মনে মনে হিসেব করে এ অবধি কতগুলো মাছ উঠেছে।

অমলকে সঙ্গে নিয়ে শালতিটাকে বাঁশের তৈরি কাঠামোয় বেঁধে পুকুরের জলটুকু বাঁশ বাগানের ঢালু জমিটার ওপর ছেঁচে ফেলার তোড়জোড় করে। রানীপিসি বিশুকে কিছু বলেন, কিন্তু দুরত্ব অনেক থাকায়, আর ছেলেমেয়েদের গোলমালে সব কথা শুনতে পায় না বলে, অমলকে বলে, “অল্লা, যা তো শুনে আয়, মা কি বলছেন।”

অমল এসে জানায়, মা বলেছে, এই শালতি দিয়ে জল ছাঁচলে রাত কাবার হয়ে যাবে। মা তো বলেছিল, শম্ভুবাবুর কাছ থেকে ডিজেলের পাম্পটা নিয়ে আসতে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কাজ সারা যেত। কত আর ভাড়া দিতে হত?

- তা রানীদি খাঁটি কথা বলেছেন । তাই চ'। সাঁতেদের বাড়ি থেকে আমি সাইকেলটা নিয়ে আসি। তুইও যাবি নাকি সঙ্গে? যাবার পথে তোকে স্কুলটাও দেখিয়ে দেব। আর মাত্র দশ দিন বাকি নতুন স্কুলে ভর্তি হবার।

ইতিমধ্যে জাল ফেলে মাছ ধরতে ধরতে পুকুরের জলটা এতই ঘোলা হয়ে ওঠে যে, বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই, কোথাও আর কোনো মাছের ঝাঁক ঘাপটি মেরে আছে কিনা। শিবু সদ্দার বলে, "এই ছেলেরা, পাড়ে দাঁড়িয়ে শুধু রং ঢং না করে একটু জলে নাম না তোরা। ওপাশ থেকে ঘা মারতি মারতি, আর আমার কাছাকাছি এলিই আমি জাল ফেলি। তাতে যা উঠবে উঠল, সব্বার শেষে একবার টানা জাল দিয়ে আজকের মতো কাজ শেষ।"

রানীপিসি একাদশীকে দিয়ে ধরা মাছগুলো মাটির ওপরে রেখে বখরা করান। তারপর যখন পাড়ার এক একটা পরিবারের নাম ডাকেন আর মাছের এক একটা ভাগ বিলি করেন, তখন সবাই এক সুরে বলে, 'এত সবের কি সত্যিই কোন দরকার ছেলো?'

মাগুরমাছটা শেষে গজেন সাঁতের ভাগে পড়ল। রানীপিসি বলেন, "আমি তো বিধবা মানুষ, নিরামিষাশী। তোমরা নিয়ে গিয়ে রাঁধো, আর আমার ছেলেমেয়েকে যদি খাওয়ানোর ইচ্ছে হয় তো নেমতন্ন কোরো, কেমন?"

শম্ভুবাবুর দোকান থেকে ডিজেলের পাম্পটা ঠেলার গাড়িতে তুলে বিশু অমলকে বলে, "অম্লা তুই ঠেলায় উঠে বস, পাম্পটা টাইট করে বাঁধা থাকলেও কাৎ হয়ে গড়িয়ে যেতে পারে, তুই ধরে থাকলে মন্দ হয় না।"

বিশুর কথা অমল অগ্রাহ্য করতে পারেনা, কিন্তু এতদিন শহরে ছিল, তাই গাঁয়ে এসে ঠেলায় চড়ে যেতে গিয়ে তার বেশ লজ্জা লজ্জা করে।

ফেরার পথে বিশু একবার অমলকে বলে, "অম্লা, মাছ ধরা তো দেখলি, কি বুঝলি?"

"দেখলাম, মাছ জলে থাকে", বলে অমল।

- দূর বোকা, আমি ওকথা বলছি না। আমি বলছি, একটা পুকুরে হরেক রকমের মাছ, ওদের ভেতরে খেয়োখেয়ি যে নেই, তা বলব না, কিন্তু বুঝে দেখ, এই জবড়জং প্রতিকুল অবস্থাতেও ওরা কিভাবে সব মিলেজুলে একটা পুকুরে বন্দি থাকে, আমরাও তাই, তবে মাছেরও বাড়া।
- ও, বিশুদা! তোমার মাথায় এত সব কথা আসে কোথা থেকে? আমাকে একটু ধার দিলে তো পারো। অমলের বিস্ময়ের অন্ত নেই।

দু' ঘণ্টার মধ্যে পুকুরের জলটা পাম্পের সাহায্যে বাঁশবাগানের দিকে ছেঁচে দিতেই মাটি কাটার লোকজন এসে হাজির। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। তবু তারা জেদ ধরলে রাত পর্যন্ত কাজ করবে। দু' একটা হ্যাজাকের ব্যবস্থা করলেই হয়। পুরো পাঁকটাকে তুলে আজই দু' তিন পরতা মাটি কেটে ফেলা যাবে। পাঁক তোলার সময় আরও কিছু মাছ আর কাঁকড়া পাওয়া গেল। সেগুলো রানীপিসি মাটিকাটার মজুরদেরই দিয়ে দিলেন।

রাত গড়িয়ে আসতে, যখন তিনি মজুরদের বলতে যাবেন, আজকের মতো ক্ষান্ত দিতে, তখন একজনের কোদাল মাটিতে বসতেই ঘটাং করে একটা আওয়াজ হল। কি একটা শক্ত জিনিস কোদালের নিচে। আবার কোপ মারার আগে তিন চারজনে মিলে হাতড়ে হাতড়ে বোঝার চেষ্টা করে, কিসে কোদাল পড়েছে। লোহাজাতীয় একটা কিছু। শাবল দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে কিছু মাটি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা জাহাজের নোঙর। ওজনে কম করে মণ তিনেক তো হবেই। বেশিও হতে পারে।

রানীপিসি তা দেখে হেসে ফেলে বলেন, “শুধু লোহা? তাও মরচে ধরে গেছে। ঠুকে বের করলে কয়েক সের ওজনও কমে যাবে। আমি তো ভাবলুম, কি না কি? মোহরভর্তি ঘড়াটড়া হবে হয়ত!” বিশু বললে, “লোহা লক্কড়ের লোকটাকে খবর দিয়ে আসি, রানীদি? কিন্তু এটা ও পাল্লায় ওজন করবে কি করে? এতো ভারি মাল পেয়ে ঘাবড়ে যাবে।

লোহা বেচে পুকুর কাটানোর মোট খরচ, পাম্পের ভাড়া, সবই পুষিয়ে গেল। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধল মাসখানেক বাদে। আপন জমির মাটির নিচে হলেও, শত শত বছরের পুরনো কোন জিনিস পাওয়া গেলে, তা আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হয় না। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের লোকজন এসে সরেজমিনে তদন্ত শুরু করে লোহালক্কড়ের লোকটাকেও নাজেহাল করে ছাড়ল।

রানীপিসি আইনকানুন অতশত বোঝেন না। পাল্টা যুক্তি দেন, “তাহলে তো বলবেন টিউকলের জলও আমার নয়, সেও তো মাটির নিচ থেকে আসছে, কে জানে ক’ হাজার বছরের পুরনো জল।”

(২৫)

পুলিশের রুজু করা ফৌজদারি মামলার পক্ষে যে অভিযোগ ছিল, তা মেনে নিলে বিশুর শাস্তি অবধারিত তা মনে করা স্বাভাবিক। তবু বিশু ছাড়া পেয়ে গেল। বিচারকের নিরপেক্ষ বিচারের জন্যে। যদিও মায়া বিশুর কারণেই প্রাণ হারায়। হাসপাতালে ফুরিয়ে যাওয়ার আগে মায়া শেষ কথাটুকু কোনরকমে হাসপাতালের চিকিৎসকদের জানাতে পেরেছিল, “ওস্তাদের কোন দোষ নেই, আমি নড়েছিলাম। উঃ, আমি কি করি?”

শুনানির জেরায় আরও প্রকাশ পায়, ঘটনার দিন বিশু আর মায়া দুজনেই আপত্তি জানিয়েছিল, খেলাটা দেখাতে। সেদিন তাদের কোন না কোন কারণে মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল তাদের দুজনেরই। কিছুতেই মনঃসংযোগ হচ্ছিল না। কিন্তু ম্যানেজারবাবু হুমকি

দিয়ে বাধ্য করিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বিশেষ করে এই খেলাটা দেখবে বলেই লোকে পয়সা দিয়ে টিকিট কিনেছে। তাদের কোনোমতেই নিরাশ করা চলবে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে কি তাই ভুল হয়েছিল। এ অনুতাপ বিশুর কিছুতেই যাওয়ার নয়। ঘুনপোকার মতো এই একটাই প্রশ্ন নিয়ত তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

রায় দেবার পর বিচারক বিশুকে কোন মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নিতে সুপারিশ করেছিলেন। মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেয়ে বিশু আবার আগের মতো হবে কি না, তা অনেকটা নির্ভর করছে, কোন পরিবেশে গিয়ে, কাদের সান্নিধ্যে এসে সে জীবনযাপন করবে, তার ওপর। নিয়মিত শিবচান করিয়ে, স্কুলের ছেলেমেয়েদের রাস্তা পার করিয়ে, কিছুক্ষণের জন্যে বিস্মরণ হলেও, মায়াকে তো আর এত সহজে মন থেকে মুছে ফেলা যাবে না। মায়া বাঁচতে চেয়েছিল। বাঁচার মতো করে বাঁচতে। মরার আগে যে সাক্ষী দিয়ে মায়া তাকে বাঁচার সুযোগ দিল, তার অবমাননা করা জীবন থাকতে কোনোদিন করতে পারবে না। কে জানে, অমল আর হেনার সংস্পর্শে এসে একদিন সে আগের সবকিছু ভুলে যাবে কিনা। তবু আশা ছাড়তে বিশু নারাজ।

একটি

www.pathagar.net

এবং

www.chorjapod.com

যৌথ প্রয়াস

বন্ধু

লেখালেখি Facebook Group

সম্পাদিকা – অদিতি কবির খেয়া

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা– শঙ্খশুভ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ চিত্র – প্রোজ্জ্বল দাশ

সাজঘর

প্রত্যয়দীপ্ত রুদ্র

অনুপম করণ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পরিচয়

আসছে বছর আবার হবে...
শারদীয়া ১৪২১
অবকাশ